এবং শ্রীর সমুদায় প্রচারক, বাবু জয়গোপাল সেন ও কালীনাথ বসু প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম এবং আচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গগত কৃষ্ণবিহারী সেন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যপুত্র ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ও কয়েক জন জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং মিস্ পিগট ও কতিপয় ব্রাহ্মিকা তাঁহার সঙ্গে উক্ত ট্রেণে যাত্রা করিয়াছিলেন। পরদিন প্রত্যূষে হলদিবাড়ী ষ্টেশনে পঁহুছিয়া সেখান হইতে সকলে পাল্কী ও হস্তিপৃষ্ঠে মেখলীগঞ্জে পঁহুছেন। তথায় সেদিন থাকিয়া পরদিন রাত্রি ৯।১০টার সময় কুচবিহারে উপস্থিত হন। সেখানে পঁহুছিয়া দেখা যায় যে,পাত্রীর অভ্যর্থনার্থ কোন আয়োজন নাই, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি, নগর অন্ধকারময়, সাধারণরূপে আলোরও ব্যবস্থা হয় নাই। ইহাতে কন্যাযাত্রিকদিগের অনেকের মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। আচার্য্যের সপরিবারে অবস্থিতির জন্য একটি আবাস ও তাঁহার বন্ধুবর্গের জন্য আর একটি আবাস গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে সকলে যাইয়া বিশ্রাম করেন। সেখানে পঁহুছিলে পর রাজদেওয়ান প্রভৃতি অনেক প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহার এক দিন কি দুই দিন পরে দেওয়ান ও আহেলকার প্রভৃতি প্রধান রাজ-কর্ম্মচারিগণ নজর দান করিয়া ভাবী মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২।৩ দিন পর্য্যন্ত পাত্রপক্ষের কেহ পদ্ধতি বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করেন না,তাঁহাদের কোন উচ্চ বাচ্য ছিল না। অনুষ্ঠানের এক দিন পূর্ব্বে প্রাতঃকালে রাজপণ্ডিত ও দেওয়ান প্রভৃতি আসিয়া আচার্য্যকে বলেন, বিবাহক্ষেত্রে শালগ্রামশীলা উপস্থিত করা যাইবে, এবং হোম হইবে। বিবাহমণ্ডপের মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। ইহা শুনিয়া আচার্য্য চমৎকৃত হন। তিনি বলেন, ইহা কখন হইতে পারে না। এরূপ কথা পূর্ব্বে কেন বলা হয় নাই? প্রতিপক্ষ বলেন, তাহা না হইলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, এবং আপনার কন্যা মহারাণী হইতে পারিবেন না। কেশবচন্দ্র বলেন, তিনি মহারাণী না হউন, তাহাতে বিশেষ আইসে যায় না, কিন্তু অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতার কোন সংস্রব থাকিতে পারিবে না। এই ব্যাপার লইয়া কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাগ্বিতণ্ডা চলে, কোন মীমাংসা হয় না। শ্রুত আছি ইতিপূর্ব্বে মহারাজের পিতামহী লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে এরূপ আবেদন করিয়াছিলেন যে, কেশব বাবুর কন্যার সঙ্গে আমার পৌত্রের অহিন্দু

প্রণালীতে পরিণয় হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, তাহাতে আমাদের জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা পায় না। হিন্দুমতে বিবাহ যাহাতে হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় বিধান করুন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই আবেদনে একটু সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন। পূর্ব্বে এরূপ কথা ছিল যে, কমিশনার স্বয়ং অনুষ্ঠানক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন। পরে তিনি উপস্থিত না হইয়া ডেপুটী কমিশনার ডেল্‌টান সাহেবের উপর সমুদায় ভার অর্পণ করেন। ডেল্‌টান সাহেবও দুই দিক্ কিরূপে রক্ষা করিবেন তজ্জন্য ভাবিত হইলেন। তিনি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিন রজনীতে পাত্র ও কন্যাপক্ষের প্রধান প্রধান লোকদিগকে লইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সভা করেন। প্রায় সমুদায় রাত্রি পদ্ধতিসম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা চলে, কোন প্রকার বিগ্রহ বিবাহ-ক্ষেত্রে আনা যাইতে পারিবে না, কেবল একেশ্বরের নামে অপৌত্তলিকরূপে হোম হইবে, ডিপুটী কমিশনার এরূপ জিদ্ করিতে থাকেন। হোম করিতে গেলেই অগ্নিপূজা হয়, ইহা কেমন করিয়া পৌত্তলিকতাদোষশূন্য হইবে? তৎপর সেই দিন সভা ভঙ্গ হয়। কিন্তু হোম কিছুতেই হইবার নয়, তাহাতে আচার্য্যের কন্যা, আচার্য্য এবং প্রচারকবর্গ কোনমতেই যোগ দিতে পারেন না, এরূপ জ্ঞাপন করা হয়। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠান হইবে এ প্রকার স্থির ছিল। রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল, তখনও আচার্য্য এবং পাত্রীপক্ষ কেহই উদ্বাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন না। সকলের হৃদয় ঘন বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন, কেশবচন্দ্র বিষম সঙ্কটে পতিত। যেদিন গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকারানুসারে আশ্বস্ত হইয়া প্রার্থনা করিয়া তিনি পাত্র ও পাত্রীকে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে দিয়াছেন, সেই দিনই জানিয়াছেন কুচবিহারের মহা-রাজের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এই কন্যাকে আর তিনি পাত্রান্তরে ন্যস্ত করিতে পারেন না। স্বাধীন রাজার রাজধানীতে—তাঁহার গৃহে আসিয়া পাত্রীসহ উপস্থিত হইয়াছেন, বলপ্রয়োগে বিবাহ দিলে—অত্যাচার করিলে পাত্রীপক্ষ কি করিবেন, ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত। সেই রাত্রিতে আচার্য্য ও প্রচারকগণ মর্ম্মান্তিক ক্লেশে কাল যাপন করিতেছিলেন। রাত্রি ১১টা বাজিতে চলিল, এমন সময় ডেপুটী কমিশনার ডেল্‌টান সাহেব স্বয়ং আচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, বিবাহ সভায় যাওয়া হউক, আমি নিজে

উপস্থিত থাকিব, কোনরূপ পৌত্তলিকতা হইতে পারিবে না। সেই স্থানে কোন পুতুল বা পৌত্তলিকতার নিদর্শন থাকিলে আমি তাহা অপসারণ করিব। কন্যা ও কন্যাপক্ষ কোন পৌত্তলিকতাতে যোগ দিবেন না, যথারীতি অনুষ্ঠান হইয়া গেলে কন্যা ও কন্যাপক্ষ চলিয়া যাইবেন। তৎপর সেই স্থানে হোম হইবে। রাজা কেবল তথায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিবেন, তাঁহার কিছু করিতে হইবে না। ডিপুটী কমিশনারের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া আচার্য্য কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, তিনি আর এ বিষয়ে মুখের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া লিখিত অনুজ্ঞা চাহিলেন। ডিপুটী কমিশনার উহা লিখিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা আচার্য্যের হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই রাত্রিতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে ডিপুটী কমিশনারের নিকটে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাফ আসিয়াছিল;—Let the Marriage Ceremony be performed according to the rites as settled before in Calcutta অর্থাৎ কলিকাতায় যেরূপ পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে তদনুসারে বিবাহানুষ্ঠান নিষ্পাদিত হউক। তখন সকলে একটু স্থিরচিত্ত হইয়া রাজবাটীতে অনুষ্ঠানক্ষেত্রে গমন করেন। তথায় বহুদূর স্থান ব্যাপিয়া লোকারণ্য ছিল, ইংরেজি বাদ্যকরের ও ন্যূনাধিক এক শত দল দেশীয় বাদ্যকরের তুমুল বাদ্য বাজিতেছিল, মাঝে মাঝে তোপধ্বনি হইতেছিল, বাদ্যধ্বনি ও তোপধ্বনি এবং লোকের কোলাহলে কর্ণযুগল যেন বধির হইতেছিল। কোন প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সাহায্যে জনতা ভেদ করিয়া অনেক ঠেলাধাক্কা খাইয়া কন্যাযাত্রিগণ বিবাহক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। কেহ কেহ সিপাহীর দ্বারা গলা ধাক্কাও পাইয়াছিলেন। কুচবিহাররাজপরিবারের এরূপ নিয়ম যে, বিবাহের পূর্ব্বদিন পাত্রীকে রাজান্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হয়। সেই জন্য পূর্ব্বদিন হইতে রাজভবনে ও রাজপথে বাদ্যকর, নিমন্ত্রিত ও দর্শক লোকদিগের মহাভিড় ছিল। সেই দিন সুনীতি দেবীকে রজনীর শেষভাগে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তখন গোলমালে তাঁহার অপমান ও লাঞ্ছনা সামান্য হয় নাই। রাজবাড়ীর দাসীরা পর্য্যন্ত ঠাকুর প্রণাম করাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করিয়াছে ও তাঁহার গলায় ধাক্কা মারিয়াছে। তিনি কিছুতেই মস্তক অবনত করেন নাই। দৃঢ়রূপে মস্তক উন্নত করিয়াছিলেন। হট্টগোলের মধ্যে একজন আসিয়া তাঁহার হস্তে একটী স্বর্ণমুদ্রা স্পর্শ করাইয়া লইয়া যায়, কে কি উদ্দেশ্যে কি করিতেছে

তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতে ছিলেন না। পরে চক্রান্তকারী লোকেরা তাঁহার সুবর্ণ স্পর্শকে প্রায়শ্চিত্ত হইল বলিয়া রটনা করিয়াছে। তিনি কিছুই জানেন না, নিজে তাহা স্পর্শ করেন নাই, একটী স্ত্রী লোক স্বর্ণমুদ্রা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া লইয়াছিল। যাহা হউক কন্যাযাত্রিগণ উদ্বাহক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, একটি সাজান ক্ষুদ্র বিবাহমণ্ডপ প্রস্তুত আছে। তাহার ভিতরে ইতস্ততঃ কয়েকটী কদলী তরু ও ঘট এবং মধ্যে বরকন্যা ও আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন এবং পুরোহিতবর্গের জন্য কয়েক খানা আসন স্থাপিত। এক পার্শ্বে বস্ত্রাবৃত কি একটি ক্ষুদ্র পদার্থ ছিল। এই সকল ঘট পৌত্তলিকতার নিদর্শন এবং বস্ত্রাবৃত বস্তুটি কোন পুতুল হইবে ভাবিয়া কন্যাপক্ষের কেহ কেহ আপত্তি উপস্থিত করেন। ডিপুটী কমিশনার রাজবাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী ও পুরোহিতকে ডাকিয়া এ সকল বস্তুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, কদলীতরুর মূলে ঘট সকল মঙ্গলঘট, ইহা মঙ্গল চিহ্ন ভিন্ন কোন পূজিত হইবার সামগ্রী নহে। বস্ত্রাবৃত বস্তু কৌটামাত্র, ইহাও মঙ্গলচিহ্ন, এখানে পূজিত হয় এমন কোন বস্তু নাই। ইহা শুনিয়া সাহেব বলেন, যখন রাজকর্ম্মচারী ও পুরোহিত স্পষ্ট বলিতেছেন এ সকল মঙ্গল চিহ্ন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে--পূজিত হয় এমন কোন সামগ্রী নহে, তখন আর এ বিষয়ে আপত্তি কি হইতে পারে? এই কথা শুনিয়া কন্যাপক্ষের আর আপত্তি রহিল না। নতুবা তখন ঘট ইত্যাদি সারইতে বলিলেই সরাণ হইত। পরে উপরি উক্ত মণ্ডপে কন্যাপক্ষ হইতে উপাধ্যায় গৌর-গোবিন্দ রায় সদস্যরূপে উপবিষ্ট হন, তাঁহার পার্শ্বে কেশবচন্দ্র বসিয়াছিলেন। বরের পক্ষীয় পুরোহিতগণ উপাধ্যায়দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহার নিদেশমতে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন। আচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গগত কৃষ্ণবিহারী সেনের উপর সম্প্রদানের ভার অর্পিত ছিল। কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য অদূরে কতিপয় প্রচারক ও ব্রাহ্ম বন্ধু সহ বসিয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তমিত্যাদি" উচ্চারণ ও ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করেন। তখন তোপধ্বনি ও তুমুল বাদ্য এবং গোলযোগ হইতে থাকে। কেহ ব্রহ্মোপাসনা শ্রবণ করিতে না পায় এই উদ্দেশ্যে যেন সেরূপ গোলযোগ করিবার সঙ্কেত ছিল, কার্য্য সমাধা হইলে পাত্রীসহ পাত্রীপক্ষ সেইস্থান হইতে চলিয়া যান। পরে পুরোহিতগণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঘৃত ঢালিতে থাকেন।

রাজা সেই স্থানে বসিয়াছিলেন মাত্র। অতঃপর রাজান্তঃপুরে কতিপয় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার সম্মুখে ব্রাহ্ম উদ্বাহপদ্ধতির অনুরূপ পাত্র ও পাত্রী উদ্বাহসঙ্কল্প ও অঙ্গীকারাদি করেন, এবং আচার্য্যকর্ত্তৃক যথাবিধি উপদিষ্ট হন। এই কার্য্যে মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনি তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তৎপর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই রাত্রি প্রভাত হয়। গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থানুসারে পাত্র ও পাত্রী স্বামী স্ত্রীরূপে একত্র বাস করিতে পারেন না। পাত্রপক্ষীয় দ্বারা বিবাহের নিবন্ধন ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় মহারাজকে নীলদুটীনামক স্থানে লইয়া রাখা হয়, তৎপর তিনি ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। রাজা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন ব্রাহ্মমন্দিরে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের সম্মুখে বিহিত প্রণালীমতে তাঁহাদের বিবাহের পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। তখন হইতে তাঁহারা স্বামীস্ত্রীরূপে একত্র বাস করিতে থাকেন।

যেরূপ রাজভবনে কার্য্য হইয়াছিল, তাহাতে প্রচারকবর্গের মন পরিতৃপ্ত হয় নাই, কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া তাঁহারা দুঃখিত ছিলেন। পর দিন দৈনিক উপাসনার সময় আচার্য্য দেব ভগবানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দান করেন। তাহাতে কোন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বিরক্ত হন, পরে কথা প্রসঙ্গে আচার্য্যকে বলেন, কার্য্য কি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে? এই অবস্থায় কৃতজ্ঞতা দান কি রূপে হইতে পারে? ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য বলেন, পরমেশ্বর বিপদ্ হইতে উদ্ধার ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দিতে হইয়াছে। তখন তাঁহার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ অঙ্গীকারাদি হইয়াছিল, পরে কুচবিহারে কি প্রকার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হইয়াছে, তিনি প্রকাশ করিয়া বলেন, এবং গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ ও পত্রাদির উল্লেখ করেন। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াছে, আচার্য্য এরূপ কখন বলেন নাই, বরং আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু এইরূপে ঘোর ষড়যন্ত্র ও বিপক্ষতাচরণের মধ্যেও ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্ম বিবাহ না হইলেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়াছিল। আর এক দিকে দেখিতে গেলে জয় লাভই হইয়াছে, একজন স্বাধীন রাজার রাজধানীতে— রাজবাটীতে পৌত্তলিক রাজ পরিবারমধ্যে দূর দেশ হইতে সমাগত কয়েক জন

দীন দুঃখী প্রচারক শত্রুমণ্ডলী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়পতকা স্থাপন করিলেন, ইহা কি এক অসাধারণ আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? বিশ্বাসী কেশবচন্দ্র ভিন্ন কাহার সাধ্য এরূপ সাহসের কার্য্য করিতে পারে?

পূর্ব্ব হইতে কুচবিহারের এক জন রাজকর্ম্মচারী (ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব) ব্রাহ্ম যুবা কলিকাতাস্থ প্রধান প্রতিবাদকারীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে ও কুচবিহারে তাঁহার কার্য্য প্রণালীর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা দাম্ভিক ভাবে নানা কথা প্রতিবাদকারীদিগের পত্রিকায় লিখিয়া প্রচার করেন। তিনি সারসপক্ষী বলিয়া নিজের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। সারস পক্ষীর অনেক কথাই যে অতি রঞ্জিত ও অমূলক ছিল কুচবিহারবিবাহে উপস্থিত এক জন ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকায় সেই সকলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিয়দ্দিন অন্তর সেই চঞ্চল প্রকৃতি যুবা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ ও পৌত্তলিকমতে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এদিকে কলিকাতাস্থ প্রতিবাদকারিগণ কিরূপে কেশবচন্দ্রকে ও তাঁহার বন্ধুদিগকে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত করিবেন, তদ্বিষয়ে নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কুচবিহারে কার্য্য সমাপ্ত হইলে সর্ব্ব প্রথমে শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও অপর দুই এক জন প্রচারক কলিকাতায় উপস্থিত হন। মজুমদার মহাশয় কুচবিহার হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া কয়েক জন প্রধান প্রতিবাদকারী আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন। তৎপর ২২।২৩ জন প্রতিবাদকারীর স্বাক্ষরিত দুই খানা আবেদনপত্র "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক" এই শিরোনামে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। এক খানাতে এরূপ লিখিত ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য বাবু কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার কন্যার বিবাহে বাল্যবিবাহদান ও পৌত্তলিকতাদোষে দূষিত হইয়াছেন, অতএব আমরা তাঁহার উপাসনা কার্য্যে যোগ দান করিতে অক্ষম, তাঁহাকে পদচ্যুত করা হউক। আর এক খানা পত্রে এরূপ লিখিত ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু কেশবচন্দ্র সেন বাল্যবিবাহ ও পৌত্তলিকতা দোষ সংক্রুত হইয়াছেন, অতএব তিনি আর উক্ত সম্পাদকের পদে নিযুক্ত থাকিতে পারেন না। মজুমদার মহাশয় উক্ত দুই খান পত্র পাঠ করিয়া সেই দুইখানারই কোণে "কেশবচন্দ্র সেন যে পৌত্তলিকতা ও বাল্যবিবাহদোষে দোষী হইয়াছেন

পূর্ব্বে তাহার প্রমাণ করা হউক, তৎপর তাঁহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইবে।" এই মর্ম্মে মন্তব্য লিখিয়া দুই খানা পত্রই ফেরত পাঠাইয়া দেন। তাহাতে প্রতিবাদকারিগণ আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কিয়দ্দিন পর রবিবারে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার সঙ্গী প্রায় সমুদায় বন্ধু কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। সেই রবিবারে শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন। তিনি বেদীতে আরোহণ করিলে পর প্রতিবাদকারীদিগের প্রেরিত কতকগুলি বালক ও যুবক এক যোগে হাতে তালি দিয়া ব্রহ্মমন্দিরে শান্তিভঙ্গ ও গোলযোগ করিয়াছিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ মন্দির হইতে তাড়িত ও বহিষ্কৃত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই আচার্য্য ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, অমুক দিন অমুক সময় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর সম্মুখে আমি আচার্য্যের পদ এবং পরে অমুক দিন অমুক সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। এই বিজ্ঞাপন প্রচার হইলে পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে লোকারণ্য হয়। প্রতিবাদকারিগণ মহা উল্লাসে ও উৎসাহে দলে দলে উপস্থিত হন। কে সভাপতি হইবেন প্রথম তাহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। প্রতিপক্ষ বাবু দুর্গামোহন দাসের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। উপাসকমণ্ডলীর অনেক সভ্য তিনি এই সভার সভাপতি হইবার উপযুক্ত নহেন বলিয়া প্রতিবাদ করেন। আচার্য্য বিনীতভাবে দুর্গামোহন বাবুকেই সভাপতিত্বে বরণ করা হউক উপাসকমণ্ডলীকে এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ নিয়মিত উপাসকগণ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হন নাই। তথাপি কেশবচন্দ্র দুর্গামোহন বাবুর নিকটে অবনত হইয়া বসিয়া বলেন, "আমি ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।" তাহাতে দুর্গামোহন বাবু তেজের সহিত এরূপ বলেন, আমরা আপনার ইস্তফা গ্রহণ করিব না, আপনাকে পদচ্যুত করিব। তখন অনেক অল্পবয়স্ক যুবা ও বহু অপরিচিত লোক নানা কথা বলিয়া অত্যন্ত গোলযোগ আরম্ভ করে। সেই সময় ঠাকুরদাস সেন মহাশয় এরূপ প্রশ্ন করেন, ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের নিয়োগ ও পদচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়ে মতামত দানে কাহাদের অধিকার আছে? উপাসকমণ্ডলীর সভ্যদিগের অধিকার, অন্যের নহে তিনি এরূপ উত্তর প্রাপ্ত হন। ইহা শুনিয়া ঠাকুরদাস বাবু পুনর্ব্বার

প্রশ্ন করেন, উপাসকমণ্ডলীর সভ্য কাহারা তাহা আমি জানিতে চাহি। তখন উপাসকমণ্ডলীসভার নির্দ্ধারণপুস্তক হইতে এরূপ নির্দ্ধারণ পড়া হয়, যথা;—যাঁহারা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া নিয়মিতরূপে উপাসনায় যোগ দান করেন ও ব্রহ্মমন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অন্যূন ।০ মাসিক চাঁদা দিয়া থাকেন, এবং যাঁহাদের চরিত্রে গুরুতর দোষ নাই, তাঁহারাই উপাসকমণ্ডলীর সভ্য। কিয়ৎকাল পুর্ব্বে প্রধান প্রতিবাদকারী শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির প্রার্থনা ও অনুমোদন মতে তাঁহাদের উপস্থিতিকালে উপাসকমণ্ডলীর সভায় এই নির্দ্ধারণ হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণ দেখা যায় এই নির্দ্ধারণানুসারে প্রতিবাদকারীদিগের দুই তিন জন লোক ব্যতীত অন্য কেহ উপাসকমণ্ডলীর সভ্য নহেন। অনেকে ৬ মাস কি বৎসরাবধি মন্দিরে সামাজিক উপাসনায় যোগ দান ও মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কোনরূপ চাঁদা দান করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের আচার্য্যের নিয়োগ ও পদচ্যুতিসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। এই নির্দ্ধারণ পাঠ করিলে পর প্রতিবাদকারীদিগের সকলের মুখ মলিন হইয়া গেল। তদনুসারে দুর্গামোহন বাবুও উপাসকমণ্ডলীর সভ্য নহেন, তিনি আর উপাসকমণ্ডলীর সভাপতির পদে কিরূপে বরিত হইতে পারেন? তথাপি আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "যাঁহারা বলেন আমি উপাসকমণ্ডলীর সভ্য আছি, তাঁহাদিগকে সভ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হউক।" কিন্তু যাঁহারা সভ্য নহেন তাঁহাদের কোন মত গৃহীত হইবে না, বহু লোক তেজের সহিত এরূপ বলিতে লাগিলেন, তখন হট্টগোল উপস্থিত হইল। সেই সময় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আজ এরূপ উত্তেজনার অবস্থার সভার কার্য্য হইতে পারে না, সভাভঙ্গ হইল এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিজ্ঞাপন করিলেন। ক্রমে লোক সকল হৈ চৈ রবে গোলযোগ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। তখন হট্টগোলের মধ্যে বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য,কেশব বাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে অপসারিত করা গেল,তৎপরিবর্ত্তে রামকুমার ভট্টাচার্য্য ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি চারি জন আচার্য্য নিযুক্ত হইলেন, এরূপ ঘোষণা করিলেন। এ পক্ষের প্রায় সমুদায় লোক এ কথা অগ্রাহ্য, সভাভঙ্গ হইয়াছে, এবং রীতিমত সভাই হয় নাই, এই

বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার প্রতিবাদ করেন। তৎপর সকলে ব্রহ্মমন্দির হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। বাবু দুর্গামোহন দাস বাহিরে যাইয়া ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারের চাবি মন্দিরের তৎকালীন ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকটে চাহিয়া পাঠান। চাবি তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হয় না। পরিশেষে বাবু জয়গোপাল সেন প্রভৃতি ব্রহ্মমন্দিরের পঞ্চাশজন উপাসক এই মর্ম্মে আচার্য্যের নিকটে আবেদন করেন যে, প্রতিবাদকারীদিগের এইরূপ উত্তেজনায় অবস্থা থাকিতে আর যেন সভাধিবেশন না হয়। তখন ইণ্ডিয়ান মিররে এ প্রকার এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, অমুক দিন দ্বিতীয় সভা হইবার কথা ছিল সেই সভা আপাততঃ স্থগিত রহিল। বর্ত্তমান উত্তেজনার অবস্থায় সুশৃঙ্খলরূপে সভার কোন কার্য্য হইতে পারিবে না বলিয়া সভাধিবেশন স্থগিত রাখা সঙ্গত হইয়াছে। আশ্চর্য্য! এই বিজ্ঞাপন পড়িয়া আন্দোলনকারিগণ ক্ষুব্ধ হন, দ্বিতীয় সভার অধিবেশন করিবার জন্য তাঁহাদের নেতা দৃঢ় অনুরোধ সহকারে পত্র লিখেন, কিন্তু সেই অনুরোধ গৃহীত হয় না। অন্য অন্য যুগে সচরাচর ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংসারাসক্ত স্বার্থপর অবিশ্বাসী লোকেরা যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছে বা পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে, এবার প্রেমাস্পদ অনুগামিগণ তাহাদের সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন, এই যুগে এই নূতন কাণ্ড!

তাহার পর রবিবার দিন প্রাতঃকালে কমলকুটীরে প্রাত্যহিক উপাসনার উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় অনেকের মনে এরূপ আশঙ্কার উদয় হয় যে, অদ্য ব্রহ্মমন্দির নিরাপদ নহে। আজ প্রতিবাদকারিগণ এই সময় সুযোগ পাইয়া মন্দির অধিকার করিবার জন্য আসিবেন এরূপ বিশেষ সম্ভাবনা। এ প্রকার আশঙ্কাবশতঃ তখন দুই জন হিন্দুস্থানী লোকসহ ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ও ভাই রামচন্দ্র সিংহ মন্দিরের পার্শ্বে যাইয়া আশ্রয় লন। মন্দিরের সম্মুখস্থ গাড়ী বারাণ্ডায় লৌহময় রেলিং দ্বার ও মন্দিরের দ্বার কলুপে বন্ধ করা হয়। গাড়ী বারাণ্ডার দ্বার অতিক্রম না করিলে কেহ মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইতে পারে না। বেলা ৯।১০টার সময় যখন কমল কুটীরে জমাট আরাধনা হইতেছিল তখন তিন জন বিখ্যাত প্রতিবাদকারী আসিয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ রেলীং দ্বারের কুলুপ ভাঙ্গিতে উদ্যত হন। ভিতর হইতে ভাই মহেন্দ্রনাথ

যশু ও ভাই রামচন্দ্র সিংহ সেই দুই জন হিন্দুস্থানী লোকসহ তাহাতে বাধা দেন। তৎপর দুই জন প্রতিবাদকারী বেলীং ডিঙ্গাইয়া গাড়ীবারাণ্ডার ভিতরের দিকে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতেও ভিতর হইতে বাধা পান। তজ্জন্য এক জন প্রতিবাদকারী ক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রচারক ভ্রাতার বক্ষে পদাঘাত করেন, অন্যতর প্রতিবাদকারী এক হিন্দুস্থানী হইতে বাধা পাইয়া তাহার গোপ ধরিয়া টানেন, এবং তাহাকে দশনাঘাত করেন। অপিচ প্রচারক দ্বয়কে যতদূর হইতে পারে কুৎসিত গালাগালি করেন। ইতিমধ্যে একজন প্রতিবাদকারী হটাৎ বেলীং দ্বারের কুলুপ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। দৈবাৎ তখন ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত সেখানে উপস্থিত হন, তিনি সেই ভগ্ন কুলুপ দুই হস্তে বেলীং দ্বারে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া উক্ত প্রতিবাদকারীর সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করেন। মন্দিরের দ্বারে এরূপ মহাগোলযোগ হইতেছিল, ইহার মধ্যে ঘটনাক্রমে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু কালীনাথ বসু তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, মন্দিরের সম্মুখে জনতা ও ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া তিনি সেখানে উপস্থিত হন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েক জন প্রচারক ও ব্রাহ্মও সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর তথায় আগমন করেন। তখন কালীনাথ বাবু আক্রমণকারী প্রতিবাদকারীদিগকে ভৎসনা করিয়া বলেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার! তোমরা ভদ্রলোক হইয়া হাড়ী ডোমের কার্য্য করিতেছ। মন্দিরে তোমাদের স্বত্ব হইলে বিচারালয় আছে, বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ কর। তখন তাঁহারা কিছু অপ্রতিভ হন, অন্য একজন বন্ধুর সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহাদের অগ্রণী সরিয়া পড়েন। অপর দুই জনও আস্তে আস্তে চলিয়া যান। সেই দিন সায়ংকালীন সামাজিক উপাসনার সময় প্রতিবাদকারিগণ আসিয়া মন্দির আক্রমণ করিবেন তাহার লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে হয়, পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করা যায়। একজন সাহেব ইনস্পেক্টর ও কতিপয় হেড কনেষ্টাবেল এবং কনেষ্টাবেল যথাসময়ে মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হন। তাহার পরক্ষণেই বিরোধিগণ দলবদ্ধ হইয়া আগমন করেন। সেই দলের মধ্যে আমার স্বদেশ পূর্ব্ববঙ্গের যুবক ছাত্রগণকে সমধিক উৎসাহী ও অগ্রগামী বলিয়া বোধ হইল। প্রতিবাদকারিদলের মন্দিরে প্রবেশের কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই সাধু অঘোরনাথ বেদীতে বসিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কয়েক জন প্রচারক

ও স্বপক্ষ ব্রাহ্ম বেদীর সম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ বেঞ্চে বসিয়াছিলেন। প্রতিবাদকারিগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হটাৎ বেদীর উপর কোন উৎপাত করিতে পারেন নাই। উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে সাধু অঘোরনাথ যাই বেদী হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন, তখন বাবু রামকুমার ভট্টাচার্য্য বেঞ্চ হইতে উঠিয়া বেদীর অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ এই সময় আপনি কোথায় যান বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বেঞ্চে বসাইয়া দিলেন *। ইতিমধ্যে আচার্য্য যাইয়া বেদীর উপর আরোহণ করিলেন। তখন বিরোধিগণ মন্দিরে মহাগোলযোগ আরম্ভ করেন, পুলিশ গোলযোগকারীদিগকে বাহির করিয়া দেন। উপাসনা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়। ইহাতে বহুসংখ্যক প্রধান প্রতিবাদকারী মর্ম্মাহত হন, এবং অনুরূপ অভিসন্ধি করিয়া দলবদ্ধভাবে মন্দিরের দ্বারে উপাসনা শেষ হওয়ার প্রতীক্ষা করেন। যাই আচার্য্যের উপাসনা সমাপ্ত হইল তৎক্ষণাৎ তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সামাজিক উপাসনা করিতে দেওয়া হয় না। তাঁহারা উপাসনা করিতে না পাইয়া অনুরূপ গোলযোগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহাতেও বাধা পাইয়া পরে পরাস্ত ও নিরাশ হইয়া চলিয়া যান। তাঁহাদের উৎপাতের ভয়ে মন্দিরের দ্বারে কয়েক রবিবার পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত রাখিতে হয়। তৎপর কতিপয় সপ্তাহ আচার্য্য বেদীর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন, শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপসনার কার্য্য করেন। পরে মন্দিরে উপস্থিত সমুদায় উপাসক স্বাক্ষর করিয়া উপাসনার কার্য্য করিবার জন্য দৃঢ় অনুরোধ সহকারে আচার্য্যের নিকট আবেদন করেন। তজ্জন্য তিনি পুনর্ব্বার ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

এদিকে প্রতিবাদকারিগণ অকৃতকার্য্য ও পরাস্ত হইয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তখন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেই দলের নেতা হইয়া দাঁড়ান। প্রায় সকল প্রধান প্রতিবাদকারীরই এরূপ ইচ্ছা ছিল যে, স্বতন্ত্র দল না করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া কেশবচন্দ্রকে নানা উপায়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের দৃঢ়সঙ্কল্প

* এই ব্যক্তি এখন ঘোর বামাচারী হিন্দু মাহাত্ম। বিরোধী সমাজের সঙ্গে—ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে ইঁহার আর কোন সম্পর্ক নাই।

হইল যে, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিবেন না, স্বতন্ত্র স্বাধীন সমাজ করিয়া তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। তাহা না হইলে তিনি তাঁহাদের (প্রতিবাদকারীদিগের) দলভুক্ত থাকিবেন না। তাঁহারই বিশেষ উদ্যোগে টাউনহলে সভা হয়, সেই সভাতে নূতন সমাজের পত্তন হইল। ক্রোধ কুভাব বিদ্বেষ বিরোধ অবিশ্বাসবশতঃ প্রত্যাদেশের বিরুদ্ধে, ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ স্বর্গীয় ভাব ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, অভিনব সমাজের সৃষ্টি, হস্তোত্তলনকারী বিষয়ী ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশের সাধারণ মত এবং সাধারণ বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ ভূমির উপর এই সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষয়ী ব্রাহ্মদিগের কর্তৃত্বাধীনে ক্রমে কয়েক জন বেতনভোগী প্রচারক নিযুক্ত হন। কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম বন্ধু টাউনহলে তাঁহাদের সভার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, সভায় এক জন প্রধান বক্তা বলিলেন, কেশব বাবুর ঈশ্বরাদেশকে আমি পদ দ্বারা দলন করি। এক জন বক্তা ও প্রধান প্রতিবাদকারী কেশবচন্দ্রের প্রচারিত ঈশ্বরদর্শন প্রত্যাদেশ ও সাধুভক্তি প্রভৃতি ১১ ১২টি উচ্চ উচ্চ সত্যের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে তিন খানা নূতন পত্রিকা তাঁহারা প্রকাশ করেন। সে সকলের অধিকাংশ কলেবর কেশবচন্দ্রের প্রতি কটূক্তি ও নিন্দায় ও নানা বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে। বহুকাল কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু প্রচারকদিগের প্রতি গালি কটূক্তি নিন্দার স্রোত চলিয়াছিল। কেহ আচার্য্যের ও আচার্য্যের পরিবারের বিরুদ্ধে কুৎসিত নিন্দা এবং ঈশ্বরাদেশ ব্রহ্মস্তোত্র প্রভৃতির প্রতি নানা ব্যঙ্গোক্তি সকল নাটকাকারে লিখিয়া এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। লেখকের তাহাতে অতিশয় নীচতা ও কুরুচি প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রতিবাদকারী দলস্থ এক জনের যন্ত্রালয়ে তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল। গুরুতর কারাদণ্ডভয়ে ভীত হইয়া পরে তাঁহারা সেই পুস্তক প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হন। অনেকে এ বিষয়ে পুলিশকে লিখিয়া জানাইবার জন্য কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে অপমান ও অত্যাচার করা হইয়াছে বলিয়া তিনি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে অসম্মত হন। যখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ভারতাশ্রমের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কুৎসিত অপবাদ রটনা করা হয়, তখন আশ্রম ও

আশ্রমবাসী নব নারীর পবিত্রতা ও সম্মানরক্ষার জন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ দ্বারা তিনি অভিযোগ উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে হাইকোর্টে বিবাদী দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন ক্ষমা করা হয়। সেই কুৎসিত কুৎসা রটনার মূলে এখনকার কয়েক জন প্রধান প্রতিবাদকারী ছিলেন। পরে কেশবচন্দ্র মূল বিবাদী বাবু হরনাথ বসুর আবাসে যাইয়া তাঁহার প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করেন।

এই সময়ে যাহাতে প্রচার ভাণ্ডারের আয় এবং ধর্ম্মতত্ত্বাদি পত্রিকার গ্রাহক কমিয়া যায়, প্রচারক পরিবারের অন্নবস্ত্রের বিশেষ কষ্ট হয়, অনেক প্রতিবাদকারী বিধিমত তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। অর্থাগম খর্ব্ব করিতে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। আন্দোলনকারিগণ কয়েক মাস ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বস্থ ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর জগদ্ধাত্রী-পূজার দালানে প্রতিরবিবার সামাজিক উপাসনার সময় উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া সামাজিক উপাসনা করিয়াছেন, অনন্তর জগদ্ধাত্রী পূজার সময় হইতে অন্যত্র তাঁহাদের সামাজিক উপাসনা কার্য্য হয়। সমাজসৃষ্টির কিয়দ্দিন পরে গোস্বামী মহাশয় ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে যাইয়া প্রকাশ্যে ও গোপনে নানা উপায়ে কুৎসা ও নিন্দা করিয়া কেশবচন্দ্রের ও তাঁহার অনুগামী প্রচারক বন্ধুদিগের সম্বন্ধে লোকের মনে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মাইতে বিধিমত চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য্যের প্রতি কুৎসিত নিন্দা ও অতি জঘন্য গালিপূর্ণ একখানা সুদীর্ঘ পত্র মুদ্রিত করিয়া গোস্বামী মহাশয় স্থানে স্থানে বিতরণ করিয়াছিলেন। স্বীয় ধর্ম্মশিক্ষকের প্রতি একজন ভক্তিপথাবলম্বীর এ প্রকার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। এক পরিবারভুক্ত বন্ধু প্রচারকদিগের প্রতিও গোস্বামী মহাশয় সামান্য কটূক্তি করেন নাই। গোস্বামী মহাশয় স্বপ্রণীত "ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"ভ্রাতাদের মধ্যে কাহার কোন দোষ দেখিলে তাঁহাকে গোপনে জ্ঞাপন করিতে হইবে, প্রত্যেকে স্ব স্ব উপাসনার সময় ভ্রাতাদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের দোষ ক্ষমা করিতে হইবে।" ব্রাঃ নিঃ ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠা। ঢাক ঢোল বাজাইয়া সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া এই বুঝি গোস্বামী মহাশয়ের গোপনে ভ্রাতার দোষ জ্ঞাপন। এক্ষণকার কয়েক জন প্রধান আন্দোলনকারী আচার্য্য হইতে

প্রাপ্ত সমুদায় সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উপকার বিস্মৃত হইয়া ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে ২।১ বার ঘোর অকৃতজ্ঞ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময় গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের অত্যন্ত বিপক্ষ ছিলেন। তখন তিনি আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। এক সময় তিনি আচার্য্যকে লিখিয়াছিলেন, "যিনি যখন প্রেরিত হন, তিনিই তখন পৃথিবীর সমুদায় ভার মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক জীবের পাপনাশের জন্য দিবানিশি ক্রন্দন করেন, আপনি যে ভাব লইয়া আসিয়াছেন তাহাতে অবকাশ নাই।" ইত্যাদি। (মাসিক ধর্ম্মতত্ত্ব ৩১ সংখ্যা)। অন্য এক সময় গোস্বামী মহাশয় বিরোধী হইয়া আচার্য্যকে আক্রমণ ও অপবাদগ্রস্ত করেন, পরে অনুতপ্ত হইয়া গুরুহত্যাকারী জুডাসস্কেরিয়ট স্থানীয় বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অস্থিরতা ও চঞ্চলতার বিষয় আর কত লিখিব।

ঢাকা ও ময়মনসিংহস্থ বিরোধিদল বিশেষতঃ বিরোধী যুবকগণ নিতান্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থানীয় ব্রহ্মমন্দির লইয়াও অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সুসভ্য ইংলিশ গভর্ণমেণ্টের সুশাসন না হইলে কেশবচন্দ্র যে, একদিন কোন প্রতিবাদকারীর হস্তে প্রাণ হারাইতেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেহ একখানা পত্রের ভিতরে এক টুকর দড়ী পূরিয়া তাঁহার নামে পাঠাইয়াছিল, "তুমি দড়ী গলায় দিয়া মর" পত্রে এরূপ লেখা ছিল। "মন্দিরে যাইবার সময় তোমাকে পথে ঠেঙ্গাইব" কেহ এরূপ লিখিয়াছিলেন। জুডাস স্কেরিয়ট ত্রিশ টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আপনার নেতা ও ধর্ম্মশিক্ষক যিশুখ্রীষ্টকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়াছিল, পরক্ষণেই সেই পাপের জন্য তাহার ঘোরতর অনুতাপ হয়, এবং উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ যুগে আচার্য্যহন্তাদিগের অন্তরে যে অনুতাপের লেশও হইয়াছে এরূপ বুঝিতে পারা যায় না। এই আন্দোলনে আমার বহু আত্মীয় বন্ধু ভক্তবিরোধী হইয়া প্রতিবাদকারীদিগের পুষ্টিবর্দ্ধক ও একান্ত সহানুভূতিকারী এমন কি একাত্মীভূত হইয়াছেন। আমার দেশীয় স্বগণ বন্ধু ও নিতান্ত প্রাণের অন্তরঙ্গ প্রিয়তম ও স্নেহাস্পদ বহু যুবকের এই ব্যাপারে অশিষ্টতা, দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্য দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি এরূপ আশা করিতে অধিকারী যে, তাঁহারা এই উদ্বাহ-

ব্যাপারের অনেক তত্ত্ব অন্ততঃ আমার নিকটে জানিতে চাহিবেন। শত্রু-দিগকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের দ্বারা চালিত হইলেন, আমাকে বিশ্বাস করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদের কেহ এ বিষয়ে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই, বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহাদের অবিশ্বাস ও উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখিয়া আমি আপনা হইতে তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে সাহসী হই নাই। তদবস্থায় আমি বলিলে তাঁহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন না, ইহা আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি। যদি আমাকে বিশ্বাস করিতেন তবে অন্ততঃএক দিনও আমার নিকটে আন্দোলিত বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতেন। আমি তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসি ও তাঁহাদের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। অনেক দিন তাঁহাদের সেবাও করিয়াছি। কখন তো অবিশ্বাসের কার্য্য কিছু করি নাই। তবে কেন তাঁহাদের এরূপ অবিশ্বাসভাজন হইলাম বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের অবিনয় ও নৈতিক দুর্গতি দেখিয়া আমার প্রাণ এক্ষণও আকুল। যুবতী কন্যা ও বধূদিগের হৃদয়েও অবিশ্বাস হলাহল ঢালিয়া তাঁহাদিগকে বিকৃত করিয়া তোলা হইয়াছিল। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন তরলপ্রকৃতি যুবা আচার্য্যের প্রতি নিন্দা ও কটূক্তি পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করেন, কেহ বা স্লিপ ছাপাইয়া যথা তথা বিতরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ পুরুষেরা পর্য্যন্ত হাতে তালি দিয়া তাহাতে আমোদ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের এরূপ ভয়ানক দুর্গতি ঘটিয়াছে। কলিকাতাস্থ কোন প্রধান প্রতিবাদকারীর উত্তেজনাপূর্ণ অনুরোধ পত্র পাইয়া ময়মনসিংহ নগরে পরিণতবয়স্ক অনেক হিন্দু পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সাজিয়া পৌত্তলিক ও বাল্যবিবাহ দিয়াছেন বলিয়া আচার্য্যকে অপমানিত করিবার জন্য উৎসাহের সহিত তরুণবয়স্ক যুবক প্রতিবাদকারীদিগের দলভুক্ত হন। তাঁহাদের কেহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এক পত্নী বিদ্যমানে পরিণত বয়সে একটী বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, কোন যুগে কখন কখন সক করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, তিনিও একজন প্রধান প্রতিবাদকারী হন। হায় কি বিড়ম্বনা! পরে তিনি পৌত্তলিক গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন। ময়মনসিংহের আর এক জন বয়স্থ ঘোর অত্যাচারী প্রতিবাদকারী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুমতে পুনর্ব্বার দীক্ষিত করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার এক্ষণ আর কোন সম্পর্ক নাই। ময়মনসিংহের মন্দিরের অধিকার প্রাপ্তির জন্য তত্রত্য প্রতিবাদকারিগণ দলবদ্ধ

হইয়া একদিন উপাসনার সময় বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন সেই সমাজের উপাচার্য্য ও সম্পাদক পুলিশের সাহায্যে মন্দিরে শান্তি রক্ষা করেন। ঢাকানগরস্থ পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ছিলেন, তিনি কুচবিহারে যাইয়া বিবাহে যোগ দান করেন নাই, কেবল আচার্য্য কন্যাবিবাহ দিয়া পাপ করিয়াছেন বলিয়া প্রতিবাদ না করার অপরাধে তিনি পদচ্যুত হন, তাঁহাকে সদলে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আসিতে হয়। অরাজকতা আর কাহাকে বলে! যাহা হউক কালক্রমে প্রতিবাদকারীদিগের সেই তীব্রভাব মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, অনেকের মনে সদ্ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের প্রচারিত মত ও বিশ্বাস এবং প্রণালী পদ্ধতি ও আচরণ তাঁহাদের সমাজে কোন না কোন রূপে অনুকৃত ও আদৃত হইতেছে, পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র (তাঁহারা মুখে স্বীকার না করুন) তাঁহাদের রক্ত মাংস ও অস্থিতে বসিয়া আছেন, এমন কি তাঁহারা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্রের অনুকরণ করিতেছেন। নববিধানের কেশবচন্দ্রের নিকটে তাঁহারা ঘেঁসিতে ভয়াকুল। নববিধানের স্বর্গীয় মত ও বিশ্বাস প্রকাশ্যে স্বীকার করিলে প্রতিবাদ যে টিকিয়া থাকিতে পারে না, তাহা হইলে কেশবচন্দ্র যে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন। অনেকের এইরূপ মত যে প্রতিবাদ যাহা করা হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত হইবে না, কেশবচন্দ্রকে গালাগালি ও অপমান যাহা করা গিয়াছে তজ্জন্য অনুতাপ হইবে না, এমন অবস্থায়ও তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ তাঁহার কনিষ্ঠ অনুগামী বন্ধু নববিধানবাদিগণ নববিধান নাম পরিত্যাগ করিয়া বিধানবিরোধী সমাজের সঙ্গে আসিয়া সম্মিলন সাধন করুন। তাহা না করিলে তাঁহারা ক্ষুদ্রচেতা, অনুদার ও সঙ্কীর্ণ হইলেন।

এ স্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করিয়া আমি প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। মহারাজের সম্মানযোগ্য উদ্বাহসম্বন্ধীয় আয়োজন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশে দশ সহস্র টাকা আচার্য্যের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাহা হইতে ৮৫০০৲ ব্যয়িত হয়, অবশিষ্ট ১৫০০৲ আচার্য্য ফিরিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আচার্য্যের সঙ্গে উদ্বাহের কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে আমার আলোচনা হইয়াছিল, তাহা পরে বিবৃত করিব। তন্মধ্যে এই কয়েকটী কথা আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম;—হিন্দু ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করিল ;

এ কেমন ? তাহাতে তিনি নিজের মূলমত (Principle) ব্যক্ত করিয়া এই ভাবে বলেন, ব্রাহ্মপরিবারের সঙ্গে যখন অন্য ব্রাহ্মপরিবারের সম্বন্ধ হয় তখন প্রচলিত প্রণালীর ষোল আনা আদায় করিতে হইবে, কোন দিকে ত্রুটি হইবে না। এই স্থলে পাত্রপক্ষ হিন্দু পৌত্তলিক পরিবার, সেই পাত্রপক্ষ হইতে হিন্দু ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করিয়াছেন। তাঁহারা যখন এক জন অব্রাহ্মণ জাতিত্যাগী ব্রাহ্মের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহা দ্বারা চালিত হইয়া অপৌত্তলিক মন্ত্র সকল উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে কি তাঁহাদের উপর আমাদের জয় হইল না ? গৌরগোবিন্দ রায় প্রধান পুরোহিতরূপে ছিলেন। তিনি সেই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা চালিত হন নাই, তাহারাই তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছে, তাহাদের আর ব্রাহ্মণত্ব কোথায় রহিল ? ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে আমরা যত টুকু আদায় করিতে পারি, তাহাতেই আমাদের জয়। ইংলণ্ডে বহু খ্রীষ্টীয় সমাজের ধর্ম্মমন্দিরে আমাকে কার্য্য করিতে দেওয়া হইয়াছিল, প্রধান প্রধান খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ প্রার্থনাদিতে আমার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে যে আমরা আমাদের ধর্ম্ম ও বিশ্বাসে যোগদান করিতে পাইয়াছি, ইহা পরম লাভ মনে করি।

বিবাহের সময় আইনানুসারে সুনীতি দেবীর বয়স পূর্ণ হইতে ছয় মাস এবং রাজার প্রায় দুই বৎসর অবশিষ্ট ছিল। এরূপ অপূর্ণবয়সে বিবাহ কেমন করিয়া হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই ভাবে বলিলেন, এই বিবাহ রাজকীয় বিবাহবিধির অন্তর্ভুক্ত নহে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যের সীমার মধ্যে ও তাঁহার প্রজার মধ্যে বিবাহ হইলে গবর্ণমেণ্টের আইনসংক্রান্ত বিধি প্রবল থাকিত। কুচবিহারের ন্যায় স্বাধীন রাজ্যে সেই আইনের অধিকার নাই। আইন সাধারণ ব্রাহ্মদিগের জন্য হইয়াছে, তাঁহারা নিজের বা পুত্র কন্যাদির বিবাহে স্বেচ্ছাচারী হইয়া না চলেন তজ্জন্য আইনের বন্ধন করিতে বাধ্য হওয়া গিয়াছে। আইনে বর ও কন্যার ১৮ ও ১৪ বৎসর যে বয়স নির্দ্ধারিত হইয়াছে, নানা প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তাহা একান্ত ন্যূনকল্পে হইয়াছে, উপযুক্তরূপ হয় নাই। সময়ে সুযোগ মতে এই বয়সের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইবে। এই রাজকীয় উদ্বাহবিধির প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, উদ্বাহকে বৈধ করিয়া উত্তরাধিকারিত্বের অন্তরায় নিবারণ করা। কুচবিহারের মহারাজের বিবাহে উত্তরাধি-

কারিত্ববিষয়ে এই আইনের কোন ক্ষমতা নাই। পরন্তু এই বিবাহ এক প্রকার বাগ্দানস্বরূপ হইয়াছে, উভয়ের উপযুক্ত বয়সে বিবাহের পূর্ণতা সম্পাদিত হইবে। তখন পাত্র ও পাত্রী স্বামীস্ত্রীরূপে মিলিত হইবেন, সে কাল পর্য্যন্ত ইঁহারা বিচ্ছিন্নভাবে থাকিবেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে কন্যার ১১।১২ বৎসর বয়সেও বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রাজাতো ব্রাহ্ম নহেন, তাঁহাকে কিরূপে কন্যা সম্প্রদান করা যাইতে পারে? তিনি পৌত্তলিক নহেন, একেশ্বরবিশ্বাসী। একেশ্বরবাদীর সঙ্গে কন্যার বিবাহ-দানে ব্রাহ্মের অধর্ম্ম হয় না। ইয়ুরোপীয় কোন ব্যক্তি আমাদের সমবিশ্বাসী হইলে আপনাকে ব্রাহ্মনামে পরিচয় দান করিবেন না। Theist (একেশ্বরবাদী) বলিয়া পরিচয় দিবেন। তাঁহার সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ করিলে ব্রাহ্মের অধর্ম্ম হইবে না।

এক্ষণ পাঠকগণ নিরপেক্ষ ভাবে স্থির চিত্তে আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া দেখুন, কুচবিহারবিবাহকে মূল করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে একটী বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হইবার কি প্রয়োজন ছিল? নূতন প্রত্যাদেশ ও নূতন সত্য যাহা কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই তাহা আন্দোলন-কারিগণ কি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, উহা জগতে প্রচার করিবার জন্য একটী দল করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, না অসূয়া ও আসুরিক ভাব হইতে এই বিচ্ছিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়াছে? পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে দল করা মহা পাপ জ্ঞানে "আমি দল করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বাক্ষরিত সেই প্রতিজ্ঞাপত্র মুদ্রিত রহিয়াছে। যখন প্রতিবাদকারিগণ স্বতন্ত্র সমাজস্থাপনে উদ্যত হন তখন তাঁহাদের অন্যতর নেতার নিকটে আচার্য্য এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন, আপনারা অকারণে নূতন সম্প্রদায় করিবেন না, এরূপ সম্প্রদায় করা পাপ। আপনারা বিচ্ছিন্ন না হইয়া আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে বিচারনিষ্পত্তি করিবেন। উহা গ্রাহ্য হয় নাই।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।

সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন।

কেশবচন্দ্রের প্রতি বিরোধিগণের বিরোধ ক্রমান্বয়ে প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। নানা স্থলের ব্রাহ্মবন্ধু যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং প্রচারক সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় "সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন" এই আখ্যায় বিবাহবন্ধনের আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। বৃত্তান্তলিপি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;——

"কুচবিহারের মহারাজের সহিত আচার্য্য মহাশয়ের কন্যার বিবাহসম্বন্ধে কয়েক মাস হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থলে মহা আন্দোলন হইতেছে। অনেকে কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় যার পর নাই গ্লানি প্রচার করিতেছেন, এবং বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকের মন কিছু বুঝিতে না পারিয়া ব্যাকুল ও ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। অপবাদ ও নিন্দা পরিহারপূর্ব্বক যদি কেহ কেহ নিরপেক্ষ ভাবে বন্ধুতার অনুরোধ ও সাধারণের হিত কামনায় আচার্য্য মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে পত্র লিখিতেন, বোধ করি তিনি তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেন। যাহা হউক, এত দিনের পর এইরূপ কতকগুলি পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। নানা স্থান হইতে বন্ধুগণ বিবাহসম্বন্ধীয় যথার্থ ঘটনাগুলি যাহাতে সাধারণের গোচর হয় এ জন্য আচার্য্যমহাশয়কে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদককে ও কোন কোন প্রচারককে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমরা কর্ত্তব্য ও সত্যের অনুরোধে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, আচার্য্যমহাশয়ের সম্মতিক্রমে তাহা সাধারণের হিতার্থ লিপিবদ্ধ করিলাম। বোধ করি ইহা পাঠ করিয়া সকলের না হউক অনেকের সন্দেহভঞ্জন ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধন হইবে। এক দিকে বিলম্ব জন্য কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু অপর দিকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, লোকের মন যখন

খুব উত্তেজিত হয়, তখন সত্য অবধারণ করা কঠিন; ক্রমে যত মন সুস্থির ও শান্ত হয় ততই সুবিচারের সমধিক সম্ভাবনা।

"আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি আচার্য্য মহাশয়ের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহসংক্রান্ত সমুদায় ঘটনা অনুমোদন করেন বা সম্পূর্ণরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। এ বিবাহের কতকগুলি ব্যাপারে যদি অপর কেহ দুঃখিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা জানা কর্ত্তব্য যে তাঁহার হৃদয় তৎসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যথিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানটী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের ইচ্ছানুরূপ হয় নাই, এ জন্য তিনি মনের অসন্তোষ কখন সংগোপন করেন নাই, যদি কিছু অন্যায় ঘটিয়া থাকে তাহা অন্য লোকে বিবেকের অনুরোধে যেমন অন্যায় বলিয়া প্রতিবাদ করিবেন তিনিও সেইরূপ মুক্তকণ্ঠে অন্যায় বলিতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি ধনলোভে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়াছেন অথবা বাল্যবিবাহ দিয়াছেন কিম্বা পুনরায় হিন্দু সমাজভুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন এরূপ নীচ ও জঘন্য অপবাদের আমরা সকলেই বিরোধী।

"সর্ব্ব প্রথমে ইহা বলা আবশ্যক যে আচার্য্য মহাশয় বিবেকের আদেশে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা জানি কন্যার বিবাহে তাঁহার অত্যন্ত উপেক্ষা ছিল, এবং তিনি এত গুরুতর ব্যাপারে সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। এক দিনের জন্যও তিনি পাত্রানুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হন নাই। ঘটনাক্রমে যখন ঈশ্বর পাত্র আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তিনি তাহা অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি ফলবাদী নহেন, সুতরাং ফলের দিকে দৃষ্টি করেন নাই। কুচবিহারে রাজ্যসম্বন্ধীয় বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মঙ্গল হইবে, বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, অথবা ব্রাহ্মদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে উৎকৃষ্টতর পাত্র পাওয়া যায় কি না, এবং পাইলে আরও ভাল হয় কি না এ সকল চিন্তায় তিনি প্রবৃত্ত হন নাই। উচিত কি না?—তিনি কেবল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার হৃদয় বলিল উচিত, এবং ঘটনা দ্বারা জানা গেল যে পাত্রটী ঈশ্বর কর্ত্তৃক আনীত। এই বিশ্বাসে তিনি বিবাহ দিতে স্বীকার করেন। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল উচিত বোধে এবং ঈশ্বরেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৈনিক আহারাদি ও সংসারের ভার ঈশ্বরের হস্তে, তিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন। তিনি যদি এ বিবাহ কার্য্যটী না সম্পাদন করিতেন তাহা হইলে

তাঁহার বিবেকের নিকট অপরাধী হইতে হইত। পৃথিবীর সমস্ত লোক তাঁহার বিরোধী হইলেও এ কার্য্য হইতে তিনি নিবৃত্ত হইতে পারিতেন না। কেন না মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বর বড়, এবং মানববিধি অপেক্ষা দেববিধি শ্রেষ্ঠ।

"এই বিবাহের সম্বন্ধ ও আর আর প্রস্তাব যাহা কিছু স্থির হইয়াছে তাহা এক পক্ষে আচার্য্য মহাশয় ও অপর পক্ষে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অবধারিত হইয়াছে। কুচবিহারমহারাজ নাবালক। যত দিন না তিনি বয়স প্রাপ্ত হন তত দিন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক। সুতরাং রাজার বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার পক্ষীয় কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট। কেশব বাবু উক্ত রাজার সহিত আপনার কন্যার পরিণয় হইবে এরূপ কখন মনে ভাবেন নাই, স্বপ্নেও জানিতেন না। সুতরাং ইহার জন্য তিনি প্রথমে কোন চেষ্টা করেন নাই, আবেদনও করেন নাই, এবং গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে না থাকিলে এবং বিশেষ উদ্যোগ না করিলে নিশ্চয়ই বিবাহপ্রস্তাব গ্রাহ্য হইত না। ছয় মাস হইল কুচবিহারের ডিপুটী কমিশনার সাহেব স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া কেশব বাবুর কন্যাকে দেখিয়া মনোনীত করেন, এবং কিছুদিন পরে তাঁহাকে এই ভাবে এক পত্র লিখেন যে, কমিশনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন সাহেব বিবাহসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াছেন। প্রচলিত হিন্দুরীতি হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিভিন্ন রীতি কেশব বাবু এ বিবাহে অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করা হয়। পত্রে এরূপ কথাও ছিল যে, প্রস্তাবিত বিবাহে দেশের অনেক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং উভয় পক্ষেরই যত দূর সম্ভব পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। অক্টোবর মাসের প্রথমে আচার্য্য মহাশয় আপনার মন্তব্য সমুদায় লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এই পত্রে তিনি ১০টী প্রস্তাব করেন, অম্মধ্যে প্রধান প্রস্তাব কয়েকটী নিম্নে লিখিত হইল; (১) রাজা যে ব্রাহ্ম অথবা একেশ্বরবাদী খ্রিষ্ট তাহা লেখায় স্বীকার করিতে হইবে, (২) ব্রাহ্মপদ্ধতি অর্থাৎ পৌত্তলিকতাবিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইবে, কিন্তু তাহার সহিত স্থানীয় এমত সকল আচার যোগ থাকিতে পারিবে যাহাতে কিছুমাত্র পৌত্তলিকতা নাই। (৩) পাত্র পাত্রী উভয়ে বয়স প্রাপ্ত হইলে বিবাহ হওয়া বিধেয়। যদি তত দিন অপেক্ষা করা না হয় তাহা হইলে আপাততঃ কেবল নির্ব্বন্ধ পত্রের অনুষ্ঠান হউক,

এবং রাজা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে বিবাহ বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন হইবে। (৪) ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ঠিক রাখিতে হইবে, কোন বিষয় অন্যথা হইবে না। কিন্তু যে সকল ব্যাপারে কেবল বালকত্ব কিম্বা নির্ব্বুদ্ধি প্রকাশ পায় তাহা অনুষ্ঠান করিতে চাহিলে বিশেষ আপত্তি করা হইবে না।

"অক্টোবর মাসে হটাৎ ডিপুটী কমিশনর এক পত্র লেখেন যে, লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাহেব বাল্য বিবাহে অসম্মত এবং রাজা নিজেও তাঁহার নিকট অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং বিবাহ প্রস্তাব আপাততঃ রহিত হয়। এ কারণে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, এবং তদ্বিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপিত হইবারও সম্ভাবনা রহিল না; তিন মাস পরে উক্ত সাহেব পুনরায় এক পত্র লেখেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল যে, লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাহেব রাজার বিবাহে মত দিয়াছেন কিন্তু রাজা বিবাহ করিয়াই ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রস্তাব এই যে, মার্চ্চ মাসে রাজার ইংলণ্ডে যাইতেই হইবে, কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় তাঁহার তথায় যাওয়া নিতান্ত অনভিপ্রেত, এ জন্য ৬ই মার্চ্চ দিবসে বিবাহ হইবে, কিন্তু সে বিবাহ নামমাত্র। যাহাতে নূতন প্রস্তাবে কেশব বাবুর অমত না হয় এতদ্‌জন্য তাঁহাকে উক্ত পত্র মধ্যে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হইল যে, যদ্যপিও ৬ই মার্চ্চ দিবসে বিবাহ সম্পন্ন করিতে আপনার আপত্তি আছে, এবং কন্যার চতুর্দ্দশ বর্ষ ঠিক পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ দেওয়া আপনার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর, তথাপি আপনি এইটী বিবেচনা করিবেন যে, লোকে যাহাকে বিবাহ বলে উহা বাস্তবিক সেরূপ বিবাহ হইতেছে না, কিন্তু কেবল বাগ্দান মাত্র।

"যে সময়ে এই পত্র হস্তগত হয়, সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব, সুতরাং কয়েক দিন কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। বারংবার কুচবিহার হইতে তারযোগে শীঘ্র মীমাংসার জন্য অনুরোধ আসিতে লাগিল, এবং অনেক আলোচনারপর ধার্য্য হইল যে, ৬ মার্চ্চ দিবসে সে বিবাহ হইতেপারে যদি উহা কেবল বাগ্দান রূপে স্বীকৃত হয়, এবং পাত্র পাত্রীকে আপাততঃ ঐ ভাবে রাখেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হওয়াতে অন্যান্য প্রস্তাবের আলোচনা ও মীমাংসা হইতে লাগিল। রাজা ব্রাহ্মস্বভাববিশিষ্ট এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে অনেক দিন হইতে বিশ্বাস আছে। এ কাথ

তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিতেও প্রস্তুত। প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় পূর্ণ হইলে কেবল পদ্ধতি-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী মীমাংসা করিবার অবশিষ্ট রহিল। এতৎসম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয় ইতিপূর্ব্বে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, কুচবিহার হইতে এক জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত কলিকাতায় আসেন এবং উভয় পক্ষ থাকিয়া এ গুরুতর বিষয়টী এরূপে নিষ্পত্তি করেন যেন ভবিষ্যতে কোন গোল না উঠিতে পারে। এই প্রস্তাবানুসারে রাজার প্রধান পণ্ডিত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়ের সহিত প্রায় এক সপ্তাহ কাল পরামর্শ করিয়া অনেক বাদানুবাদের পর বিবাহপদ্ধতি এক প্রকার স্থির করিলেন। তাহাতে ব্রাহ্ম পদ্ধতি এবং পৌত্তলিকতা বিবর্জ্জিত স্থানীয় পদ্ধতির সম্মিলন করা হইয়াছিল। পদ্ধতি এই কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল (১) পূর্ব্ব দিবস অধিবাস, (২) সভাতে ব্রহ্মোপাসনা (৩) বাগ্দান (৪) স্ত্রী আচার (৫) স্বস্তিবাচন (৬) বরণ (৭) ক্ষমাগ্রহণ (৮) সম্মতি (৯) সম্প্রদান (১০) বরকে দক্ষিণা (১১) উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা (১২) প্রার্থনা। এই বিবাহ রীতি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় ভাল অক্ষরে পুঁথির আকারে তুলট কাগজে ছাপা হইবে, এবং বিবাহের সময় উহা দেখিয়া উভয় পক্ষীয় পুরোহিত পাঠ করিবেন ঐরূপ কথা হইল। পদ্ধতি মুদ্রাঙ্কণ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান মিরার ছাপাখানার অধ্যক্ষের হস্তে দেওয়া হইল। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি রাজাকে লইয়া ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে কুচবিহারে চলিয়া গেলেন, এবং উক্ত পদ্ধতির এক খণ্ড পাণ্ডুলিপি সঙ্গে লইয়া গেলেন। উহার সঙ্গে একখানি ক্রোড়পত্র সংলগ্ন ছিল তাহাতে এই কয়েকটী বিশেষ নিয়ম লেখা ছিল,—১। বিবাহের সময় কিংবা বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে বর বা কন্যা কোন প্রকার পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না। ২। বিবাহমণ্ডপে কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি অথবা অগ্নি অথবা ঘটাদি স্থাপন করা হইবে না। ৩। যে মন্ত্র এই কাগজে লেখা হইল তাহাই পুরোহিত পাঠ করিবেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রাদি উচ্চারণ করা হইবে না। ৪। মন্ত্রাদির কোন অংশ পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করা হইবে না। পদ্ধতিসম্বন্ধে আরও নির্ব্বিরোধ থাকিবার মানসে কন্যাপক্ষ হইতে এরূপ প্রস্তাব হইল যে, উল্লিখিত বিবাহরীতিতে ডেপুটী কমিশনর সাহেব অথবা তাঁহার প্রতিনিধি বিবাহের পূর্ব্বে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

"এই সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হইলে কন্যাপক্ষ কুচবিহারে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আর কোন বিঘ্নের আশঙ্কা রহিল না। বিশেষতঃ কেশব বাবু ইতিপূর্ব্বে এক তাড়িত বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া অপর দিকের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া ছিলেন যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু মাত্র বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে না। ইহার যে উত্তর পাওয়া যায় তন্মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল—আর কোন বিষয়ে আশঙ্কা করিবেন না,—হিন্দু পদ্ধতি হইতে পৌত্তলিক অংশ বাদ দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টের এরূপ স্পষ্ট আশ্বাস বাক্যে মূলকথাসম্বন্ধে মনে আর কোন আশঙ্কা রহিল না, তবে যদি সামান্য সামান্য বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় কন্যাপক্ষ বিবেচনা করিলেন যে তাহা কুচবিহারে গিয়া মীমাংসা করা যাইবে। ২৫ তারিখ সোমবার স্পেশল ট্রেণে কন্যাপক্ষ সমুদায়ের যাত্রা করিবার কথা অবধারিত হইল। যাত্রার আয়োজন হইতেছে এমত সময় তারে সংবাদ আসিল, বিবাহপদ্ধতি এখনও দেখা হয় নাই, উহা ছাপাইবেন না। শনিবার রাত্রিতে আর একটী তারযোগে সংবাদ আসিল—পদ্ধতির মধ্যে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মরীতি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা হইতে পারে না। রবিবারে সত্বর এ কথার প্রতিবাদ করা হইল এবং পূর্ব্বকার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। বাইনাচ সম্বন্ধেও এ সময়ে আপত্তি উঠিল এবং স্পেশল ট্রেণের দিন পরিবর্ত্তন করিবার জন্যও অনুরোধ করা হইল। কিন্তু তদ্বিষয়ে এই উত্তর আসিল যে ট্রেণের ভাড়া ও সময়াদি ঠিক হইয়াগিয়াছে এখন বন্ধ হইতে পারে না।* রবিবার অপরাহ্ণ কুচবিহার হইতে তারযোগে সংবাদ আইসে তাহাতে এই লেখা ছিল, আপনি আমাদের প্রতিনিধির নিকটে প্রচলিত হিন্দু রীতি যেরূপে পরিবর্ত্তন করিতে ইতিপূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়াছেন সেইরূপ করা হইবে। সোমবারে তাড়াতাড়ি করিয়া ১১টার সময় সকলে যাত্রা করিলেন। ২৭শে ফেবরুয়ারি বুধবার রাত্রি প্রায় ১১টার সময় কেশব বাবু সপরিবারে ও সবান্ধবে কুচবিহারে উপস্থিত হইলেন। পঁহুছিবামাত্র সংবাদ পাওয়া গেল যে, অভ্যর্থনাসূচক কোন প্রকার ধূমধাম করা হইবে না এইরূপ স্থির করা হইয়াছে, এবং সকলে আস্তে আস্তে নগরে প্রবেশ করিবেন। ইহাতে অনেকে ক্ষুণ্ণ হইলেন,

* ভ্রম ক্রমে এই কয়েক পংক্তি প্রথমে নিবিষ্ট হয় নাই, পরে ভ্রম সংশোধিত হয়। (১ বৈশাখ ১৮০০ শকের ধর্ম্মতত্ত্ব দেখ)।

এবং ইহার অবশ্য কোন গূঢ় কারণ থাকিবে এইরূপ সন্দেহ করিতে লাগিলেন। রবিবার পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। সকলে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। পদ্ধতি সম্বন্ধে বার বার কথা উত্থাপন করা হয়, কিন্তু তৎপ্রতি কেহ মনোযোগ করিলেন না। রবিবারে গাত্রে হরিদ্রা হইয়া গেলে সোমবারে মহারাণীদের পক্ষীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রধান পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া কন্যাপক্ষদের বাসা বাটীতে আসিয়া নানা নূতন কথা উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলিলেন কেশব বাবু বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্মণ অথবা অন্য জাতীয় ব্যক্তি পুরোহিত হইতে পারিবেন না, সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা হইবে না, পাত্র কন্যা বিবাহসভায় পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকার করিবেন না, উভয় পক্ষে হোম করিতে হইবে। এ প্রকার কথা শুনিয়া সকলে যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বিবাহের আর এক দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন এ সকল নূতন কথার কিরূপে নিষ্পত্তি হইবে? অনেক বাদানুবাদ হওয়াতে পণ্ডিত মহাশয় অবশেষে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন, এবং যদিও কয়েকটী বিষয় তখন এক প্রকার মীমাংসিত হইল বটে কিন্তু অপরাপর কথা লইয়া ক্রমে প্রবল আন্দোলন হইয়া উঠিল। মঙ্গলবার অধিবাসের দিন, পাত্রীকে সন্ধ্যার সময় রাজ বাটীতে মহা সমারোহপূর্ব্বক লইয়া যাইতে হইবে, লোক জন সমুদায় প্রস্তুত। কিন্তু এ দিকে পদ্ধতি লইয়া রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত মহাতর্ক চলিতে লাগিল। পরিশেষে এমত গোল হইয়া উঠিল যে, বোধ হইল বুঝি বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। বুধবার অর্থাৎ বিবাহের দিবসেও হোম লইয়া তুমুল সংগ্রাম, এক দিকে গবর্ণমেণ্ট এক দিকে রাজ-মাতা, এক দিকে পুরোহিতগণ, অপর দিকে কেশব বাবু ও তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণ, সকলেই আপন আপন পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তর্ক বন্ধ হইয়া গেল। বিবাহ হইবে কি হইবে না, আন্দোলনটী ঘনীভূত হইয়া এই আকার অবশেষে ধারণ করিল। রাজা গবর্ণমেণ্টের অধীন, তাঁহার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যথা ইচ্ছা বিধি করিতে পারেন; অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু কন্যাপক্ষ কোনমতেই পৌত্তলিকতায় যোগ দিতে পারেন না। শেষে এই কথা হইল যে, পূর্ব্ব অঙ্গীকার অনুসারে কন্যাপক্ষের কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র সংস্রব থাকিবে না, এইরূপ

বন্দোবস্ত না করিলে বিবাহ হইতে পারে না। রাত্রি ১১টার সময় তদ্রূপ অনুজ্ঞা আসিল এবং সকলের ভাবনা দূর হইল। বিবাহসভায় উপস্থিত হইয়া আমরা দেখিলাম যে একটী ক্ষুদ্র মণ্ডপের মধ্যে কয়েকটী কলাগাছ ও ৯। ১০টা ঘট এবং এক হাত লম্বা লাল কাপড়ে ঢাকা একটী সামগ্রী রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হইল যে, হয়তো হরগৌরী প্রতিকৃতি, হিন্দু দেবতা পূজার জন্য বিবাহস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ কথা ডিপুটী কমিশনর সাহেবের নিকট তৎক্ষণাৎ জ্ঞাপন করাতে তিনি উহা অস্বীকার করিলেন এবং পণ্ডিতদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া স্পষ্টরূপে বলিলেন যে, ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে পূজার বস্তু কিছুই নাই, এবং কোন হিন্দু দেবতা স্থাপন করা হয় নাই। তাঁহার এবং প্রধান পণ্ডিতের কথায় প্রতীতি হইল যে, মণ্ডপে কিছুমাত্র পৌত্তলিকতা নাই, তবে স্থানীয় প্রাচীন প্রথা অনুসারে কতকগুলি মঙ্গলসূচক দ্রব্য সাজান হইয়াছে। যাহা হউক সাহেবের কথার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। বাগ্দান, স্ত্রী আচার ও পরস্পরের সম্মতি প্রকাশের পর বর বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত হইলে আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া সভাস্থলে ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। তদনন্তর কন্যা সভাস্থ হইলে কেশব বাবু এবং তাঁহার ভ্রাতা বরের পুরোহিত ও কন্যার পুরোহিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় বিবাহমণ্ডপে আসন গ্রহণ করিলেন। পৌত্তলিক দেবতার নাম পরিবর্জ্জন করিয়া প্রচলিত হিন্দু বিবাহের মন্ত্রাদি সংশোধন পূর্ব্বক পঠিত হইলে কন্যা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। পরে ব্রাহ্মরীতি অনুসারে প্রতিজ্ঞা প্রার্থনা ও বর কন্যার প্রতি আচার্য্যের উপদেশ এই কয়েকটী অনুষ্ঠান স্বতন্ত্র স্থানে কতিপয় ব্রাহ্মের সম্মুখে সুসম্পন্ন হইল।

উপরে লিখিত বিবাহ বৃত্তান্ত পাঠে আপনারা সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, যাঁহারা বাল্যবিবাহ ও পৌত্তলিকতার দোষ আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি আরোপ করিয়াছেন তাঁহারা ভ্রমবশতঃ এরূপ কার্য্য করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে গবর্ণমেণ্ট ও কেশব বাবু উভয়ে বাল্যবিবাহের বিরোধী হইয়াও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট যেরূপ অঙ্গীকার ও বিবাহের পর যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদিগের কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস ও নির্ভর যোগ্য। অনেকে বলিতেছেন যে, বয়স সম্বন্ধে কেশব বাবু আপনার

প্রস্তাবিত রাজবিধি (১৮৭২ সালের ৩ আইন) লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং আপনার পূর্ব্ববিশ্বাস ও আচরণের বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এ অভিযোগের বিরুদ্ধে সমূহ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ কুচবিহার স্বাধীন রাজ্য, তাথায় উক্ত বিধি প্রচলিত নহে। কলিকাতায় বিবাহ হইলেও রাজা কুচবিহারে প্রত্যাগমন করিবামাত্র সে বিধিপালনের জন্য তিনি আর দায়ী হইতে পারেন না। এ অবস্থায় বিধি অনুসারে বিবাহ দেওয়া নিষ্ফল ও অনাবশ্যক। এই হেতু বিধি পরিত্যাগ করিতে হইল। রাজা যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইতেন নিশ্চয়ই বিধি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইত, এবং যদি আইন অনুসারে বিবাহ হইত পাত্রপাত্রী উভয়ের সম্বন্ধে বয়সের নিয়ম নিশ্চয়ই পালন করা হইত। কিন্তু ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কেশব বাবু যেন আইনের আশ্রয় নাই লইলেন, তিনি স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যেরূপ সংস্কার প্রকাশ করিয়াছেন ও উপদেশাদি দিয়াছেন তাহার কেন অন্যথা করিলেন? অন্যের বিবাহসম্বন্ধে শক্ত নিয়ম কিন্তু নিজ কন্যার বিবাহে তিনি শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন কেন? তাঁহার পূর্ব্ব আচরণের সঙ্গে বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের বিরোধ কেন? ইতিপূর্ব্বে আচার্য্য মহাশয় অনেক গুলি ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন করাইয়াছেন, তাহাতে কন্যার বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল, যথা, ১১।১২।১৩। এ সকল বিবাহ দিতে তাঁহার কিছু আপত্তি ছিল বটে, কিন্তু তিনি তত সঙ্কুচিত হন নাই, যেহেতু বাল্যবিবাহের দোষ এ সকল বিবাহে বিধিপূর্ব্বক নিবারণ করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মবিবাহের উদীচ্য কর্ম্মে এরূপ স্পষ্ট নিয়ম ছিল যে, ঋতুমতী না হইলে পাত্রী পাত্রের সহিত পত্নীর সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না, তত দিন পর্য্যন্ত বিবাহ কেবল বাগ্দানস্বরূপ থাকিবে। যৌবনাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যার প্রকৃত বিবাহ হওয়া অর্থাৎ পত্নী হওয়া নিষিদ্ধ, ব্রাহ্মসমাজে আইন হইবার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে এরূপ সংস্কার ছিল। যখন রাজবিধি প্রস্তুত হয় তখন কেবল এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইল। নারী জীবনে বাল্যাবস্থা কোন্ সময়ে যৌবনাবস্থায় পরিণত হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া সেই সময় বিবাহপোযোগী বলিয়া নির্ণয় করা হইল। ডাক্তার চার্লস্ সাহেব ১৪ বৎসর যৌবনাবস্থার প্রারম্ভ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। আইনেও ঐরূপ ব্যবস্থা হইল। বাস্তবিক উক্ত বিধির মূল তাৎপর্য্য এই যে যৌবনারম্ভেই কন্যার উপযুক্ত বয়স। এ নিয়ম বর্ত্তমানবিবাহে

পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং কেশব বাবু আপন কন্যার বয়সসম্বন্ধে পূর্ব্ব বিশ্বাসের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ পৌত্তলিকতাসম্বন্ধে যে অভিযোগ তাহাও অমূলক। ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, কন্যার পক্ষে একটু মাত্র পৌত্তলিকতার সংস্রব দেখা যায় না। প্রায়শ্চিত্তের কথা সম্প্রতি শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি, ইহা নিতান্ত অমূলক ও দুঃখজনক। ইহাতে সম্মতি দেওয়া দূরে থাকুক বিবাহের পূর্ব্বে এ কথার প্রস্তাবও হয় নাই। বাস্তবিক কি ঘটিয়াছিল তাহা অনুসন্ধান করিয়া আমরা জানিলাম যে, একটী স্বর্ণমুদ্রা রাজার পিতামহী এক দিন পাত্রীর হস্তে স্পর্শ করাইয়া ভূমিতে রাখিয়াছিলেন। কন্যা ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ইহা কি প্রায়শ্চিত্ত? বস্তুতঃ কন্যার পক্ষে অণুমাত্র পৌত্তলিকতার যোগ ছিল না। পাত্রের পক্ষেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি নিজে পৌত্তলিকতা মানেন না, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের শাসনে ও আদেশে বিবাহের বৈধতা রক্ষার জন্য হোমের সময় তাঁহার কেবল উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। পাত্রপক্ষে রাজমাতা জ্ঞাতি বা পুরোহিতগণ যদি হিন্দুধর্ম্মের অনুরোধে কিছু করিয়া থাকেন ব্রাহ্মেরা সে জন্য দায়ী হইতে পারেন না। বিশেষতঃ এই কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হইবার সময় ইহা স্থির ছিল যে বিবাহে পৌত্তলিকতা থাকিবে না। পাত্রপক্ষে পৌত্তলিক সংস্রব রাখিবার জন্য যে প্রস্তাব হয় তাহা বিবাহের সমুদায় আয়োজন হইয়া যাইবার অনেক কাল পরে করা হয়, এবং তখন বিবাহ হইবার * এক দিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দিবসে রাজা আপনার অপৌত্তলিক বিশ্বাস জ্ঞাপন করিলে ও রাজপণ্ডিত পৌত্তলিক দেবতা বিবাহে উপস্থিত থাকিবে না এরূপ অঙ্গীকার করিলে পর ব্রহ্মোপাসনানন্তর রাজা পাত্রীকে বিধিপূর্ব্বক দেখেন। ১০ তারিখে জুড়ুনীর সামগ্রী দেওয়া হয়। তৎপর দিবস সমারোহপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা সহকারে নির্ব্বন্ধপত্রের অনুষ্ঠান হয়। পত্রে কেশব বাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেন, "সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে বিবাহ সম্পন্ন হইবে।" ১১ দিবসে কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত কেশব বাবুর ভবনে রাজার সম্মিলন হয়। এতদ্ব্যতীত পাত্র এবং পাত্রী উভয়ে অনেক-

---

* ১৮০০শকের ১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে "ভ্রম সংশোধন" দেখ।

বার গুরুজনসমক্ষে এবং ব্রাহ্মপরিবারমধ্যে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাদের অন্তরে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সঞ্চার হয়। প্রণয় যদি বিবাহের মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে ইঁহাদের দুই জনের মধ্যে কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই যে ব্রাহ্ম উদ্বাহের সূত্রপাত হইয়াছে এবং উভয়ে মিলিয়া যে ব্রাহ্মপবিবারভুক্ত হইয়াছেন তাহা অবশ্য মানিতে হইবে। এত দূর বিবাহের আয়োজন অগ্রসর হইবার পর পৌত্তলিকতার প্রতিপোষক কোন প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্তু এরূপ প্রস্তাব করাতে গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় লোকদিগের প্রতি আমরা অসদভিপ্রায় বা অসদ্ব্যবহারের দোষারোপ করিতে পারি না। তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্যসাধন করিতে গিয়া যদি আমাদের ইচ্ছায় প্রতিঘাত করিয়া থাকেন সে বিষয়ে আমাদের অভিযোগ করিবার কিছু নাই। সুযোগ্য ডিপুটী কমিশনার সাহেব বহু বিঘ্নসত্বেও শেষ পর্য্যন্ত অঙ্গীকার পালনে চেষ্টা ও সঙ্কটের সময় বিশেষ অনুকূলতা প্রদর্শন করাতে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

"অবশেষে আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্র খানি নিরপেক্ষ ও শান্তভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। যখন সকল বিবাদ বিসংবাদ চলিয়া যাইবে, তখন অনেকে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন যে, কেশব বাবু চিরদিনই পৌত্তলিকতা ও বাল্যবিবাহের বিরোধী এবং বিপক্ষদল যাহা বলুন না কেন তাঁহার জীবন নিঃস্বার্থভাবে প্রচারব্রতে সর্ব্বদা ব্রতী। পৃথিবী জানুক যে এই বিবাহে তিনি একটী পয়সা যৌতুক প্রার্থনা করেন নাই, এবং হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশের জন্য একটু মাত্র চেষ্টা করেন নাই। পৃথিবী জানুক যে সঙ্কোচ জাতির সহিত এই অসবর্ণ বিবাহে তিনি বিশেষরূপে জাতিচ্যুত হইলেন, এবং ঈশ্বরাদেশে রাজঘরে কন্যা দিয়াও নিজে নির্লোভী ও অসংসারী রহিলেন।"

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
প্রচারকসভার সম্পাদক।

মন্তব্যোপরি মন্তব্য।

বিবাহের আমূল বৃত্তান্ত বাহির হইল। যাঁহারা এত দিন দোলায়মানচিত্ত

ছিলেন, তাঁহাদের চিত্তে ধৈর্য্য সমাগত হইল। তাঁহারা বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন কেশবচন্দ্রের পক্ষে বিবাহে কোন ত্রুটি সংঘটিত হয় নাই। তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছেন। এ সময়ে সংবাদপত্রে যে সকল মতামত প্রকাশ পায় তাহাতে কেশবচন্দ্রের বিবেকিত্ব ও চরিত্রের বিশুদ্ধত্বসম্বন্ধে রেখামাত্র কলঙ্কপাত হয় না। এমন কি বিরোধিগণও প্রকাশ্য পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের ভ্রান্তি ভিন্ন অন্য দোষারোপের প্রতিবাদ করিয়াছেন *। তবে ইঁহারা যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেন, সংক্ষেপে এ স্থলে তাহার সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই সকল আপত্তিকে এই কয়েক বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—(১) আদেশ; (২) কুচবিহারের রাজার ব্রাহ্মত্ব বা অব্রাহ্মত্ব; (৩) বর কন্যার শরীর মনের বিবাহার্থ উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা; (৪) বিবাহপদ্ধতি; (৫) বাগ্দান; (৬) বিবাহকালে পৌত্তলিকতাদোষসংস্রব।

১। আদেশ। আদেশসম্বন্ধে এই সময়ে প্রকাশ্য আন্দোলন উপস্থিত। বিবাহের বৃত্তান্ত পাঠানন্তর ষ্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকা এই আদেশবাদের বিরুদ্ধেই লেখনী চালনা করেন। ইনি বলেন, আদেশবাদ অতি ভীষণ মত, ইহার দোহাই দিয়া যে কোন প্রকারের অন্যায় আচরণ ন্যায়াচরণ বলিয়া লোকে প্রতিপাদন করিতে পারে। যদি কেশবচন্দ্র বিনা সকলেই আদেশ প্রাপ্ত হন স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে আদেশের ছল করিয়া বিবিধ অনীতি অনুবর্ত্তন করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদক যখন প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এ কথা বলিয়াছেন তখন এরূপ কথা তাঁহার মুখে শোভা পায় নাই কি প্রকারে বলা যাইবে? ওল্‌ডটেষ্টমেণ্টে আদেশের নামে যুদ্ধ বিগ্রহ শোণিতপাত সকলই ঘটিয়াছে। সুতরাং কেশবচন্দ্রের আদেশবাদ যদি ওল্ডটেষ্টমেণ্টের আদেশবাদ হয় তাহা হইলে ভয়ের বিলক্ষণ কারণ আছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র যে আদেশবাদ বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে

---

* "Suffice it to say that the protesters thought, the whole Brohmo public thought, Babu K. C. Sen to have fallen into a grave mistake, but no one ever attributed any base motive for his action."—*Brahmo public Opinion, April 18, 1878,*

নীতির কোন কালে অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। নীতিরবিরোধী আদেশ আদেশমধ্যে গণ্য হইতে পারে না, ইহাই বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ মত। এ আদেশ একা কেশবচন্দ্র পাইতেন, আর কোন ব্রাহ্ম পাইতেন না তাহা নহে। বিবেকের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের আদেশসমাগম, ইহাতে সকল ব্রাহ্মেরই সমান অধিকার। অপরের আদেশপ্রাপ্তিতে অধিকার কেশবচন্দ্র এত দূর স্বীকার করিতেন যে, বিরোধিগণের প্রতিবাদসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি যে কার্য্যে আদেশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সে কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে প্রতিবাদিগণ ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না? যদি তাঁহারা আদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, উহার সম্মাননা করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন, অন্যথা আদেশের বিরুদ্ধে মানবীয় বুদ্ধির কথা শ্রবণ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। বিরোধিগণ তৎকালে আদেশবাদেরই বিরোধী ছিলেন, আদেশের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করাকে অন্যায় মনে করিতেন, সুতরাং তাঁহারা আদেশ পাইয়া প্রতিবাদ করিতেছেন ইহা বলা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

কেশবচন্দ্র স্বীয় কন্যার বিবাহসম্বন্ধে আদেশ পাইয়াছেন, এ কথার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ না করিয়া, ঈশ্বর এরূপ আদেশ দিতে পারেন না, কেন পারেন না, তাহারই বিচার বিরোধিগণ উপস্থিত করিয়াছেন। যখন বর ও কন্যার এখনও উপযুক্ত বয়স হয় নাই, উভয়ের বিবাহোপযোগী শিক্ষাদির অভাব আছে, বরের ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসসম্বন্ধে স্পষ্ট সংশয়, তখন ঈশ্বর কি প্রকারে আদেশ দিবেন, বিবেক বিবাহে সায় দিবেন ইত্যাদি যুক্তির দ্বারা আদেশপ্রাপ্তি একান্ত অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিয়াছেন। সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া মন যে সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সিদ্ধান্তই যদি আদেশ হয়, তাহা হইলে বিরোধিগণের প্রদর্শিত যুক্তির অর্থ থাকে। আদেশপ্রাপ্তি যুক্তিবিচারসাপেক্ষ নহে। আদেশ পাইলে তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়, উহা যুক্তিবিচারের বিরোধী নহে, উহার মধ্যে যুক্তি বিচার সকলই পূর্ণ মাত্রায় অন্তর্ভূত হইয়া আছে। অমুকের সহিত অমুকের বিবাহ দিব কি না? এ প্রশ্ন ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত করিলে যদি তিনি বলেন, 'অমুকের সহিত অমুকের বিবাহ দাও' তাহা হইলেই জানিতে পাওয়া গেল, এ বিবাহের বিরোধে কোন যুক্তি বিচার নাই, থাকিলে

কখন ঈশ্বর এরূপ আদেশ দিতেন না। আদেশ প্রাপ্ত হইলে যে যে স্থলে যুক্তি ও কারণ সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না, সে সে স্থলে ক্রমিক আলোক লাভ দ্বারা অন্ধকার তিরোহিত করিয়া দিয়া যুক্তি ও কারণ বুঝিয়া লওয়া, ইহাই আদেশবাদের পন্থা। আদেশপ্রতিপালনের পন্থা অন্বেষণেও এই প্রকার নিয়ম। সুতরাং কেশবচন্দ্রের কার্য্যপ্রণালীতে বিরোধিগণ যদি এরূপ ক্রমিক বস্তু দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা আদেশবাদের কোন প্রকারে বিরোধী নহে।

২। রাজার ব্রাহ্মত্ব ও অব্রাহ্মত্ব। বিরোধিগণ কুচবিহারের রাজার অব্রাহ্মত্বের বিশেষ প্রমাণ এই উপস্থিত করেন যে, মান্দ্রাজের একটী কন্যার সঙ্গে রাজার হিন্দুবিবাহ হওয়া স্থির হইয়া যায়। যদি সে বিবাহ না ভাঙ্গিত তাহা হইলে রাজা হিন্দুমতে বিবাহ করিতেন। তিনি হিন্দুমতে বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন,এরূপ অবস্থায় তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস আছে,কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিলেও যখন অনেকে ব্রাহ্মসমাজমধ্যে অনুষ্ঠানে হিন্দু আছেন, তখন এ যুক্তি উপস্থিত করিয়া রাজার ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস নাই ইহা সপ্রমাণ হয় না। ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, আনুষ্ঠানিক ও নিরনুষ্ঠানিক। যাঁহারা নিরনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম তাঁহারা যদি পূর্ব্বে কোন কোন অনুষ্ঠান হিন্দুমতে করিয়া শেষে ব্রাহ্মধর্ম্মমতে অনুষ্ঠান করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে কে আর তাঁহাকে আদরের সহিত আনুষ্ঠানিক দলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন? এক বার অনুষ্ঠান করিয়া আবার অনুষ্ঠান না করেন, এ সংশয় করিয়াই বা কে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকেন? অনেক ব্রাহ্মের এরূপ দুর্দশা হইয়াছে দেখিয়াও সর্ব্বদা আমাদিগকে নিরনুষ্ঠানিকগণকে অনুষ্ঠানে অগ্রসর দেখিলে তখনই গ্রহণ করিতে হয়, পরে তাঁহার ঠিক থাকা না থাকার জন্য তিনি দায়ী। কেশবচন্দ্র নিরনুষ্ঠানিক বরকে এই বিশ্বাসে কন্যা দান করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি আনুষ্ঠানিকই থাকিবেন। প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, কেশবচন্দ্রের এরূপ বিশ্বাস করা কিছু অসঙ্গত হয় নাই।

রাজা "ব্রাহ্মস্বভাববিশিষ্ট" এ কথার অর্থ বিরোধিগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মস্বভাবই বা কি, অব্রাহ্মস্বভাবই বা কি? মানবস্বাধা-

রূপ স্বভাবই কি ব্রাহ্মস্বভাব নহে? এ সকল কুটিল প্রশ্ন সহজে মনে উপস্থিত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবস্বভাব ব্রাহ্মস্বভাব হইলেও জনসমাজে স্বভাবের বিকারেরই নিতান্ত আধিক্য। যেখানে স্বভাব অবিকৃত আছে, বিনয় ও নিরহংকার আছে, বিষয়ানুরাগের অল্পতা বিদ্যমান, সেখানে 'ব্রাহ্মস্বভাববিশিষ্টতা' আমরা সহজে দেখিতে পাই। রাজাতে যে আজ পর্য্যন্তও সে স্বভাবের অভাব হয় নাই, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা ইহার প্রমাণ দিবেন। 'রাজা যে ব্রাহ্ম অথবা একেশ্বরবাদী 'খ্রিষ্ট' তাহা লিখিয়া দিতে হইবে' এই নিবন্ধনটি সম্বন্ধে বিরোধিগণ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, লিখিয়া দিলেই কি কেহ ব্রাহ্ম হয়? 'লিখিয়া দিলেই ব্রাহ্ম হয়' এই নিয়ম ব্রাহ্মসমাজে অনেক দিন হইল প্রচলিত আছে। 'আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করি," এই কথাগুলিতে স্বাক্ষর করিয়া দিয়া কত ব্যক্তি ব্রাহ্ম হইয়াছেন, ইহা আর কে না জানেন? রাজা যদি সেইরূপ লেখায় বিশ্বাস জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার কারণ কি আছে? ভবিষ্যতে যদি তিনি আপনার লেখামত বিশ্বাস রক্ষা না করেন, এ সংশয় করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে কাহাকেও আর গ্রহণ করিবার উপায় থাকে না; পঁচিশ বৎসর এক জন ব্রাহ্ম থাকিয়া পরে বিশ্বাস জ্ঞাপন করিলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইবে, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। রাজা পূর্ব্বে কোন দিন ব্রহ্মমন্দিরে আসেন নাই, উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, এ আপত্তিও প্রচুর নহে। রাজা কখন পূর্ব্বে কলিকাতায় ছিলেন না, অন্যত্র শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন, শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহার পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস চলিয়া গিয়া একেশ্বরে বিশ্বাস স্থিরতর হইয়াছে, ইহা জানিলেই যথেষ্ট।

৩। বর ও কন্যার শরীর মনের বিবাহার্থ উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা। এখানে বয়স ও শিক্ষা এ উভয়সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত হইতেছে। এ কথা ঠিক যে কন্যার চতুর্দ্দশ, এবং বরের অষ্টাদশ বর্ষের কথা দূরে ষোড়শ বর্ষও পূর্ণ হয় নাই। বিবাহের আইনে ন্যূন পক্ষে যে বয়স ধরা হইয়াছে তাহাও এখানে যখন পূর্ণ হইল না, তখন অপূর্ণ বয়সে বিবাহদান অবশ্য গর্হিত মনে হইতে পারে। গর্হিত মনে হয় বলিয়াই কেশবচন্দ্র প্রথমে বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন

না। গবর্ণমেণ্ট যখন অঙ্গীকার করিলেন এ বিবাহ বিবাহ নহে, অর্থাৎ বর কন্যার স্বামিস্ত্রীরূপে একত্র বাসের হেতু হইবে না, তখন আর কেশবচন্দ্রের আপত্তি করিবার কারণ অল্পই থাকিল। গবর্ণমেণ্ট এ অঙ্গীকার না করিলে, তিনি কুচবিহারের অপর কাহারও অঙ্গীকারে ঈদৃশ সম্মতি কখন দিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, গবর্ণমেণ্ট যে অঙ্গীকার করিবেন, সে অঙ্গীকার অবশ্য প্রতিপালিত হইবে। লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম মিউর, ডেলিনিউস, এবং ইংলণ্ডের অনেকগুলি পত্র বয়সের অল্পতা সত্ত্বেও বিবাহ অনুমোদন করেন, এবং এইরূপ বলেন যে, যে স্থলে "একটি রাজ্যের ভাবী কল্যাণ নির্ভর করিতেছে" সে স্থলে "বয়সবিবেচনায় যদি কেশবচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেন তাহা হইলে গুরুতর দায়িত্ব তাঁহার উপরে নিপতিত হইত।" কেশবচন্দ্রের এইরূপ মতবশতই তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যখন রাজাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবেন অথচ বাগ্দানস্বরূপ বিবাহ না দিয়া রাজাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে পারেন না বলিয়া নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন, তখন কেশবচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের কথা রক্ষা করিলেন, ইহাতে কোন দোষ স্পর্শিতেছে না। বয়সের নিয়ম কার্য্যতঃ রক্ষা করা হইবে, গবর্ণমেণ্ট যখন এ অঙ্গীকার করিলেন, তখন কুচবিহারে যখন বিবাহের আইন খাটে না তখন সে দেশের সম্পর্কে বয়সের বিচার অকিঞ্চিৎকর। ব্রাহ্মগণ মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে অপূর্ণ বয়সে অনেক বিবাহ হইয়াছে, তাহাতে এই প্রকার নিবন্ধন ছিল যে, কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বরকন্যা স্বামিস্ত্রীসম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মবিবাহের উদীচ্যকর্ম্মে এই নিয়মের স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, পর সময়ে এ নিয়ম ব্রাহ্মগণ স্বতঃ রক্ষা করিবেন ইহা জানিয়া আর কন্যার সম্মুখে তাদৃশ কথা উচ্চারিত হইত না। কোন কোন বিবাহে এরূপ কথা উচ্চারিত হয় নাই প্রতিবাদিগণের ইহা বলিয়া দোষ ধরিবার কোন কারণ নাই। যে দুই বিবাহ তাঁহারা দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার একটি বিবাহে কন্যা যৌবনলক্ষণাক্রান্তা ছিলেন, অপর বিবাহে বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে স্বামিস্ত্রীসম্বন্ধ ঘটে নাই।

পাত্র পাত্রীর বিবাহের উপযুক্ত শিক্ষা হইয়াছিল কি না? এ প্রশ্ন লইয়া বিচার অনধিকারচর্চ্চা। কেশবচন্দ্র কন্যার বিবাহের জন্য কোন চিন্তা করেন

নাই, বিবাহসম্বন্ধে তিনি সম্যক্ প্রকারে ভগবানের উপর নির্ভর করিতেন, এ কথার সহিত তিনি কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করেন নাই, ইহার কোন যোগ নাই। বিবাহের জন্য শিক্ষা এবং বিদ্যাদি শিক্ষা এ দুইয়ের কি কোন পার্থক্য আছে? বিদ্যাদি শিক্ষা দ্বারা মনোবৃত্তি বিকাশ লাভ করে, সর্ব্বপ্রকারের কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে কি বিবাহসম্পর্কীণ কর্ত্তব্যজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় না? চতুর্দ্দশ বৎসরের কয়েক মাস বাকি ছিল, ইহাতেই কি শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল? এবং সেই কয়েক মাস পূর্ণ হইলেই কি শিক্ষা পূর্ণ হইত? ফলতঃ কেশবচন্দ্র চিন্তিত সংসারী ছিলেন না বলিয়া আপনার কন্যার শিক্ষা- ও উপযোগিতাবিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে। তিনি মনুষ্যপ্রকৃতির গভীরতম স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এক জনের চরিত্র ও মনের গতি বুঝিয়া লইতেন, তিনি আত্মকন্যার চরিত্র, মন ও উপযোগিতা জানিতেন না, এ কথা বলা সাহসিকতা। কেশবচন্দ্র যে উপযোগিতা আপনার কন্যার ভিতর দেখিয়াছিলেন, সে উপযোগিতাবিষয়ে যে তাঁহার ভ্রম হয় নাই, তাহা পরসময়ে প্রমাণিত হইয়াছে। রাজার বিবাহের উপযোগিতা ছিল কি না, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিফল। রাজপরিবারে বিবাহসম্বন্ধে উপযোগিতা অন্য সমুদায় পরিবারের ব্যক্তি হইতে সত্বর উপস্থিত হয়, ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ আছে। এ কালের কথা দূরে মহাভারতের সময়েও বিশেষ স্থলে ষোড়শবর্ষীয় রাজতনয়ের বিবাহ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট রাজাকে শিক্ষিত ও উপযুক্ত জানিয়াই বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া শিক্ষার পূর্ণতা সাধন জন্য ইংলণ্ডে লইয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, এ কথা স্মরণ করিলে আর এ সম্বন্ধে কোন বিতর্কে প্রয়োজন দেখা যায় না।

৪। বিবাহপদ্ধতি। পৌত্তলিকতাবিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ হিন্দুপদ্ধতি ব্রাহ্মপদ্ধতি কি না এ প্রশ্ন শুনিতে নিতান্ত গুরুতর, কিন্তু মূল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তত গুরুতর মনে করিবার কোন কারণ নাই। ব্রাহ্মবিবাহ যৌবন বিবাহ, এ জন্য পদ্ধতি কিছু বিশেষ করিতে হইয়াছে, যেমন উভয়ের সম্মতি গ্রহণ। উদ্বাহপ্রতিজ্ঞার * প্রথমাংশ আইনের অনুবোধে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই

---

* উদ্বাহপ্রতিজ্ঞায় কন্যা পাত্রের নাম উল্লেখ করেন ইহা বর্ত্তমান লৌকিক ব্যবহারে অহিন্দু বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিবাহপদ্ধতিতে ধ্রুবতারা দেখাইবার পর কন্যা যখন প্রতিজ্ঞা

দুই ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই হিন্দুপদ্ধতি হইতে বরণাদির মধ্যে যে সকল পৌত্তলিকতাংশ আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন, "এই অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন," এ স্থলে হিন্দুবিবাহ-পদ্ধতিতে অর্ঘ্য দেবতা, এবং সেই দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া জামাতা বলেন, "হে অর্ঘ্য, তুমি অন্নের দীপ্তিস্বরূপ, আমি যেন তোমার অনুগ্রহে দীপ্তিস্বরূপ হই।" "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক" এ মন্ত্র হোমান্তে জামাতা যখন অন্ন গ্রহণ করেন, সেই স্থল হইতে গৃহীত হই-য়াছে। এ স্থলে বৈদিক অন্নদেবতার প্রাধান্য। দেবসন্নিধানে প্রার্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রাহ্মবিবাহে সে সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রটি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রের সঙ্গে আর একটি মন্ত্র সংযুক্ত করা হইয়াছিল, সেটি সপ্তপদীস্থানে পঠিত হইত; "আমার ব্রতে তোমার হৃদয় স্থিতি করুক, আমার চিত্তের মত তোমার চিত্ত হউক।" এই মন্ত্রটির মধ্যে বৃহস্পতির নিকটে প্রার্থনা আছে। কলিকাতাসমাজ 'বৃহস্পতি' শব্দের স্থলে 'ধর্ম্মাবহ' শব্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এরূপ শব্দপরিবর্ত্তন ধর্ম্ম ও সত্যসঙ্গত নয় বলিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতিতে ঐ মন্ত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। "তুমি আমার সখা হও আমি তোমার সখী হই" এ মন্ত্রটি সপ্ত পদ গমনানন্তর যে আশীর্ব্বাদ উচ্চারিত হয়, তদনুরূপ করিয়া নূতন রচিত। এ মন্ত্রের দেবতা কন্যা, কিন্তু ব্রাহ্মবিবাহে তাদৃশ দেবতার কোন সংস্রব নাই। ভারসম্প্রদান যে প্রণা-লীতে নির্ব্বাহ হয় উহাও হিন্দুবিবাহের পদ্ধতিসঙ্গত। পূর্ব্বে ইহাতে কিছু ইতর বিশেষ ছিল না, কলিকাতাসমাজের পদ্ধতিতে উহা অবিকল গৃহীত হই-য়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কন্যাসম্প্রদান ও গোত্রাদির উল্লেখ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেন না কন্যা দানীয় সামগ্রী নহেন, গোত্রাদি নিতান্ত অনিশ্চিত বিষয়। ব্রাহ্মবিবাহে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া যে মন্ত্রাদি গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কুচবিহারবিবাহে হিন্দুবিবাহের পৌত্তলিকতাংশ বিবর্জ্জন করিয়া পদ্ধতি স্থির করাতে কি যে ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, যাঁহারা হিন্দুবিবাহপদ্ধতির

করিতেছেন 'পতিকুলে ধ্রুবতারার ন্যায় অচল হইয়া থাকিব' তখন তাহাতে আমি অমুকের অমুকী বলিয়া নামোল্লেখ করার প্রথা আছে।

আদ্যন্ত সমালোচনা করিবেন, তাঁহাদের সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের যে উচ্ছেদ ঘটিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিবাহের প্রায় সকল মন্ত্রগুলি বৈদিক। বৈদিক মন্ত্রের একটি বর্ণের স্খলন হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, ইহা সকল হিন্দুর বিশ্বাস। "মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ," স্বরবর্ণে হীন হইলে বা মিথ্যাপ্রয়োগ করিলে কেবল সে অর্থ হয় না তাহা নহে, "স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি" সেই বাগ্বজ্র যজমানকে হিংসা করে। বৈদিক মন্ত্রগুলিকে উড়াইয়া দিয়া বা ব্যতিক্রম করিয়া হিন্দুবিবাহ দাঁড়াইতে পাবে, ইহা কোন প্রকারে কোন হিন্দু বলিতে পারেন না! কেশবচন্দ্র ও গবর্ণমেণ্ট কুচবিহারবিবাহে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে কিরূপ আঘাত করিয়াছেন তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রতিবাদিগণ মনে করিয়াছেন, বিষ্ণুশব্দের স্থলে ব্রহ্মশব্দ (ব্রহ্মশব্দ উচ্চারিত হয় নাই ঈশ্বর-শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল) পরিবর্ত্তন করা আর একটা বিশেষ কি? হিন্দুবিবাহ-পদ্ধতিতে গ্রন্থিবন্ধনে ও সপ্তপদীগমনের মধ্যে বিষ্ণুশব্দ আছে, অন্যত্র বিষ্ণু শব্দের প্রয়োগ নাই। বিবাহমন্ত্রসমুদায়ের প্রধান দেবতা—সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল, প্রাতঃসন্ধ্যা, দিবা রজনী, বায়ু, দিক্‌পতি পৃথিবী, আকাশচর দেবগণ, বিরাট্‌, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কাম, অগ্নি, দ্যুলোক, বৃহস্পতি, বিশ্বেদেবা, পূষা, কন্যা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, ধ্রুব। এক পৌত্তলিকতাবিবর্জ্জনপ্রতিজ্ঞায় এতগুলি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা বহিষ্কৃত, অবমানিত, ধিক্কৃত হইয়াছে ইহা কি সামান্য কথা!

বিবাহপদ্ধতির অস্থিরাবস্থায় কুচবিহারে গমন করিয়া কেশবচন্দ্র আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলেন, ইটি তাঁহার পক্ষে বিবেচনার কার্য্য হয় নাই, এ ভ্রম অনেকেরই মনে রহিয়াছে। "সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন" ধর্ম্মতত্ত্বে ও তাহার অনুবাদ মিরারে যখন বাহির হয় তখন ভ্রমক্রমে একটি টেলিগ্রামের কোন উল্লেখ হয় না। পরিশেষে পর পক্ষের ধর্ম্মতত্ত্বে ঐ ভ্রম সংশোধিত হয়। এখনও পদ্ধতি স্থির হয় নাই এই কথার প্রতিবাদের উত্তর রবিবার অপরাহ্নে কুচবিহার হইতে এইরূপ আইসে যে, আপনি আমাদের প্রতিনিধির নিকটে প্রচলিত হিন্দুরীতি যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতে ইতিপূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়াছেন সেই রূপ করা হইবে। দুঃখের বিষয় এই, যাঁহারা ব্রাহ্মগণের প্রতি নিবেদনের ইংরেজী

অনুবাদ দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর সংশোধন ইংরাজীতে অনুবাদিত দেখিতে পান নাই। সুতরাং পরসময়ে যাঁহারা কেশবচন্দ্রের জীবন লিখিয়াছেন, তাঁহারাও কেশবচন্দ্রের বিবেচনার কার্য্য হয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যখন সংশোধিত পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে, এরূপ টেলিগ্রাম কুচবিহার হইতে সমাগত হইল, তখন আর তথায় গমন করিবার কি বাধা থাকিতে পারে? পদ্ধতি অনির্দ্ধারিত থাকিবার অবস্থায় গেলে অবশ্য সাহসিকতা হইত, কিন্তু যখন সংশোধিত পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে, ইহা কেশবচন্দ্র জানিতে পাইলেন, তখন আর কে তাঁহার প্রতি অবিমৃশ্যকারিতার দোষারোপ করিতে পারে?

৫। বাগ্দান।—হিন্দুগণের বিবাহমাত্রই বাগ্দান, কেন না বিবাহের পরই স্বামিস্ত্রীভাব হয় না, প্রতিবাদিগণ এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া বাগ্দান যে একটা বিশেষ কিছু নহে ইহা প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে বিবাহব্যাপার যে বাগ্দানস্বরূপ রক্ষিত হয় ইহা অনেকট বলা যাইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশে ত্রিরাত্রির পরই যে এ নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহা আর কে না জানেন? বঙ্গদেশের এ বিষয়ে এমনই কুরীতি যে তাহা স্মরণ করিলেও ঘৃণা হয়। কুচবিহারপ্রদেশে এ সম্বন্ধে যে প্রকার অনীতি প্রচলিত, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, বিবাহকে বাগ্দানরূপে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কত দূর উচিত কার্য্য হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ বলপ্রকাশও ঘটিয়াছিল।

৬। বিবাহকালে পৌত্তলিকতাদোষসংস্রব। এই বিষয়টি ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিবার বিষয়। যখন কন্যাযাত্রী বিবাহসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন তখন দেখিতে পাইলেন বিবাহমণ্ডপে ঘট ও বস্ত্রাচ্ছাদিত কি একটি পদার্থ সজ্জিত রহিয়াছে। একতো ঘট দেখিলেই ভয় হয়, তাহার উপর আবার বস্ত্রাচ্ছাদিত বস্তু, ইহাতে সহজেই মনে সংশয় উপস্থিত হইবার কথা যে, বিবাহমণ্ডপে পৌত্তলিক দেবতা স্থাপিত রহিয়াছে। কোন প্রকার পৌত্তলিকতাসংস্রব না হয় এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ডিপুটী কমিশনর বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নিকটে এই গভীর সংশয়ের কথা উত্থাপিত করা হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ মণ্ডপস্থ প্রধান পণ্ডিতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল এ সকলের মধ্যে কোন পৌত্তলিক দেবতা আছে কি না? পণ্ডিত উহা অস্বীকার

করিয়া বলিলেন, না, কোন দেবতা নাই, এ সকল যাহা সজ্জিত রহিয়াছে, ইহা দেশীয় প্রথানুসারে মাঙ্গলিক বস্তু। প্রধান পণ্ডিতের এরূপ উক্তিতে কন্যাপক্ষের কাহারও কাহারও মনে সন্তুষ্টি হইল না; তাঁহারা নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ডেপুটি কমিশনর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া ফিরুশিগণের সহিত এরূপ নির্ব্বন্ধের তুলনা করিলেন এবং বলিলেন যখন পণ্ডিতেরা পৌত্তলিক দেবতা আছে ইহা অস্বীকার করিতেছেন, মঙ্গল দ্রব্য ভিন্ন কিছু নাই বলিতেছেন, তখন আর কি করা যাইতে পারে?

বিবাহমণ্ডপে মঙ্গলদ্রব্য ছিল পুত্তলিকা ছিল না, ইহাতে পৌত্তলিকতার সংস্রব ঘটিল না মানা গেল, কিন্তু বরের হোমস্থলে উপস্থিতি, ইহা কি পৌত্তলিকতাসংস্রব নহে? রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক, তিনি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার অধীন, সুতরাং আজ্ঞাপালনার্থ হোমস্থলে বসিতে বাধ্য হইলেন হউন, কিন্তু এ বসাতে হোম সিদ্ধ হইল কি না, এবং হোমসিদ্ধ হওয়াতে পৌত্তলিকতার দোষ সমুদায় বিবাহে সংক্রান্ত হইল কি না? কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ এই দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ এইরূপে পৌত্তলিকতার দোষসংস্পৃষ্ট হইলে অন্য পক্ষেও কি সে দোষ আসিয়া স্পর্শ করে না? দোষ স্পর্শ করিবে কি প্রকারে? এ অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানই নয়, কেবল সাধারণ লোকের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ ও মিথ্যা কপটাচার। কন্যা হোমে যোগ না দিলে হোম কোন প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না। হোমকালে যত গুলি অনুষ্ঠানের বিষয় আছে তন্মধ্যে এমন একটিও কিছু নাই যাহার মধ্যে কন্যা উপস্থিত না থাকিলে উহা সিদ্ধ হইতে পারে। এই অনুষ্ঠানটি বরপ্রধান নহে কন্যাপ্রধান। কন্যা যজ্ঞ না করিলে ভার্য্যাত্বই সিদ্ধ হয় না। কুচবিহারের রাজা অনার্য্যজাতি, হোমে তাঁহার কি অধিকার? ব্রাহ্মণগণ হোম করিলেই হইল, এ কথা বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই; কেন না শূদ্রজাতির বিবাহে হোম হয় না, সপ্তপদী গমন নাই; অথচ তাঁহাদিগের বিবাহেও অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কন্যার অঞ্জলি দ্বারা অগ্নিতে লাজ (খৈ) বিসর্জ্জন করাইতে হয়। এই লাজবিসর্জ্জন বিনা ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হয় না, সম্প্রদানাদি কিছুই স্থির থাকে না, দোষ দেখাইয়া বিবাহ ভাঙ্গিলেও ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে; লাজবিসর্জ্জন হইয়া গেলে আর বিবাহ কদাপি ভঙ্গ হয় না কুচবিহারের বিবাহে হোমানুষ্ঠান একটি বৃহৎ বঞ্চনার ব্যাপার। যদি কোন

সন্তাপের কারণ থাকে,তবে সে সন্তাপের কারণ এই যে, এরূপ বঞ্চনা স্বয়ং কর্তৃপক্ষ হইতে দিলেন, ধর্ম্মব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ জানিয়া শুনিয়া তাহার অনুমোদন করিলেন। এ যে কিছুই হইল না কন্যাপক্ষ জানিতেন, কিন্তু জানিয়াও তাঁহা-দিগকে এই মিথ্যাচারণের জন্য সন্তপ্ত হইতে হইয়াছিল, এবং তাঁহারা সকলেই দুঃখিত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এখন দেখা যাউক, কন্যা বিনা হোমক্রিয়া সিদ্ধ হয় কি না? দণ্ডপ্রণয়ন অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন;—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু কচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়াহি তাঃ॥

৮অ. ২২৬ শ্লোক।

এই বচন দ্বারা আমরা এই পাইতেছি যে, হোমসংযুক্ত পাণিগ্রহণিক মন্ত্র-গুলি কন্যাতে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং কন্যা না থাকিলে মন্ত্রগুলি নিষ্ফল হয়। কেন না লাজবিসর্জ্জন দ্বারা কন্যাই যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করেন। টীকাকার কল্লূক বলিয়াছেন;—

'অর্য্যমণং দেবমগ্নিমযক্ষত' ইত্যাদি বৈবাহিকা মনুষ্যাণাং মন্ত্রাঃ কন্যাশব্দ-শ্রবণাৎ কন্যাস্বেব ব্যবস্থিতা নাকন্যাবিষয়ে কচিৎ শাস্ত্রে ধর্ম্ম্যবিবাহসিদ্ধয়ে ব্যবস্থিতাঃ।

"'অর্য্যমা দেব অগ্নিকে (কন্যাগণ) পূজা করিয়াছেন' ইত্যাদি মানবগণের বৈবাহিকমন্ত্রে কন্যাশব্দ শুনাতে উহারা কন্যাগণেতেই ব্যবস্থিত,কন্যা না * থাকিলে কোথাও ধর্ম্ম্যবিবাহসিদ্ধির জন্য উহারা ব্যবস্থিত হয় নাই।" কন্যা লাজবিসর্জ্জন দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন না করিলে যে ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না, মনু তাহা আপনি বলিয়াছেন;—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥

৮ অ, ২২৭ শ্লোক।

টীকা—বৈবাহিকা মন্ত্রা নিয়তং নিশ্চিতং ভার্য্যাত্বে নিমিত্তম্। তৈর্যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তৈর্ভার্য্যাত্বনিষ্পত্তেঃ। তেষান্তু মন্ত্রাণাং 'সখা সপ্তপদী ভব' ইতি মন্ত্রেণ কন্যায়াঃ

---

* 'কন্যা না থাকিলে' কন্যকাবস্থা না থাকিলে, এ প্রকার অর্থ এ স্থলে হইলেও বিবাহার্থিনীর উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা যথাযথ এ বচনেও রহিয়াছে।

সপ্তমে পদে পদে ভার্য্যাত্বনিষ্পত্তেঃ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সমাপ্তির্বিজ্ঞেয়া। এবঞ্চ সপ্তপদী-দানাৎ প্রাক্ ভার্য্যাত্বানিষ্পত্তিঃ, সত্যনুশয়ে জহ্যাৎ নোর্দ্ধম্।

"বৈবাহিক মন্ত্রগুলি নিশ্চিত ভার্য্যাত্ব সম্পাদন করে। যথাশাস্ত্র সেই সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিলে ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয়। সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে 'সখা সপ্তপদী ভব' এই মন্ত্রের দ্বারা কন্যার সপ্তম পদ প্রদত্ত হইলে ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয়, এ জন্য শাস্ত্রকারেরা [ইহাকে] বিবাহসমাপ্তি বলেন; সুতরাং সপ্তপদী দানের পূর্ব্বে ভার্য্যাত্ব যখন নিষ্পন্ন হয় না তখন যদি [দোষ জানিয়া] পশ্চাত্তাপ হয় ত্যাগ করিবে, [সপ্তপদী হইয়া গেলে] আর [ত্যাগ] হয় না।" বৈবাহিক মন্ত্রগুলির একটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই সকলে দেখিতে পাইবেন উহাতে ভার্য্যাত্ব সম্পন্ন হয় কেন?

ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতি গাহেমহি দ্বিষঃ।

"এই কন্যা পিতৃকুল হইতে পতিকুলে গমন করিয়া বৈবাহিক ব্রতে উত্তীর্ণ হইয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। হে কন্যে, যেমন জলধারা তৃষ্ণা বিনাশ করে, সেইরূপ তোমার সহিত আমরা শত্রুদিগকে আক্রমণ করিব।" পিতৃকুল হইতে পতিকুলে গমন এবং বৈবাহিক ব্রতে উত্তীর্ণ হওয়া ভার্য্যাত্ব নিষ্পাদন প্রদর্শন করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কন্যাকে যজ্ঞ হইতে নিষ্কৃতি দান না করিলে কেশবচন্দ্র কন্যার বিবাহ দিতেন না, সুতরাং কন্যাকে যজ্ঞ হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়াও বিবাহ সিদ্ধ হইল, ইহা বলা আত্মপক্ষসমর্থনমাত্র। 'বেঙ্গল আডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে' লিখিত হইয়াছে;—The ordinary Hindoo ceremony was modified so as to meet the wishes of Baboo Keshub Chunder Sen; but the fact that Brahmins consented to perform it shows that the marriage was recognised by the Hindoos as orthodox.—"বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ইচ্ছা অনুবর্ত্তন জন্য প্রচলিত হিন্দু অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল, কিন্তু যখন ব্রাহ্মণগণ অনুষ্ঠান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন তখন এই ব্যাপারই দেখায় যে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গৃহীত।" গবর্ণমেণ্ট এখানে আত্মপক্ষসমর্থন করিতেছেন, বিচারক হইয়া বিচারাসনে বসেন নাই। কোন্ হিন্দুবিবাহ

ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন না হইয়া থাকে, অথচ বিচারকালে আদালত দেখেন যে, অনুষ্ঠানে যথাশাস্ত্র লাজবিসর্জ্জন হইয়াছে কি না? যদি প্রমাণ হয় যে, যথাশাস্ত্র উহা সম্পন্ন হয় নাই বিবাহ অসিদ্ধ হইয়া যায়, ব্রাহ্মণগণ বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া আদালত বিবাহ সিদ্ধ করেন না। সুতরাং ধর্ম্ম ও আদালতের বিচার এই উভয় অনুবর্ত্তন করিয়া বলিতে হয়, কুচবিহারের রাজা ব্রাহ্মত্ব স্বীকার পূর্ব্বক তৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে যে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাই সিদ্ধ রহিয়াছে, হিন্দুবিবাহ মূলেই দাঁড়ায় নাই *।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, যে ঈশ্বর কেশবচন্দ্রকে কন্যার বিবাহদানে আদেশ দিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরই তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। লোকতঃ তাঁহার নিন্দা তৎকালে ঘটিয়াছিল, ধর্ম্মতঃ তিনি সে কালেও নির্দ্দোষ ছিলেন, এখনও নির্দ্দোষ, চিরদিনই নির্দ্দোষ পরিচিত হইবেন। সাধারণ লোকে বাহিরের ঘটনা দেখিয়া বিচার করে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রকৃততত্ত্ব কি হৃদয়ঙ্গম করে না, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে মনু ভালই বলিয়াছেন ;—

একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
সবিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥

১২ অ, ১১৩ শ্লোক।

"দ্বিজোত্তম এক জন বেদবিদ্‌ও যাহাকে ধর্ম্ম বলেন উহাই পরমধর্ম্ম, দশ সহস্র অজ্ঞ যাহাকে ধর্ম্ম বলে তাহা ধর্ম্ম নহে।" বিবাহের পর দিন প্রাতে কেশবচন্দ্র প্রার্থনাকালে ঈশ্বরের নিকটে ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন বলিয়া যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা যে একান্ত সত্য, তাহা এখন সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছেন। কেশবচন্দ্র বন্ধুগণকে ইহাও বলিয়াছিলেন, লোকে এখন বিবাহের মূলতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া কত কথা বলিতেছে, সময় আসিবে,

* Some difficulty was experienced in reconciling the Hindoo and Brahmo ceremonial forms ; for as the Rajah is not a Brahmo, it was necessary to the legality of the marriage that the rites should be in accordence with the Hindoo religion.—*Bengal Administration Report*, 1877-78. এ কথাগুলি কথার কথা এবং কথার কথাতেই পর্য্যবসন্ন হইয়াছে।

যখন ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া তাহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রে বিলক্ষণ জানেন, এই বিবাহ দ্বারা কুচবিহারে হিন্দুধর্ম্ম যে প্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে; এমন আর কোথাও হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ যখন বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী বৈদিক দেবতাগুলিকে বিদায় করিয়া দিয়া একেশ্বরবাদ রক্ষাপূর্ব্বক বিবাহদানে সম্মত হইলেন, ব্রাহ্মণেতরজাতি কন্যাপক্ষের পুরোহিত উপাধ্যায়ের শাসনানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অনুমত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিলেন, হিন্দুবিবাহসিদ্ধির পক্ষে প্রধানাঙ্গ অগ্নিসাক্ষিত্বে কন্যাকে অনুপস্থিত থাকিতে দিয়া অশাস্ত্রবিহিত ব্যাপার করিয়া তন্মতে বিবাহ অসিদ্ধ করিলেন, তখন তাঁহারা নিজে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম বিপদাপন্ন করিয়া তৎকালে ও পর সময়ে কুচবিহারপ্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ের পন্থা খুলিয়া দিলেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কুচবিহারবিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ ধরিয়া শ্রেষ্ঠ বিবাহ ইহা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনি অবিপন্ন থাকিয়া পৌত্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, ইহাই তৎপক্ষে গৌরবের বিষয়। কেশবচন্দ্র বিনা ঈদৃশ ঘোর পরীক্ষামধ্যে ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিয়া অপর কেহ উহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। ঈশ্বর স্বয়ং যাঁহার আশ্রয় তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য ঘোর ষড়্‌যন্ত্র উপস্থিত হইলেও কিছু হয় না, কুচবিহারবিবাহে তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। কুচবিহারবিবাহে তত্রত্য পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত এবং তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবেশ ঘটিল, ইহা ঈশ্বরেরই মহিমা।

182.C 15.5

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

মধ্য বিবরণ।

[ষষ্ঠ অংশ।]

দরস্ত বাগ্মো বিপুলস্থ পুংসাং
সংসারজস্থাস্থ নিদেশমত্র।
আলভ্য তৎস্বৈরতিচিত্রমেত-
চ্চরিত্রমার্য্যস্থ নিবদ্ধমস্ত।

"Rest assured, my friends, when we are dead and gone, all the events that are transpiring around us in these days shall be written and embodied in history, and shall be unto future generations a new Gospel of God's saving grace."—*Lect. Ind.*

কলিকাতা।
২০ নং পটুয়াটোলা লেন।
মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে,
শ্রীদরবারের অনুমত্যনুসারে,
কে, সি, দে, দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮১১ শক।

[*All rights reserved.*]

মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞপ্তি।

মধ্যবিবরণ ছয় খণ্ডে পরিসমাপ্ত হইল। বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে গিয়া গ্রন্থ দিন দিন বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অনেকের মনে হইতে পারে, কেশবচন্দ্রের উক্তি স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে, এ জন্য গ্রন্থ বিস্তৃত হইয়া যাইতেছে। তাঁহার উক্তি এত আছে যে, সে সমুদায় উদ্ধৃত করিলে গ্রন্থ দ্বিগুণাকারেরও অধিক হইয়া পড়ে। যে যে গুলি নিতান্ত না তুলিলে তাঁহার জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভবে না, সেইগুলি মাত্র স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার মুখের কথা না তুলিয়া সংক্ষেপে আমাদের কথায় কেন সে অভাব পূরণ করা হইল না, এ কথার উত্তর এই যে, তাঁহার কথায় যেমন তাঁহার জীবনের সেই সেই অংশ সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে, তেমন আমাদের কথায় হইবার সম্ভাবনা নাই, তাই অগত্যা স্থানে স্থানে তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, সেই সেই উদ্ধৃত কথাগুলির জন্য পাঠকগণের নিকট এই আচার্য্যজীবনী বিশেষ সমাদৃত হইবে। অন্ত্য বিবরণ কয় খণ্ডে সমাধা হইবে, আমরা অগ্রে আর তাহা নির্ণয় করিতে সাহসী নই।

সূচীপত্র।

বিষয়।				পৃষ্ঠা।
প্রতিবাদের পরিণাম	...	...	...	৯৬১
বিদেশে আন্দোলনের ফল	...	...	...	১০০০
আত্মপ্রকাশ ...	...	...	...	১৩০৯
খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা	...	...	...	১০২৬
উৎকট পীড়ান্তে শারদীয় উৎসব প্রতিষ্ঠা		...	...	১০৪৩
কুটীরে উপদেশ ...	...	...	...	১০৫৬
বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ রাণীগঞ্জে গমন		...	...	১০৬২
কতকগুলি বিশেষ কথা	...	...	...	১০৭১
ঊনপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক	...	...	...	১০৯১
ব্রহ্মবিদ্যালয় ...	...	...	...	১১১০
নূতন আন্দোলন	...	...	...	১১২১
বসন্তোৎসব ও নববর্ষ ...	...	...	...	১১৩১
আর্য্য নারীসমাজ প্রতিষ্ঠা	...	...	...	১১৩৯

অশুদ্ধি শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	রাজপ্রতিনিধি		
১১২৩	৮	লর্ড রিপণ	লর্ড বিশপ।

প্রতিবাদের পরিণাম।

আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছি, কুচবিহার বিবাহে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনি অবিপন্ন থাকিয়া তত্রত্য পৌত্তলিকতার মূলে কুঠরাঘাত করিয়াছেন।' আমরা ইহাও বলিয়াছি, 'সাধারণ লোকে বাহিরের ঘটনা দেখিয়া বিচার করে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব কি হৃদয়ঙ্গম করে না, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে মনু ভালই বলিয়াছেন ;—

> একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেৎ দ্বিজোত্তমঃ।
> সবিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥

১২ অ, ১১৩ শ্লোক।

"দ্বিজোত্তম এক জন বেদবিদ্‌ও যাহাকে ধর্ম্ম বলেন উহাই পরমধর্ম্ম, দশ সহস্র অজ্ঞ যাহাকে ধর্ম্ম বলে তাহা ধর্ম্ম নহে।" বিরোধিগণের সে সময়ের যে সকল লেখা বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সকল পাঠ করিয়া আমাদের কেন, তাঁহাদের অনেকেরই এখন ক্লেশ হইবে। কোন এক ব্যক্তিকে অপদস্থ করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় জন্মিলে সত্যাসত্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ঘোর অন্ধতা উপস্থিত হয়, কূটপথ অবলম্বনপূর্ব্বক এমন সকল সত্যবৎ প্রতীয়মান যুক্তিজাল বিস্তার করা হয়, যাহাতে কেবল আপনার নহে অপর শত শত লোকের চিত্ত কলুষিত হইয়া সত্য ও ধর্ম্ম তাহাদের চক্ষুর নিকটে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অন্যায় প্রতিবাদ চিরকালই এই কুফল বহন করিয়াছে ও করিবে। প্রতিবাদকারিগণের মধ্যে বিজ্ঞ প্রবীণ লোকের মুখে আমরা তজ্জন্য অনুতাপ বাক্য শুনিয়াছি। আমরা সেই সময়ের ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিয়াছিলাম, "যেখানে উত্তেজনার কারণ আছে; সেখানে বিপরীত পক্ষের সত্যদর্শন নিতান্ত দুষ্কর ব্যাপার হইয়া পড়ে। উত্তেজনা মানুষকে অপরের বিষয় চিন্তা করিতে অবসর দেয় না। কোন একটি কার্য্য, ব্যবহার, মত বা কথা মনকে উত্তেজিত করিলে সেই উত্তেজিত অবস্থায় যদি কিছু তদ্বিরুদ্ধে অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে প্রথমেই আমাদিগকে

মনস্তাপে তাপিত হইতে হয়। যদি এই উত্তেজনার সঙ্গে মনুষ্যের অভিমান সংযুক্ত হয় তবে পূর্ব্বোত্তেজনা আরো ভয়ানক আকার ধারণ করে। কেন না উত্তেজনাতে কিছু করিয়া পশ্চাৎ যে পরিতাপ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল, অভিমান সে পশ্চাত্তাপ জন্মিতে দেয় না। যদি পূর্ব্বযুক্তি খণ্ডিত হয়, অভিমান বিরুদ্ধ নূতন যুক্তি আনিয়া উপস্থিত করে। বাস্তবিক ঘটনাকে উহা এমনি বিকৃত বেশে সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে যে, রক্তপিত্তদূষিত চক্ষু যেমন নির্ম্মল আকাশে রক্তবর্ণ ঘটপট দর্শন করে, মন তেমনি উহার মধ্যে যে সকল বিষয় সংযুক্ত হইলে সদোষ প্রতীত হইবে তৎসংযুক্ত দর্শন করে, অনেক সময়ে এমন হয় যে কোন একটি শ্রুত বিষয়ের সেই সেই অংশ (বিরুদ্ধ ভাববশতঃ অমনোনিবেশ জন্য) বিস্মৃত হইয়া যাওয়া যায়, যে যে অংশ স্মরণ থাকিলে উহা কখন আপনার এবং অপরের নিকটে অন্যথা প্রতীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।" এই অংশ তাৎকালিক একটী ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হয়, কিন্তু উহা সে সময়ের সকল লিখিত ও কথিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদিসম্বন্ধে বিলক্ষণ নিয়োগ হয়।

প্রতিবাদকারিগণের লেখা পাঠ করিলে যেমন একদিকে নিতান্ত ক্লেশ হয়, অন্য দিকে আবার সত্যের অপ্রতিহত শক্তি, চরিত্রের অপ্রতিহত গৌরব, কেমন বিরুদ্ধ কথার মধ্য দিয়া সময়ে সময়ে প্রস্ফুটাকারে প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া আহ্লাদ জন্মে। কেশবচন্দ্রের 'বিশ্বাসের ঐকান্তিকতা' 'ঈশ্বরনিষ্ঠা' 'স্বাবলম্বন,' এগুলি বিরোধিগণ অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু এ সকল গুণ তাঁহারা এমনই ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, যেন তজ্জন্যই তিনি অন্য লোকের সহিত এক হইয়া কার্য্য করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহারা কেন বিচ্ছিন্ন হইলেন, তাহার মূল হেতু কেশবচন্দ্রের এই সকল মহদ্গুণ তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। প্রতিবাদকারিগণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির লইয়া কি প্রকার অত্যাচার, কি প্রকার অভদ্রাচরণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বাধ্যায়ে স্মৃতিলিপিতে তাহা সংক্ষেপে নিবদ্ধ হইয়াছে। সে সময়ের লিপি অবলম্বন করিয়া পুনরায় সে সকলের উল্লেখ পিষ্টপেষণ। সুতরাং সেগুলি প্রকৃত ভাবে এ অধ্যায়ের অন্তর্গত হইলেও পরবর্ত্তী ঘটনাগুলিকেই আমরা ইহার বিষয় করিয়া লইলাম। বিচ্ছেদ—চিরবিচ্ছেদ ঘটিবার সূত্রপাত কি প্রকারে হয়, নিম্নে উদ্ধৃত পত্রগুলি তাহা প্রদর্শন করিবে।

"মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"সবিনয় নিবেদন,

"আমরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিম্নলিখিত সভ্যগণ আপনাকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি আমাদের পত্র প্রাপ্তির পর সত্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন। উক্ত সভায় আমাদিগের তিনটি বিষয় উত্থাপন করা হইবে। প্রথম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে থাকা উচিত কি না স্থির করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ট্রষ্টি নিয়োগসম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাদি সংগঠন ও সংশোধন করিতে হইবে।

কলিকাতা, ১৪ মার্চ্চ। } শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ২২ জন সভ্য।"

অগ্রে অপরাধ সাব্যস্ত না করিয়া একেবারে অপরাধী স্থির করিয়া এই পত্র লেখাতে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পত্রিকার এক কোণে তিন কি চারি পংক্তিতে, অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সভা আহূত হইতে পারে, এই ভাবে গুটিকয়েক কথা লিখিয়া পাঠান। প্রতিবাদকারিগণের মতে ইহা নিতান্ত লজ্জাকর। বিনা বিচারে নিরপরাধীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যে কেবল লজ্জাকর নয়, নিতান্ত ধর্ম্ম ও নীতি বিগর্হিত, এখন হয় তো তাঁহাদের অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, প্রতিবাদকারিগণ নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক কেশবচন্দ্রকে লেখেন;—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

"মহাশয়!

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিবার জন্য ১৪ই মার্চ্চ দিবসের পত্রে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদককে

অনুরোধ করা হয়। যদিও সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করা হয়, তথাপি ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রে আপনারা বিজ্ঞাপন দিয়া সভা আহ্বান করাতে আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, সে সভা এক্ষণে বন্ধ করা হইয়াছে *। অতএব আমরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিম্নলিখিত সভ্যগণ আপনাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি আমাদের পত্রপ্রাপ্তির পর এক সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিয়া বাধিত করিবেন।

"উক্ত সভার বর্ত্তমান সম্পাদকের পদস্থ থাকা উচিত কি না স্থির করিতে হইবে এবং তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্যে একটী কমিটী নিয়োগ করিতে হইবে। ২৭ চৈত্র, ১৭৯৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি ২৫ জন।"

এই পত্রের উত্তরে যে সকল কথা লেখা প্রয়োজন আপনি কেশবচন্দ্র আপনার হইয়া সে কথা কিরূপে লিখিবেন, সুতরাং সভার পূর্ব্বাপর নিয়ম অনুসারে সহকারী সম্পাদক ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পত্রের উত্তর দেন। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি মহাশয়গণ

সমীপে—

"সবিনয় নিবেদন,

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভা আহ্বানসম্বন্ধে আপনাদের ২৭ চৈত্র দিবসীয় পত্র সম্পাদক মহাশয় গত কল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাকে ঐ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আপনারা যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে সম্পাদক মহাশয়ের নামে মিথ্যা ও অপ্রমাণিত অপবাদ লেখা হেতু আমি উহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিপ্রেরণ করি। আপনারা বর্ত্তমান পত্রে ঐ অপবাদের কথা যে বিলোপ করিয়াছেন, ইহাতে আমি সন্তোষ হইলাম। আপনারা এক সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। উহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অসাধ্য। ভারতবর্ষীয়

* সভা আহ্বানে বিজ্ঞাপন দিয়া উহা বন্ধ করা সেই সভাসম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, যে সভায় কেশবচন্দ্র আপনার পদচ্যুতির প্রস্তাব করিবেন উদ্দেশ্য ছিল। ব্রহ্মমন্দিরে প্রতিবাদকারিগণের অভদ্রাচরণে সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বিঘটিত হইয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বম্বে, হায়দরাবাদ, মান্দ্রাজ, করাচী, পঞ্জাব প্রভৃতি নানা দূর প্রদেশে বিস্তৃত আছেন, তাঁহাদিগকে এক সপ্তাহের মধ্যে সংবাদ দিয়া কলিকাতায় একত্র করা আপনারা কখন সম্ভব মনে করিতে পারেন না, এবং কেবল কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানের কতিপয় ব্রাহ্ম লইয়া কোন গুরুতর বিষয় মীমাংসা করাও বোধ করি আপনারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিবেন না। সামান্য নির্ব্বিবাদ বিষয় নিষ্পত্তির জন্য সত্বর সভা ডাকিলে বিশেষ ক্ষতি বোধ হয় না। কিন্তু যে বিষয় লইয়া আপনারা সম্প্রতি প্রকাশ্য সভায় এত আন্দোলন ও বিবাদ করিয়াছেন এবং যাহাতে উভয় পক্ষের কথা স্থিরভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক, এমন কোন প্রস্তাব অবধারণ করিতে হইলে ভারত-বর্ষস্থ সমস্ত সভ্যগুলীকে অন্ততঃ ছয় মাস পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। প্রতিবৎসরে নিয়মানুরূপ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া থাকে এবং উহাতে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়। যদি কোন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা আপনাদিগের অভিপ্রেত হয় আগামী মাঘ মাসে সাম্বৎসরিক সভায় আপনারা ঐরূপ প্রস্তাব করিতে পারেন। যদি আপনারা তত দিন বিলম্ব করিতে না পারেন এবং সভা আহ্বানের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি দোষের জন্য বর্ত্তমান সম্পাদককে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক এবং কি কি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে আপনারা সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা আমাকে সত্বর লিখিয়া পাঠাইবেন, যেহেতু বিজ্ঞাপন মধ্যে এ কথা সাধারণের গোচর করিয়া সভা আহ্বান করিতে হইবে। আপনাদের পত্র পাইলে আগামী আশ্বিন মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিতে চেষ্টা করিব। ৩রা বৈশাখ ১৮০০।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার
সহকারী সম্পাদক।"

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু স্বাক্ষরকারীদের সপক্ষে এ পত্রের এইরূপ উত্তর দেন,—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সহকারী
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"মহাশয়!

"আমাদের ২৭ শে চৈত্র দিবসীয় পত্রের উত্তরে আপনি যাহা লিখিয়াছেন

তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, আপনি আমাদের পত্রের উত্তর দিয়াছেন তাহা সম্পাদকের জ্ঞাতসারে ও আদেশ ক্রমে দিয়াছেন কি না বুঝিতে পারিলাম না। কারণ আপনার পত্রে তাহার কোন উল্লেখ দেখা গেল না। দ্বিতীয়তঃ আপনার পত্রের মধ্যে কয়েকটা কথা দেখিয়া আমরা বিশেষ বিস্মিত এবং দুঃখিত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে আমাদের পূর্ব্ব পত্রে আমরা সম্পাদক মহাশয়ের নামে মিথ্যা ও অপ্রমাণিত অপবাদ লিখিয়াছিলাম, আপনি একা যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষী জ্ঞান করেন অথবা আমাদের কেহ যদি তাঁহাকে দোষী মনে করেন তাহা দ্বারা তো কোন মীমাংসা হইতে পারে না। সে পক্ষে অধিকাংশ সভ্যের মত নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই জন্যই সভা আহ্বানের আবশ্যক। এরূপ স্থলে যে সকল বিষয়ের জন্য অনেক ব্রাহ্ম দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং আপনাদের উক্তি অনুসারে যে সকল বিষয় অনেক পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে, আমাদের পত্রে সেই সব বিষয়েরই উল্লেখ করাতে যে আপনি এইরূপ কঠিন ভাষা ব্যবহারে সাহসী হইয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্য। আমাদের পূর্ব্বপত্রে সম্পাদক মহাশয়ের নামে যে সকল দোষারোপ করা হইয়াছিল এবার তাহার বিলোপ করা হইয়াছে বলিয়া আপনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার সন্তোষ প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। আমরা সম্পাদককে নির্দ্দোষী বলিতেছি বা তাঁহাকে দোষী বলিতে সাহসী নই এরূপ নহে, দোষের উল্লেখ অনাবশ্যক বোধে দ্বিতীয় পত্রে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। সে যাহাহউক আপনি যে কারণে আমাদের অনুরোধ রক্ষা করা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। প্রথমতঃ আপনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, এক সপ্তাহ কালের মধ্যে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়া সমবেত করা অসাধ্য ও অসম্ভব। এই আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আপনারাই কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক এই প্রশ্নেরই বিচারের জন্য প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে একসপ্তাহ কালেরও সময় দেওয়া হয় নাই। আমরা আমাদের দ্বিতীয় পত্র প্রেরণের অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে সম্পাদক পরিবর্ত্তনবিষয়ে মফঃসলস্থ সমাজসকলকে মত প্রকাশ করিতে

লিখিয়াছি * এবং সভা আহ্বানের অভিপ্রায়ও জানাইয়াছি। এক্ষণে সভা আহ্বান করিলে সংবাদ না পাইবার আশঙ্কা নাই। বিশেষ যদি নিতান্ত সকলের অবগতির জন্য সময় দেওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহাহইলে তিন সপ্তাহের সময় দিলেই যথেষ্ট বোধ হয়, কারণ ভারতবর্ষে এমন কোন সমাজ নাই যেখানে সপ্তাহকালের মধ্যে পত্র না যায়।

"২। মাঘমাসের সভায় যে সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয় তাহাতে সাধারণতঃ কর্ম্মচারিনিয়োগ প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্যটী বিশেষ কার্য্য এজন্য বিশেষ সভা আহ্বান অযুক্ত নহে।

"৩। আমরা কি দোষের জন্য সম্পাদককে পদচ্যুত করিতে চাহি আমাদের প্রথম পত্রে প্রকাশিত আছে, পুনরুল্লেখ পুনরুক্তিমাত্র। তথাপি আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়া বলিতেছি, আমরা বিবেচনা করি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত মতের বিরুদ্ধাচরণ ও বাল্য বিবাহের পোষকতা করিয়াছেন এবং বিবাহ স্থলে বর পক্ষের আপত্তিতে নিজের পরিবর্ত্তে স্বীয় ভ্রাতাকে সম্প্রদানকার্য্যে ব্রতী করিয়া রাজকুলপুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপাঠের অনুমতি দিয়া, বরপক্ষে কোন কোন পৌত্তলিকতাচরণ করিবেন জানিয়াও সে বিবাহে সম্মত হইয়া, বিবাহস্থলে পৌত্তলিকতার চিহ্ন স্থাপনাদিসত্ত্বেও বিবাহে যোগ দিয়া এবং বৈধ ব্রাহ্ম বিবাহের অঙ্গসকলকে সম্পূর্ণরূপে হীন বিকলাঙ্গ ও পৌত্তলিক ক্রিয়ার অধীন করিতে দিয়া পৌত্তলিকতার অনুমোদন, ব্রাহ্ম বিবাহের উচ্চ আদর্শকে মলিন এবং ব্রাহ্মবর্গকে লোকের চক্ষে হীন ও ঘৃণিত করিয়াছেন; এই সকল কারণে আমরা তাঁহাকে সম্পাদকের পদের অনুপযুক্ত এবং এই বিষয় মীমাংসার জন্য সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

"৪। কোন্ নিয়ম নির্দ্ধারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহা সবিস্তর এখন বর্ণনা করা অসাধ্য ও অনাবশ্যক, তদুদ্দেশে একটী কমিটী নিয়োগ করিলেই হইবে এবং আমাদের পত্রে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অবশেষে আমাদের পুনরায় অনুরোধ যে আপনি এই পত্র প্রাপ্তির পর এক সপ্তাহের

---

* অতি আশ্চর্য্য এই যে, এত যত্নে কেবল তেরটি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিরোধিগণ ঐ বিষয়ে সায় পাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যেও আবার কোন স্থলে বিভক্ত মত হইয়াছিল।

অনধিক কালের মধ্যে সম্পাদক মহাশয়কে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের একটী সভা আহ্বান করিতে বলিবেন। বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও সভার অধিবেশনের মধ্যে তিন সপ্তাহের সময় দিলেই যথেষ্ট হইবে। আর যদি আমাদের এ অনুরোধও গ্রহণের অযোগ্য বোধ হয় তাহা হইলে তিন চারি দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

২৫শে এপ্রেল ১৮৭৮ সন। } স্বাক্ষরকারীদের সপক্ষে শ্রীশিবচন্দ্র দেব।"

এই পত্রের উত্তর যত শীঘ্র পাইবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তত শীঘ্র উহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। পত্রের উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই প্রতিবাদকারিগণ টাউনহলে সভা আহ্বান করেন। সভার অধিবেশন হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর পত্র শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুকে প্রদত্ত হয়;—

"মান্যবর

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব

মহাশয় সমীপে—

"সবিনয় নিবেদন,

"আপনার ২৫শে এপ্রেল দিবসীয় পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সকল সভাতে এরূপ নিয়ম আছে সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক পত্রাদির উত্তর দেন, এবং উভয়ের পত্রই সাধারণ সভার অভিমত বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

২। অপবাদ মিথ্যা কি না এ বিষয় সাধারণের মতে স্থির হওয়া উচিত। কিন্তু আপনাদের পত্রে অপরাধ সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য পদচ্যুত হওয়া আবশ্যক কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য সভা আহ্বানের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। যত দিন না বিচারিত ও প্রমাণিত হয় তত দিন উক্ত অপবাদ 'মিথ্যা ও অপ্রমাণিত' বলিতে সাহসী হওয়া অযৌক্তিক নহে। এবার আপনারা 'অপ্রমাণিত' কথাটী এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখিয়া আমি আমার প্রতিবাদ সফল হইয়াছে মনে করিতেছি। আপনি বলিয়াছেন 'অধিকাংশ সভ্যের মত নির্ণয় করা প্রয়োজন, এই জন্যই সভা আহ্বানের আবশ্যকতা।' 'মত নির্ণয় করা' এবং দোষ 'প্রমাণিত' বলিয়া সিদ্ধান্ত করা এ

দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে আপনারা অবশ্য স্বীকার করিবেন। যাহা হউক এত দিনের পর আপনারা মানিলেন যে সম্পাদকের দোষ এখন সিদ্ধান্ত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কি মত তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

"৩। বিজ্ঞাপনসম্বন্ধে আপনি লিখিয়াছেন যে ইতিপূর্ব্বে যখন এক সপ্তাহের অনধিক কালের বিজ্ঞাপন দ্বারা সভা আহ্বান করা হইয়াছিল তখন এবার আমাদের আপত্তি করা অনুচিত। গতবারে সম্পাদক মহাশয় নিজে পদচ্যুতির প্রস্তাব করিবেন এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং অন্যের মতের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না এবং সমস্ত সভ্যের উপস্থিতিরও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মমন্দিরে বেদীচ্যুতিসম্বন্ধে অনুরূপ প্রস্তাব করিবার সময় আপনাদের দলস্থ লোকেরা যেরূপ ভদ্রতাবিরুদ্ধ এবং অসহ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সম্পাদকীয় পদচ্যুতির প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতে পারেন নাই। আপনারা যদি সকল সভ্যের মত লইয়া সম্পাদক পরিবর্ত্তন করা উচিত কি না ইহা নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা যাহাতে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন এরূপ উপায় করা আবশ্যক। এই জন্য আশ্বিন মাসে সভা ডাকিবার প্রস্তাব করা হয়।

"৪। সম্পাদক মহাশয়ের বিরুদ্ধে আপনারা যে দুইটী প্রধান অভিযোগ করিয়াছেন তাহার সুবিস্তার প্রতিবাদ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমার নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল ক্রিয়া তাঁহার অনভিমতে বা অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তাঁহার পক্ষ হইয়া উক্ত প্রতিবাদপত্রে আমি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছি, সুতরাং যখন এ বিষয়ে রীতিমত মীমাংসা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নামে হইয়া গিয়াছে, তখন আমি আর অধিক কিছু লিখিতে পারি না।

"৫। আমি দুঃখিতান্তকরণে আপনাদিগকে অবগত করিতেছি যে ত্বরায় সভা আহ্বান না করার অন্যতর প্রধান হেতু আপনাদের মনের অশান্ত অবস্থা। পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে এক দিবস সভাস্থলে এবং অপর দিবস উপাসনার সময় আপনাদের দল যেরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ভদ্রতাবিরুদ্ধ ব্যাপার করিয়াছিলেন তাহাতে কর্ত্তৃ-

পক্ষ হইতে বাস্তবিক পুলিষের সাহায্য জন্য আবেদন করা আবশ্যক হইয়াছিল। এ অবস্থায় পরস্পর বিরুদ্ধ দুই দলকে একত্র করিয়া সভা করা সঙ্গত বোধ হয় না। উভয় দলের মন শান্ত হইলে সভা আহ্বান করা বিধেয়। আপনাদের প্রস্তাবিত সভা আহ্বানে আমি বিশেষরূপে কুণ্ঠিত হইতেছি, যেহেতু আপনাদের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সভ্য সম্পাদক মহাশয়কে উত্তেজিত অবস্থায় সভা না ডাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

"পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে আপনারা যদি যথার্থই বর্ত্তমান বিবাদের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বৃথা আন্দোলন না করিয়া উভয় পক্ষের দুই এক জন সম্ভ্রান্ত লোক লইয়া বন্ধুভাবে ঐ কার্য্য সমাধা করিলে ভাল হয়।

২৯. বৈশাখ, ১৮০০ শক।
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়। } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার
সহকারী সম্পাদক।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভা আহ্বান জন্য কেবলমাত্র ২৯ জন সভ্য আবেদন করিয়াছিলেন, তদ্বিরুদ্ধে ৫০ জন সভ্য আবেদন করেন, সুতরাং সভা আহ্বান অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ঐ পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"সবিনয় নিবেদনমিদম্

"আমরা অবগত হইলাম, শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি কয়েক জন আন্দোলনকারী ব্রাহ্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পদস্থ রাখার ঔচিত্যানৌচিত্য স্থিরীকরণ ও কতকগুলি নূতন নিয়ম অবধারণ করিবার অভিপ্রায়ে মহাশয়কে এক সভা আহ্বান করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।

"১। আবেদনকারী ভ্রাতৃগণ কিছু দিন হইল, পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর সভার অধিবেশনে অতীব ক্রোধান্ধ হইয়া বিষম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদের উত্তেজিত চিত্ত শান্ত না হইলে হঠাৎ আর কোন প্রকাশ্য সভা আহ্বান করা সুসঙ্গত বোধ হয় না।

"২। সম্পাদককে পদস্থ রাখা না রাখারূপ গুরুতর প্রস্তাবটি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কেবল কলিকাতাস্থ সভ্যগণের সভার আলোচনার উপযুক্ত নহে। দেশ বিদেশীয় সভ্যগণ সংশ্লিষ্ট যে সময়ে সাধারণ সাম্বৎসরিক সভা হইয়া থাকে, যদি উক্ত বিষয় আলোচনা করা সকলের অভিপ্রেত হ, সেই সময়েই ইহার বিচার হওয়া সঙ্গত বোধ হয়। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে মহাশয় এক্ষণে কোন মতে সভা আহ্বান না করেন। ২২ এপ্রেল ১৮৭৮ শক।

শ্রীজয়গোপাল সেন

প্রভৃতি ৫০ জন।"

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই সময়ে একখানি মুদ্রিত পত্র বন্ধুগণের নিকট প্রেরণ করেন, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি তাহার যে উত্তর দেন, ভাই গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিলিপিতে (৯১৪ পৃষ্ঠায়) উহা নিবিষ্ট হইয়াছে। আর এ স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সংস্কৃত নিয়মতন্ত্রপ্রণালীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য টাউনহলে একটী সভা হইবে এই বলিয়া সংবাদপত্রে প্রতিবাদকারিগণ বিজ্ঞাপন দেন। এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভার বিবেচনার্থ শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবকে ইংরাজীতে পত্র লিখেন। তাহার তৎকালকৃত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়

সমীপে—

কলিকাতা ১৪ মে, ১৮৭৮।

"মহাশয়,—সংস্কৃত এবং নিয়মতন্ত্রপ্রণালীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য টাউন হলে একটী সভা হইবে সংবাদপত্রে এতদ্বিষয়ে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে তৎপ্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল।

"সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর পক্ষে এই বিষয়টি অতি গুরুতর এবং এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজের ভাবী লক্ষ্য এবং স্থিতিও সংস্পৃষ্ট হইতেছে, অতএব আগামী কল্যের সভার বিবেচনার জন্য আমি এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিতে চাই।

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে অতি গম্ভীর ভাবে আমার নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য যে, এই গৃহে কখন সাম্প্রদায়িক বিভাগ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মমণ্ডলীমধ্যে যে বর্ত্তমান অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে উহাকে গৃহবিচ্ছেদ-রূপে দেখা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে নিয়মে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে উহা কখনই বিভক্ত হইতে পারে না, এবং উহার একতা অলঙ্ঘ্য। উদার ঈশ্বরবাদ উহার ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মেরই অর্থ অসাম্প্রদায়িকতা ও মৌলিকতা। উহা এরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে যে কেহ ধর্ম্মের মূলমতে বিশ্বাস করে সেই উহার সভ্য হইতে পারে। যত ক্ষণ মূল বিষয়ে একতা আছে, তত ক্ষণ কখন ইহার মধ্যে বিভাগ হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকলকে ইহার মধ্যে অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া লয়। সামান্য মতভেদের জন্য ইহা কখন কাহাকে বহির্ভূত করে না। ইহার বিস্তীর্ণ গঠন মধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি-নিরপেক্ষ ব্রাহ্মমণ্ডলীও অন্তর্ভূত। ইহার বিস্তীর্ণ সভ্যশ্রেণীর মধ্যে যত প্রকারের মত ও বিশ্বাসের ভিন্নতা আছে, এমন কি অতিমাত্র উন্নতিনিরপেক্ষতা হইতে অতিমাত্র নিবন্ধনোচ্ছেদকতা, হিন্দু একেশ্বরবাদী এবং ইংলণ্ডীয় ঈশ্বরবাদী পর্য্যন্ত সকলেই আছেন। যদি ইহার সভ্যমণ্ডলীর কতকগুলি লোক কোন একটি সামান্য ছল করিয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিতে যত্ন করেন, মূলসমাজ তখনও তাঁহাদিগকে অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য করিয়া লইবে এবং তাঁহাদের মতের ভিন্নতা সর্ব্বথা ক্ষমার চক্ষে দর্শন করিবে এবং তাঁহাদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রক্ষা করিবে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যখন এরূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন বর্ত্তমান গৃহবিভাগকে কখন মতবিষয়ক বিচ্ছেদ বলিতে পারি না এবং আপনারাও বোধ হয় এরূপ বলিবেন না। বর্ত্তমান বিবাহ লইয়া আমাদিগের মতভেদ হইয়াছে এ কথা আমি মানি। এ কথাও আমি অস্বীকার করি না, উভয় পক্ষের মধ্যে যাঁহারা অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িকতার অনুরূপ বিরোধি-ভাব সমুৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলিয়া এই বিভাগ সাম্প্রদায়িক বিভাগ কখনই নহে। উভয় পক্ষই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমতে বিশ্বাস করেন; মত লইয়া কোন বিবাদ নাই। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, এবং বাল্যবিবাহ, যাহা বর্ত্তমান বিবাহে বিবাদের বিষয়, তাহাতেও সংস্কার এবং বিশ্বাস এক, কেন না উভয় পক্ষই এ সকল অমঙ্গলের বিরোধী। তবে আর গৃহবিচ্ছেদের ভূমি কোথায়? কোথাও

নাই। বিচ্ছেদ, যাহার যথার্থ অর্থ মতভিন্নতা জন্য সাম্প্রদায়িক অগ্রহণশীলতা, বর্ত্তমান ব্যাপারে একান্ত অসম্ভব।

"বর্ত্তমান বিবাদে যদি স্বতন্ত্র বিরোধী মত লইয়া নূতন ব্রাহ্মসম্প্রদায় সংস্থাপন করা অসম্ভব হইল এবং সাম্প্রদায়িকতা আমাদের পবিত্র উদার ব্রাহ্মসমাজের স্থিরতর মূলসূত্রের একান্ত অনুপযোগী হইল, তবে এখন দেখা যাউক সমাজশাসনপ্রণালী লইয়া সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের কারণ আছে কি না? ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ চির দিন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে শাসিত হইয়া আসিয়াছে, কোন দিন যথেচ্ছ ক্ষমতাতে শাসিত হয় নাই। ইহার কর্ম্মচারী মনোনীত করিয়া লওয়া হয় এবং প্রতিবর্ষের শেষে পুনর্ম্মনোনীত অথবা কর্ম্ম হইতে অন্তরিত হইতে পারেন। ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণকর বিষয় সকলের পর্য্যালোচনার জন্য নিয়মিতরূপে বার্ষিক সভা হইয়া থাকে, যে সভাতে আবশ্যক হইলে কর্ম্মচারী মনোনীত এবং সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ নিয়ম পরিশোধিত এবং পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সম্পাদকের নৈতিক প্রভাব যত দূর থাকুক না কেন, সভ্যমণ্ডলী তাঁহাকে যত দূর ক্ষমতা কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন তদতিরিক্ত তাঁহার ক্ষমতা বা কর্ত্তৃত্ব নাই এবং তাঁহাদিগের যত দিন ইচ্ছা তদতিরিক্ত তিনি সম্পাদকের কার্য্যে থাকিতে পারেন না। যদি অধিকাংশ সভ্য তাঁহার স্থলে অন্য কোন লোককে নিযুক্ত করিতে চান, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। সম্পাদক যে এ বিষয়ের প্রতিবাদী নহেন তাহা সাধারণের বিদিত আছে, কেন না তিনি এজন্য আপনি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য উপাসকমণ্ডলীর সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত লোক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই সভা প্রতিবাদকারিগণের প্রধান লোকদের প্রস্তাবনাতেই কতক দিন পূর্ব্বে যথানিয়ম সংস্থাপিত হয়। বর্ত্তমান আন্দোলনের জন্য আচার্য্য বেদী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ উপাসকের অনুরোধে পুনরায় অল্প দিন হইল কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজের বর্ত্তমান সম্পাদকের উপরে যথেচ্ছাচার এবং অন্যনিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করার যে অভিযোগ হইয়াছে তাহা কার্য্যতঃ অনেকবার খণ্ডিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে যে তিনি সভ্যমণ্ডলীর অভিপ্রায়ানুসারে উপযুক্ত অধিকারদানে কখন গতিক্রিয়া করেন নাই। প্রতিবাদকারিগণের

অধিনায়কেরা তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব এবং তাঁহাকে প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রতি সময়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অধিকার প্রদান জন্য পর্দ্দার বাহিরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য নিয়মিত আসন দেওয়াতে, মন্দিরের কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য উপাসকমণ্ডলীর সভা সংগঠন করাতে, ব্রাহ্মমণ্ডলীর সমগ্র কার্য্য ভালরূপে নির্ব্বাহ হইবার জন্য প্রতিনিধি সভা সংস্থাপনের সহায়তা করাতে, তিনি যে সম্মিলন রক্ষার ভাবে পরিচালিত হইয়াছেন ইহা নিঃসংশয়। যখনি ক্ষমতা চাহিয়াছেন তখনি ক্ষমতা পাইয়া যদি তাহার উপযুক্ত ব্যবহার তাঁহারা করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহাদিগেরই দোষ সম্পাদকের নহে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্রতার অভাব নাই, কেবল অসন্তুষ্ট দলের সমাজের কার্য্যে ঔৎসুক্যের অভাব। সভাস্থলে পুনঃ পুনঃ অনুপস্থিতি, এবং যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের ঔদাসীন্য নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য হয় এ সংশয় তাঁহাদিগের মনে উপস্থিত করিয়াছে; অথচ উহা তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন না। গত মাসের ৮ই তারিখে আপনি যে পত্র লিখিয়াছেন তদনুসারে প্রকাশ্য সভা ডাকা যুক্ত কি না এই প্রশ্নের উপরে সমুদায় বিসংবাদ দাঁড়াইতেছে। আপনি এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে আমাদের সভা আহ্বানে কোন আপত্তি নাই, এবং কখন আপত্তি উত্থাপন করি নাই। যখনি সভ্যমণ্ডলীর বিশেষ ব্যক্তিগণ গুরুতর কার্য্যের জন্য সভা আহ্বান করিতে চান, তখনি সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক সভা আহ্বান করিতে বাধ্য, তাঁহাদের এ বিষয়ে নিজের মতামত নাই। কিন্তু সকল সভারই কার্য্যকারকদিগের সভার সময় নির্দ্ধারণে বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আছে। মন্দিরে দুবার যে প্রকার অসন্তোষকর অবৈধ দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছে, এমন কি পুলিসের সহায়তা পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে অতিশীঘ্র সভা আহ্বানের প্রার্থনায় সম্মত না হওয়াতে বোধ হয় আমরা যুক্তিযুক্ত কার্য্য করিয়াছি। সাধারণের মনের অতিরিক্ত উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া আমরা যে সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম তাহা বন্ধ করিতে হইয়াছে; এবং আপনাদের প্রস্তাবিত সভা আহ্বানে গৌণ করিতে হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়রূপে বলিয়াছি এবং পুনরায় বলি, আপনি এবং আপনার বন্ধুগণ যে সভা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন বর্ত্তমান উত্তেজনার অবস্থা হ্রাস হইলেই ছয় মাস বা

তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে আহূত হইবে। এ সময়ের মধ্যে অনিয়ত ব্যবহার হইবার আশঙ্কা মিটিয়া যাইবে এবং সাধারণে স্থির শান্ত ভাবে বিষয়ের বিচারে সক্ষম হইবেন। সমুদায় বিসম্বাদ কেবল অকিঞ্চিৎকর যৎসামান্য এই মতভেদের উপরে দাঁড়াইতেছে—প্রস্তাবিত সভা তিন সপ্তাহ মধ্যে অথবা ছয় মাসের মধ্যে আহূত হইবে। এই অতি সামান্য ছল ধরিয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠন করা কি প্রতিবাদকারীদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত? আমি এজন্য অনুনয় করি যে, তাঁহারা গম্ভীর ভাবে এই প্রশ্ন বিবেচনা করিবেন, এবং বিচ্ছেদ নিবারণে সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করিবেন, কেন না ইহা উভয় পক্ষের পক্ষেই নিতান্ত দুঃখকর ব্যাপার হইবে। আপনারা যে সকল সংস্করণ, যে সকল প্রতীকার চান তাহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নিয়মেতেই আপনাদের হস্তগত আছে। এই সমাজ স্বীয় উদারতাতে প্রত্যেক দল যাঁহারা ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অধিকার দিয়াছে এবং কাহার সংস্কারের কার্য্য ইহা কখন প্রতিরোধ করে নাই। আগামী কল্যের সভাতে বর্ত্তমান সংগঠনের মূল ভঙ্গ না করিয়া উহার সংশোধন বা সভ্যমণ্ডলীর মঙ্গল পরিবর্দ্ধন জন্য যে কোন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে, আমি নিশ্চয়রূপে বলিতেছি, আমরা উহাতে সহানুভূতি এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কার্য্য-বিশেষকে নিন্দা করিয়া আপনারা যে কোন প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিতে চান তাহাতে বাধা অর্পণ করা অভিপ্রেত নহে। উপাসনাশীলতা পরিবর্দ্ধন বা প্রচারকার্য্য-সম্বন্ধে আপনারা যে কোন প্রণালী উদ্ভাবন করিবেন তাহাতেও প্রতিবন্ধকতা দেওয়া অভিপ্রেত নহে। আপনাদের স্বাধীনতার অবরোধ অথবা যে সম্মানযোগ্য মতভেদ হইয়া থাকিবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করাও অভিপ্রেত নহে। সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ানুরূপ মানুষের ন্যায় আপনাদের সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন। কিন্তু আমি আপনাকে এবং আপনার সহযোগিগণকে এই অনুরোধ করি যে তাঁহারা সাধারণের ক্ষতিবৃদ্ধি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিতে সমুদায় ব্যক্তিগত বিষয়কে ভুলিয়া যাউন এবং আমাদের প্রিয় সাধারণ গৃহ, সমাজ এবং ঈশ্বরের গৃহের পবিত্রতা এবং একতা রক্ষার জন্য আমাদিগের সঙ্গে মিলিত হউন।

বশংবদ ভৃত্য শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার

সহকারী সম্পাদক।"

এই পত্রে * বিশেষ কোন ফল দর্শিল না, কেন না প্রতিবাদকারিগণ স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, সে সঙ্কল্প এই সামান্য পত্র কি প্রকারে অবরুদ্ধ করিবে? ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতির প্রতি তাঁহাদের আস্থা যখন বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা এই আন্দোলনের সুযোগে স্বতন্ত্র হইবেন ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। স্বতন্ত্র হইবার যে সকল যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বল হইলেও এক অনাস্থাই দুর্ব্বল যুক্তিকেও নিতান্ত প্রবল বলিয়া সকলের প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং অনাস্থাবান্ লোকেরা দুর্ব্বল যুক্তিকেও প্রবল মনে করিয়া বিচ্ছেদ অনুমোদন করিবেন, ইহা আর অসম্ভব কি? এই অনাস্থার প্রেরণায় ২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার

* এই পত্র পাঠ করিয়া ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, এ পত্র পাঠ করিয়া প্রতিবাদকারিগণের চৈতন্যোদয় হওয়া উচিত এবং বিচ্ছেদ আনয়ন করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। তিনি স্পষ্ট বলেন যে, "আমরা মনে করি না যে, বিচ্ছেদ প্রয়োজন অথবা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।... এই নূতন মণ্ডলী—যদি নূতন মণ্ডলী সংসৃষ্ট হয়, আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে কন্যাকে বিবাহ দেওয়া এক জন সভ্যের পক্ষে পাপ ভিন্ন অন্য বিশিষ্ট মূলশূন্য। অন্য দিকে প্রাচীন দল এ বিষয়ে প্রতিব্যক্তির বিচারকে কিঞ্চিদধিক স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকেন।" তৎপরসময়ের পত্রিকায় তিনি লেখেন, "মূল সমাজ বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না। ইনি ইহার বিদ্রোহী সন্ততিগণকে করুণাবিমিশ্র শোকের দৃষ্টিতে দেখেন, কিন্তু যখন ইনি দেখিতে পান না যে, কোন বিশিষ্ট বিচ্ছেদকর মূল আছে, যাহার জন্য ইহাঁর অঙ্গজ স্বতন্ত্র থাকিতে পারে, তখন ইনি ইহাকে বস্তুতঃ আপনারই একাংশ বলিয়া বিবেচনা করেন। নূতন মণ্ডলীর একটি বিশেষ অভাব এই যে, ইহার মধ্যে এমন কোন নেতা নাই যাঁহার শক্তি ও প্রভাবে আনুগত্য উপস্থিত হইতে পারে। অধিকন্তু আমাদের সংশয় হয় যে, মূল সমাজ অপেক্ষা ইহা জীবন্ত ধর্ম্মভাবে হীন হইবে, উপাসনার নিমগ্নভাবাপেক্ষা সামাজিক সংস্কার ইহার বিলক্ষণ চিহ্ন হইবে। ইহা সন্দেহ করা যাইতে পারে যে, ইহা অধিক কাল স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে কি না; কিন্তু এ কথা পূর্ব্বে বলা যাইতে পারে না, ইহা আস্তে আস্তে মরিয়া যাইবে অথবা (মূল সমাজের) আনুগত্যে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।" বাবু দুর্গামোহন দাস ষ্টেটস্‌ম্যানে যে পত্র লেখেন তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক সুদীর্ঘ পত্রিকা ষ্টেটস্‌ম্যানে প্রকাশ করেন এবং তৎসহ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মূলপত্রের উত্তরও পাঠান। এই দুই পত্রের মূলবিষয় মূলে যাহা বলা হইতেছে তাহাতেই যখন তৎসম্বন্ধে বক্তব্য নিঃশেষ হইয়াছে, তখন আর সেই দুই পত্রের অনুবাদ দিয়া গ্রন্থবাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় টাউনহলে আহূত সভায় স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপিত হইল। এই সভার প্রথম প্রস্তাব এই ;—(১) "এই সভা, ব্রাহ্মসমাজের নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত কোন গঠন নাই দেখিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এবং তদ্দ্বশতঃ যে সমস্ত বহুবিধ মহান্ দোষ ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দূরীকরণার্থ, এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্যের উন্নতি ও মঙ্গল যে সমস্ত বিষয়ের উপরে নির্ভর করে, তদ্বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মত গ্রহণ ও সম্মিলিত চেষ্টার উপায় বিধানার্থ 'সাধারণসমাজ' নামে একটী সমাজ স্থাপন করিতেছেন।" সভা দ্বারা যে নিবেদনপত্র গৃহীত হয়, ঐ পত্রে সভা প্রতিষ্ঠার কারণ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, "আমরা এত কাল পর কেন স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইতেছি, তাহা ব্রাহ্মসাধারণের নিকট বলা উচিত বোধে, আমরা তাঁহাদিগকে এই নিবেদন পত্র দ্বারা জানাইতেছি যে, আমরা বিলক্ষণ প্রতীতি করিলাম যে, অদ্যাপি ব্রাহ্মসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ নিয়মতন্ত্র প্রণালী সঙ্গত কোন সভা নাই, এবং তদভাবে নানা প্রকারে ও নানা দিকে ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতি হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে কোন প্রকার নিয়মতন্ত্র প্রণালী বদ্ধ করিয়া কার্য্য করা আদি ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামক যে সভা গত দ্বাদশবৎসরাধিক কাল সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সুব্যবস্থা দেখা যায় না। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে সম্পাদক যে কোন প্রকার কর্ম্ম নির্ব্বাহক সভার অধীন হইয়া বা তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ উল্লেখ নাই, সভার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়মাবলী যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না—এমন কি কার্য্যকালে কে সভার সভ্য, কে নয়, ইহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংগ্রহ বা অর্থ ব্যয়, প্রচারক নিয়োগ বা প্রচারক বর্জ্জন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য একমাত্র সম্পাদকের ইচ্ছানুসারেই নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, এমন কি কয়েক বৎসর হইল ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির নামে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে উপাসনা গৃহ বিনির্ম্মিত হইয়াছে তাহার ট্রষ্টডীড আজিও প্রস্তুত হয় নাই। অনেকবার কোন কোন সভ্য অধ্যক্ষ সভা নিয়োগ ট্রষ্টডীড প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য গোপনে ও প্রকাশ্য সভাতে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু

কর্ম্মচারীদিগের অমনোযোগ ঔদাসীন্য বা অনিচ্ছানিবন্ধন সে সমুদায় প্রস্তাব বিফল হইয়া গিয়াছে।"

এখন দেখা যাউক এই সকল হেতুবাদের কোন মূল আছে কি না? যদি হেতু থাকিবে তবে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভার বিবেচনার জন্য যে কথাগুলি তাঁহার পত্রে লিখিয়াছিলেন, সে গুলি কেন সভার জ্ঞাপনার্থ পঠিত হইল না? এই নিবেদনপত্রে যে সকল হেতুবাদ উপস্থিত করা হইয়াছে, এই পত্রে কি উহার বিশিষ্ট প্রতিবাদ নাই? এই প্রতিবাদগুলি সত্য কি না, ইহার বিচার উপস্থিত হইলে শেষে বা প্রতিবাদকারিগণের উদ্দেশ্য বিঘটিত হইয়া যায়, এই জন্যই কি পত্রখানি সভার জ্ঞানগোচরে আনিতে অধিনায়কগণ হস্ত সঙ্কুচিত করিয়াছেন, অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণ ছিল? সে যাহা হউক, এ কথা কি সত্য যে, সম্পাদক চির দিন আপনার মতে সমুদায় কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, কখন কোন নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করেন নাই? ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনকাল হইতে প্রতিবর্ষে উহার বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছে; উহাতে প্রচারের কার্য্যবিবরণ, আয় ব্যয়াদির বৃত্তান্ত পঠিত হইয়াছে, সময়োপযোগী নির্দ্ধারণ সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৭৮৮ শকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য, সভ্য হইবার সাধারণ নিয়ম, সকল শাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ প্রচার, এবং প্রধানাচার্য্য মহাশয়কে অভিনন্দন পত্র দানের প্রস্তাব হইয়া ঐ সকল নির্দ্ধারিত হয়। সমস্ত সমাজ, উপাসক এবং প্রচারকগণকে একসূত্রে বদ্ধ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপ যাহাতে পরস্পরের হিত এবং একতা সাধন করে তজ্জন্য উহাদিগকে প্রণালীবদ্ধ করা এ সভার প্রধান লক্ষ্য। ১৭৮৯ শকে ৪ কার্ত্তিকে এই সকল বিষয় বিচারিত ও নির্দ্ধারিত হয়;—(১) প্রধানাচার্য্য মহাশয়কে অভিনন্দন পত্র দান, (২) ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহের দ্বিতীয় সংস্কার ও বাহুল্যরূপে প্রচার, (৩) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিনিয়োগ, (৪) ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকদিগের সহিত ব্রাহ্মদিগের ধনবিষয়ে সম্বন্ধ নিরূপণ, (৫) কলিকাতাস্থ ও বিদেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ সংস্থাপনের উপায় অবধারণ, (৬) ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা নিরাকরণের উপায় অবধারণ, (৭) ব্রাহ্মবিবাহ সকল লিপিবদ্ধ করিবার ভার কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অর্পণ।

সকল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হয়, তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, কোন গুরুতর প্রস্তাব মীমাংসিত হইবার পূর্ব্বে মফঃসলস্থ সভ্যগণের মত গ্রহণ করিবার নিয়ম হইয়াছিল। এই সভার সভ্য হইবার জন্য প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হয়। বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ জন্য এই সভা হইতে কয়েকটি উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ভার অর্পিত হয়। প্রচারকদিগের সমাজের সহিত সম্বন্ধবিষয়ক নির্দ্ধারণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে প্রচারবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্পণ করেন। এই সভা হইতে সাধারণ ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যালয়কে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত একত্রীভূত হইবার জন্য প্রার্থনা হয়। অধিকন্তু ১৮৭২ সনে যখন বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন হয়, সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হইয়া এই আন্দোলনে সাহায্য করেন। ১৮৭৩ সনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে সকল সমাজে ভাল করিয়া কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে এজন্য পত্র প্রেরিত হয়। ১৮৭৪ সনে উপাসকমণ্ডলী গঠিত হয়। ১৮৭৫ সনে প্রতিনিধিসভার নিয়মপ্রণালীনির্দ্ধারণের ভার কয়েক ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়। তাঁহাদের প্রদত্ত মতানুসারে ১৮৭৬ সনে প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হয়। নিবেদনপত্রে লিখিত হইয়াছে, "অর্থ সংগ্রহ বা অর্থব্যয়, প্রচারক নিযোগ বা প্রচারক বর্জ্জন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য একমাত্র সম্পাদকের ইচ্ছানুসারেই সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।" ইহার কোন কথাই ঠিক নয়। অর্থসংগ্রহ বা অর্থব্যয় নিয়মপূর্ব্বক নিযুক্ত অধ্যক্ষদ্বারায় চির দিন সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে; অধিকন্তু ১৭৯৫ শকের সাধারণ ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার বার্ষিক অধিবেশনে আমরা দেখিতে পাই, অর্থসংগ্রহের জন্য 'ব্রাহ্ম প্রচারসভা' স্থাপিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তাহার সভ্য হয়েন। প্রতিবার্ষিক সভাতেই আয়ব্যয়বিবরণ, প্রচারবৃত্তান্তাদি পঠিত হইত। প্রচারকনিযোগ বা প্রচারকবর্জ্জন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাবানুসারে অধ্যক্ষ সভা করিবেন, প্রতিবাদকারিগণ এই নিয়ম করিয়াছেন; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে 'প্রচারকসভা' কর্তৃক এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার নিয়ম আছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রচারকগণকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন (অবশ্য সে সম্বন্ধে প্রতিবাদকারিগণের পূর্ব্বে সম্মতি ছিল), তখন

প্রচারকগণের সভা যে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন তাহা ব্রাহ্মসাধারণের অনন্নু-মোদিত ব্যবস্থা নহে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এ কার্য্য আপনি করিতেন, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক। প্রচারকসভায় আবেদন, বৎসরাবধি পরীক্ষায় থাকা, প্রচারকনিয়োগসম্বন্ধে এ সকল ব্যবস্থা প্রচারকসভা করিতেন। এই সভা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যাঁহারা প্রচারক হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের অনুমোদনে প্রচারক হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরণায় আপনারা আসিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক জন প্রচারক যখন ব্রতধারণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদুপযুক্ত শিক্ষালাভের বাসনা কেশবচন্দ্রের নিকট জ্ঞাপন করেন, তখন তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, এখানে কেহ কাহাকেও শিক্ষা দেয় না; এখানে একত্র থাকিলে আপনা হইতেই শিক্ষা লাভ হয়। প্রচারকপরিবর্জ্জন কখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে হয় নাই, শাসনার্থ স্বতন্ত্রস্থিতি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র ইহা একা করেন নাই, প্রচারকসভার অনুমোদন লইয়া করিয়াছেন। প্রতিবার্ষিক অধিবেশনে যে যে বিশেষ বিষয় সকল সভ্য মিলিত হইয়া নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক তাহা যখন সেই অধিবেশনে নির্দ্ধারিত হইত, তখন সভ্যাদিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পাদক কার্য্য করিতেন, এ কথা উল্লেখ করা সাহসিকতা। প্রচারকসভার অন্তর্গত একটী 'কার্য্যসভা' ছিল। এই সভার সভ্য কেবল প্রচারকগণ ছিলেন তাহা নহে, অপরাপর সমাজজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মগণও উহার সভ্য ছিলেন। সমুদায় কার্য্য তাঁহাদিগের সকলের অনুমোদনে নির্ব্বাহ হইত, একা কেশবচন্দ্র কিছু করিতেন না। যখন কার্য্যসভা স্থাপিত হয় নাই, তখন ঐ কার্য্য প্রচারকসভাদ্বারা নির্ব্বাহ হইত। এস্থলেও বিশেষ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সমাজজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মগণ সভার সম্পাদক কর্ত্তৃক আহূত হইতেন।

ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার ভাব কেশবচন্দ্রে অতি প্রথম হইতে বিদ্যমান ছিল। যখন তিনি কলিকাতা সমাজের সহিত মিলিত ছিলেন, সে সময় হইতে তিনি এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী। প্রতিবাদকারিগণ তাঁহাদের তাৎকালিক পত্রিকার এক স্থলে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন, "একবৎসর অনেক চেষ্টা করিয়া অধিকাংশের মতে অধ্যক্ষসভা নামে একটী সভা নিযুক্ত করা গেল এবং কেশব বাবুকে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। কেশব বাবু হয়তো ঘরে গিয়া বিদ্রূপ করিয়া

বলিলেন 'হঁা, উহঁাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। সকলেত ব্রাহ্মসমাজের জন্য ভাবেন কত।' অমনি অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ অধ্যক্ষসভার আবশ্যকতা আর দেখিতে পাইলেন না। অধ্যক্ষ সভার সম্পাদক এক জন প্রচারক—আর সভা ডাকিলেন না। সভা জনমের মত নিদ্রা গেল।" এ কথাগুলি যে বিদ্বেষবিজৃম্ভিত তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। ১৭৯৮ শকের ৮ মাঘ প্রতিনিধিসভাস্থাপনের প্রস্তাব হয়। এই সভাসম্বন্ধে যাঁহারা প্রস্তাব করেন, এ বিষয় বিচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার তাঁহাদিগের উপরেই অর্পিত হয়। তাঁহারা যে সকল প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন, সে গুলি কেশবচন্দ্র দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে যে প্রস্তাবগুলি করেন তাহারই প্রতিচ্ছায়া। ১৭৯৯ শকের ৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রথম সভা এবং ৮ আশ্বিন শেষ সভা হয়। 'সভার সম্পাদক এক জন প্রচারক—আর সভা ডাকিলেন না। সভা জনমের মত নিদ্রা গেল;" এ কথা গুলি কি সত্য? সভার সম্পাদক তো কোন প্রচারক ছিলেন না। সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, সহকারী সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। ইঁহাদেরই অমনোযোগে সভার মৃত্যু ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রচারকের ঈর্ষা বা অমনোযোগের জন্য নহে। কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে গেলে কি ভয়ানক অন্ধতাই উপস্থিত হয়! বাস্তবিক ঘটনার অপলাপ করিলে তাহা চির দিন প্রচ্ছন্ন থাকিবে, এরূপ আশা দুরাশা। অন্য ভয় না থাকুক, ইতিবৃত্তলেখকদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপরে ভয় রাখাতো প্রতিবাদকারিগণের সমুচিত ছিল। এই সকল মিথ্যা অভিযোগ মূল করিয়া যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মূল কতকগুলি লোকের বিদ্বেষ বা অনাস্থা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, ইহা কি সহজে লোকের মনে উদিত হয় না?

প্রতিবাদকারিগণ (১) মহাপুরুষ (২) বিশেষ বিধান (৩) আদেশ, এই তিনটি মতে বহু দিন হইল অসন্তুষ্ট ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রকাশ্য লেখায় বক্তৃতায় এ সকল অসন্তুষ্টির কারণ অপ্রকাশিত রাখেন নাই। যাঁহারা এই মতগুলি মানিতেন, তাঁহারা এ সকল মত মানা না মানা সম্বন্ধে বহু দিন হইল ব্রাহ্মগণকে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিবাদকারিগণের প্রতিষ্ঠিত অন্য সমাজের মূলসত্য ঈশ্বর, পরকাল ও উপাসনার আবশ্যকতায় বিশ্বাস, কোন

সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞান কিংবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার না করা। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও সর্ব্বসাধারণের জন্য এই মূলসত্যগুলিই নিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং এই সকলেতে বিশ্বাস করিলেই উহার সভ্যরূপে পরিগণিত হওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে না আছে নিয়মতন্ত্রতার অভাব, না আছে মূল সত্যে ভিন্নতা; এরূপ স্থলে স্বতন্ত্র নাম দিয়া সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার মূল কি, সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন। কুচবিহার-বিবাহঘটিত দোষ স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার হেতু, এ কেবল কথার কথা। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকতো স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, "কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কার্য্যবিশেষকে নিন্দা করিয়া আপনারা যে কোন নির্দ্ধারণ করিতে চান তাহাতে বাধা অর্পণ করা অভিপ্রেত নহে।" তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন তাহা নহে, ইহাও বলিয়াছেন, "আগামী কল্যের সভাতে বর্ত্তমান সংগঠনের মূল ভঙ্গ না করিয়া উহার সংশোধন বা সভ্যমণ্ডলীর মঙ্গলপরিবর্দ্ধন জন্য যে কোন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে, আমি নিশ্চয়রূপ বলিতেছি, আমরা উহাতে সহানুভূতি এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব।" এরূপ স্পষ্ট কথার পর স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করা কি ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছে? প্রতিবাদকারিগণ যখনই কোন বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন, তখনই কেশবচন্দ্র তৎসহ সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছেন, এবারও তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুবর্গের তাদৃশ অভিপ্রায় ছিল। প্রতিবাদকারিগণ সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে না দিয়া 'সাম্প্রদায়িক বিভাগ' উপস্থিত করিলেন এতদপেক্ষা সন্তাপের বিষয় আর কি আছে? অন্য দিকে (১) মহাপুরুষ, (২) বিশেষ বিধান (৩) আদেশ, এই তিনটি মতসম্বন্ধে বহু দিন হইল মতভেদ ছিল, সাধারণ সমাজ তাহারই ফল, এ কথাও ঠিক বলা যাইতে পারে না। কেন না আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল মতের উপর কাহারও অবিশ্বাস থাকিলে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীর বহির্ভূত হইতেন না। পরমতসহিষ্ণুতা না থাকিলে কখন কোন সমাজেই তিষ্ঠিয়া থাকার সম্ভাবনা নাই। প্রতিব্যক্তির মতসম্বন্ধে ভিন্নতা থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে কি কেহ বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন? এই মতভেদসত্ত্বেও যাঁহারা ৬। ৭ বৎসর একত্র বাস, একত্র কার্য্য, একত্র উপাসনা প্রভৃতি সকলই করিলেন, এখন হঠাৎ কেন তাঁহারা একেবারে চির-

বিচ্ছেদ ঘটাইলেন, তাহার মূল অন্বেষণ করিলে কি প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের না বলাই ভাল, তন্নির্ণয় ভবিষ্যৎ ইতিবেত্তৃগণের জন্য রাখিয়া দেওয়া গেল। এখন দেখা যাউক এই কয়েকটি মতসম্বন্ধেই বা প্রতিবাদকারিগণের সঙ্গে তৎকালে কত দূর প্রভেদ ছিল।

প্রথমতঃ মহাপুরুষঘটিত মত। মহাপুরুষগণ সাধারণ মানবশ্রেণীর মধ্যে গণ্য নহেন, সাধারণ লোক 'নীচ' 'ঈশ্বরের অস্পৃশ্য' 'নরককুণ্ডসমান মানবকুলে মহাপুরুষগণের উৎপত্তি', তাঁহারা 'ঈশ্বর ও জীবের মধ্যবর্ত্তী', তাঁহাদিগের বিনা 'মানবকুলের আর ঈশ্বরলাভের আশা নাই', মহাপুরুষ সম্পর্কীয় মতের প্রতিবাদকারিগণ এই সকল মতঘটিত দোষ কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণেতে দর্শন করিয়াছেন। হঠাৎ একথা গুলি শুনিলে মনে হয় যাঁহারা এরূপ মত প্রচার করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেন কি প্রকারে? কিন্তু সত্য যাহা তাহা সত্য; যত্ন করিয়াও উহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে কাহারও সাধ্য নাই। মহাপুরুষগণকে যদি 'ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা' 'ধর্ম্মবীর' এই আখ্যা দান করা যায়, তাহা হইলে প্রতিবাদকারিগণ আপত্তি তুলিতে পারেন না, কেন না তাঁহাদের কর্তৃক পল এই নামে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং অন্যান্য ধর্ম্মবীর তদ্রূপে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাদের পত্রিকায় স্থান পাইবেন প্রতিবাদকারিগণ পাঠকগণকে এ আশা দিয়াছেন। সকল লোকেই কি ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা নয়? ইহার উত্তরে প্রতিবাদকারিগণ বলিয়াছেন, "যে অবস্থায় আবশ্যক হইলে মনুষ্য ঈশ্বরের কার্য্য জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে, সেই অবস্থাতে মানবের আত্মাতে ঐশী শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে এবং যদি কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে দিন দিন সেই শক্তি আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধিকৃত করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে আত্মার সকল বিভাগ সেই শক্তির দ্বারা পরাজিত হইয়া পড়ে। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি সত্য কথা, কিন্তু সেরূপ নির্ভরের সহিত কয় ব্যক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন? আমাদের মধ্যে কয় জন আছেন যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নীত হইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত—যাঁহারা কোন প্রকার বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া গণ্য করেন না? আমরা সহজে এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের আত্মাতে অনুপ্রাণিত হইবার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় না।" ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা ও

সাধারণ লোকেতে কি পার্থক্য, এই কথাগুলিতে তাহা স্পষ্ট মানিয়া লওয়া হইয়াছে। পল যে এই প্রকারের লোক ছিলেন, প্রতিবাদকারিগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরানুপ্রাণনে পল অসাধারণ লোক হইয়াছিলেন, ইহা যদি তাঁহারা মানিলেন, মহাপুরুষের মতের মধ্যে এই ভাবের কথা দেখিয়া তাঁহাদের এত ভয় কেন? সে সকল ব্যক্তির ভিতরে অসাধারণত্ব লুক্কায়িত থাকে কালে প্রকাশ পায; যখন প্রকাশ পায় তখন তাঁহারা ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা হইয়া উঠেন, একথা বলিলে বিবাদের ভূমি সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। প্রতিপক্ষের কথার ভঙ্গীতে মনে হয় 'মানবকুলনরক' ঈশ্বরের "অস্পৃশ্য" 'নীচ' এসকল কথা কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ বলিতেন এবং এইরূপ মত প্রচার করিতেন। যাঁহাদের মতসম্বন্ধে অবিশ্বাস আছে, তাঁহাদের সহজ কথা অন্যভাবে গ্রহণ করা, ইহাত সচরাচরই ঘটিয়া থাকে। মহাপুরুষগণের মধ্যবর্ত্তিত্ববিষয়ে মতভেদ, ইহাও পরস্পরকে ভাল করিয়া না বোঝাতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কোন প্রকারের ব্যবধান ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য কোন কালে সহ্য করেন নাই, ব্রহ্মমন্দিরের বিবিধ উপদেশ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন। "ধর্ম্মোপদেষ্টা সাধু এবং উপদিষ্ট সাধক এ উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা কেবল সাহায্যের সম্বন্ধ, অধীনতাসম্বন্ধ নয়, সাধকের প্রকৃতির মধ্যে যে ধর্ম্মভাব আছে তাহার স্ফূর্ত্তিবিষয়ে সাহায্য করাই তাঁহাদের কার্য্য", প্রতিবাদকারিগণের এ কথা গুলির সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অগ্রসর সভ্যগণের মতভেদ কোথায়? তাঁহারাও যাহা বলিতেছেন ইঁহারাও তাহাই বলেন। অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাবের স্ফূর্ত্তিবিষয়ে সাহায্যই প্রকৃত মধ্যবর্ত্তিতা,* মধ্যবর্ত্তিতা ঈশ্বর ও জীবের ব্যবধারকত্ব নহে। "যিনি ঈশ্বরকে গোপন করিয়া নিজের জন্য লোকের অনুরাগ ও উপাসনা গ্রহণ করিবেন, তিনি চিত্তাপহারী বলিয়া ঘৃণিত হইবেন" "আমরা এজন্য সৃষ্ট নই যে চির কাল সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকিব, এজন্যও

* None can reach Divinity except through the character and disposition of the son inherent in him. In this sense is Christ our mediator.—*That Marvellous Mistery—The Trinity.*

স্পষ্ট হই নাই যে কোন পুস্তক বা ব্যক্তিবিশেষের অনুগত হইয়া জীবন ধারণ করিব, কিন্তু ইহাতে এ কথাও বলিতেছি না যে আমরা সকল পুস্তক পরিত্যাগ করিব, সাধুসঙ্গ করিব না, সংসারধর্ম্ম পালন করিব না।" এ সকল কথার সঙ্গে প্রতিবাদকারিগণের অবশ্য কোন বিরোধ নাই; অথচ এ কথাতো অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। "আমরা কোন পুস্তকে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি না, কোন মনুষের দাস বা উপাসক হইয়া তাঁহার নিকট পড়িয়া থাকিতে পারি না", এ সকল কথা কি আর প্রতিবাদকারিগণের বিরোধী কথা? মহাপুরুষকে কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করা, এসম্বন্ধে মতভেদও দৃশ্যতঃ। "ঈশ্বরকে পাইতে হইলে তাঁহাদের কাহাকেও কেন্দ্র করিতে হইবে," এরূপ দোষারোপ কল্পনাপ্রসূত। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের সহিত এক করিবার জন্য কেন্দ্র নহেন, মানবমণ্ডলীর সহিত এক করিবার জন্য তাঁহারা কেন্দ্রস্বরূপ। তাঁহাদের যে সকল মানবীয় ভাব আছে, সেই সকলের স্ফূর্ত্তিতে মানবে মানবে একত্ব উপস্থিত হয়। ভক্তি আত্মত্যাগ প্রভৃতির তাঁহারা এক এক জন প্রতিনিধি। তৎসম্বন্ধে মানবজাতির সহিত তাঁহাদের বিজাতীয় সম্বন্ধ নহে, সজাতীয় সম্বন্ধ। তাঁহাদের ঐ সকল প্রস্ফুট ভাব অপরের হৃদয়ের অস্ফুট ভাব প্রস্ফুট করিয়া দেয়। "ভক্তকে লইয়া টানাটানি করিও না। যাও ঈশ্বরের কাছে ভক্তেরা আপনারা আসিবেন। ভাই বন্ধু সাবধান হও, আমরা ভক্তকে জানি না, ভক্তকে ভাল বাসিতে পারি না ঈশ্বরকে ছাড়িয়া"। এ কথার সঙ্গে "ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না জন্মিলে ঈশ্বরের ভক্ত সাধুদের প্রতি ভক্তি জন্মিতে পারে না", প্রতিবাদকারিগণের এ কথার কি অনৈক্য আছে? মহাপুরুষেরা স্বকার্য্যে অভ্রান্ত, এ মতেও কোন বিরোধের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মার সর্ব্ববিষয়ে ভ্রমপ্রমাদশূন্য হওয়া অসম্ভব হইলেও যে বিষয়ে ঈশ্বরানুপ্রাণিত সে বিষয়ে অভ্রান্তি মানা যাইতে পারে। স্বকার্য্য ব্যতীত অন্যত্র মহাপুরুষগণের ভ্রান্তি ঘটিবে, ইহা আর কে অস্বীকার করিবে? যে স্থলে অভ্রান্তির সম্ভাবনা সেখানেও ভাবই সত্য, ভাষায় দোষ থাকা কিছু অসম্ভব নহে। ফলতঃ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে প্রতিবাদকারিগণ অন্য উপলক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে মহাপুরুষবাদের মতগুলি অন্তর্নিবিষ্ট আছে। তবে এই মত লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী আন্তরিক অসম্মিলন কেন? যাহা কেবল মতে

থাকে আর যাহা জীবনে পরিণত হয়, এ দুয়ের মধ্যে ঔজ্জ্বল্যে এত পার্থক্য ঘটে যে,কথায় ব্যবহারে সে পার্থক্য প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারে না। বিরোধ মতের ঔজ্জ্বল্যে ও অনৌজ্জ্বল্যে ; তৎপ্রকাশে ও অনুদ্ভিন্ন অবস্থায় স্থিতিতে। কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণের অভ্রান্ত মধ্যবর্ত্তী ইত্যাদি দোষারোপসময়ে প্রচারক-সভা স্বয়ং প্রতিবাদ করিয়াছেন* ; সুতরাং তাঁহাকে লইয়া এ সকল কথার অবতারণা কেবল সাধারণ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

দ্বিতীয় বিশেষ বিধান। এই মতটি লইয়াই ঘোর বিবাদ। এ বিবাদও দৃশ্যতঃ বস্তুতঃ কিছুই নহে। প্রতিবাদকারিগণ বলিতেছেন, "ঈশ্বরের মুক্তির বিধান যে কোন সঙ্কীর্ণ চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমরা এরূপ মনে করি না। এক জন যে এই পরিধির কেন্দ্রভূত এবং তিনি যে তদানীন্তন পরিত্রাণপ্রদ সত্য সকলের উৎসস্বরূপ আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। যেমন বৃদ্ধি ও পুষ্টির তারতম্য অনুসারে ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রত্যেক তরুই জলবায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সাধন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্য অনুসারে আমাদের প্রত্যেকেই মুক্তি-সাধনের উপযোগী সত্য লাভে সমর্থ হইয়া থাকি। এক ব্যক্তি ধনী আর সকলে কর্জ্জ করিয়া উদ্ধার হইবে, ঈশ্বরের এরূপ নিয়মই নয়। আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাঁহার নিকট ব্রাহ্মসমাজ কিছু না কিছু উপকার লাভ করিতে

---

* "আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি প্রচারকদিগের ব্যবহারসম্বন্ধে সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। এজন্য এতন্নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিয়া সাধারণের মনের ভ্রান্তি দূর করা কর্ত্তব্য। কোন নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না। কোন বিশেষ ব্রাহ্ম মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমাদের কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিলে তাঁহার খাতিরে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন নতুবা করিবেন না, এরূপ আমরা বিশ্বাস করি না। মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রম ও অপবিত্রতা আছে, সুতরাং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ পূর্ণ সত্যের আদর্শ হইতে পারেন না। তবে আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বর আদেশে আমাদের ধর্ম্ম ও সংসারের ভার লইয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহাকে ধর্ম্ম ও সংসার উভয় সম্বন্ধে বন্ধু ও আচার্য্য বলিয়া শ্রদ্ধা করি।"—প্রচারকসভার বিবরণগ্রন্থ ১লা পৌষ ১৮০১ শক।

পারে না। ইহার একটীকে দূরে রাখিলে একটী আলোক দূর করা হয় এবং আমাদের সমাজ সেই অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের সকলের মিলিত সমষ্টিকে যদি বিশেষ বিধান বল ক্ষতি নাই। মার্কিন দেশে পার্কার, ইংলণ্ডে কুমারী কব, মার্টিনো, ভয়সি, কলেট, নিউম্যান, এ দেশে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণই যে কেবল সেই বিধানের অঙ্গভূত হইয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা নহে, আমাদের মধ্যে যিনি যেখানে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে সাহায্য করিতেছেন, সকলেই সেই এক নিয়তির দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে সাহায্য করিতেছেন। যে পরিমাণে এই সকলের ভাব ও ইচ্ছার সমাবেশ করিতে পারা যাইবে, সেই পরিমাণে প্রকৃত ধর্ম্মসমাজ গঠিত হইল মনে করিব। যে প্রণালীতে ঈশ্বরের সকল উপাসককে এক সূত্রে বদ্ধ করা যায়, যদ্দ্বারা প্রত্যেকের হৃদয়স্থিত সত্যালোকের সাহায্য পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা যথাসাধ্য সেই আলোকানুসারে ধর্ম্মসমাজের নিয়মাদি প্রণীত হয়, সেই প্রণালীই শ্রেষ্ঠ প্রণালী, এবং এইরূপে যে ধর্ম্মসমাজ গঠিত হয় সেই সমাজ প্রকৃত ঈশ্বরের সমাজ; সেই সমাজের নিকট মস্তক অবনত করা যায়" ইত্যাদি। এখন দেখা যাউক বিশেষবিধানসম্বন্ধে ঈদৃশ মত আমাদের মধ্যে অতিপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে কি না? ১৭৯৫ শকের ২৫ ফাল্গুন রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "জগৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া চিরকালই কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা কোন বিশিষ্ট পুস্তকের মধ্য দিয়া তাঁহাকে নিকটে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম, কোন পুস্তক কিংবা কোন মনুষ্যের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না। আমরা প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাকে দেখিতে চাই এবং প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার শাস্ত্র পাঠ না করিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই বিশেষ বিধান। ইহার প্রত্যেক দিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমাদের প্রিয়। কেন না আমরা বিশ্বাস করি ইহার প্রত্যেক ঘটনা বঙ্গদেশের ভারতভূমির এবং সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর স্বয়ং সংঘটন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় ব্যাপার একত্র করিলে যাহা হয়, তাহার নাম

ঈশ্বরের বিশেষ বিধান।......জগৎ যখন দেখিতে পায় একটী কিম্বা কতকগুলি পাপীর পরিত্রাণের জন্য অসামান্য এবং বিশেষ ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইল, আর তাহারা অবিশ্বাসী কিম্বা অচেতন থাকিতে পারে না। সে সমুদায় অসাধারণ ঘটনার ভিতরে তখন তাহারা দেখিতে পায় ঈশ্বরের হস্ত প্রত্যক্ষরূপে কার্য্য করিতেছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের এই বিশেষ বিধান সেইরূপ।......গুরু এবং শাস্ত্র ভিন্ন বিশেষ বিধান হইতে পারে না। প্রত্যেকে পরিত্রাণের জন্য গুরু এবং শাস্ত্র অন্বেষণ কর। যত ক্ষণ না এই দুই আশা পূর্ণ হয় তত ক্ষণ মনুষ্যের আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ! তোমরা জান না তোমাদের গুরু কে এবং তোমাদের শাস্ত্র কি? ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের গুরু এবং ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় ঘটনা তোমাদের শাস্ত্র।* যাহারা বলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশীল মনুষ্যই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য উপাচার্য্য, এবং প্রচারক হয়, তাহারা অল্প বিশ্বাসী, কিন্তু বিশ্বাসী তাঁহারা যাঁহারা বলেন এ সকল লোকের ভিতরে ঈশ্বরের অঙ্গুলী কার্য্য করিতেছে। আবার বাহিরে দেখিতেছি কতকগুলি মনুষ্য উপদেশ দিয়া বেড়ায়, ইহাতে কি এই বলিব যে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মেও মনুষ্য গুরু? না, আমাদের একমাত্র গুরু সেই পরম গুরু ঈশ্বর। তাঁহার হস্তলিখিত ঘটনা সকল আমাদের একমাত্র শাস্ত্র।......ব্রাহ্মগণ! তোমাদের গুরু নিকটে কি না বল? নিকটে যদি গুরু না থাকেন কাহার কথা শুনিতেছ? পরিত্রাণ কি এতই সহজ ব্যাপার যে মনুষ্য অথবা পুস্তকের কথায় নির্ভর করিয়া তাহা লাভ করিবে? পুস্তক কিম্বা মনুষ্যের প্রত্যেক কথা যদি ব্রহ্মের কথা না হয় গরল বলিয়া তাহা পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মই আমাদের গুরু, ব্রহ্মই আমাদের শাস্ত্ররচয়িতা। ধর্ম্মশাস্ত্র কি? যাহাতে

* নববিধান ঘোষণার পরও যে এমতের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, এই গুটিকয়েক কথাতেই সপ্রমাণ হইবে—From the time of the foundation of the visible Church of the Brahmo Somaj by the Lord's servant and apostle, Rajah Ram Mohan Roy, down to the present day, every event that has occurred under Providence, including the whole history of the opposition, is to us saving gospel, and woe unto him who disbelieves or questions a single word or syllable of this unwritten book:—*The New Dispensation 15th July, 1883.*

ধর্ম্মজীবনের ঘটনা সকল বর্ণিত থাকে।......যে দিন আমরা প্রত্যেকে ব্রাহ্ম হই, সেই দিন হইতে আমাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ হয়।......যখন সেই অভ্রান্ত গুরু আমাদের মধ্যে থাকিয়া উপদেশ দিতেছেন তখন ব্রাহ্ম-সমাজের ভয় কি? যে বিশেষ বিধানে ঈশ্বর আমাদিগকে আনিয়াছেন, ইহা তাঁহারই অভ্রান্ত বিধান।" ৩রা চৈত্রের উপদেশে সমুদায় বিধানের সহিত এই বিধানের যোগ কেমন সুস্পষ্ট ভাষায় কথিত হইয়াছে। "সহস্র সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহা আমারই জন্য, এইরূপে ভক্ত বিশ্বাস দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের অতীত এবং বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনা আপনার জীবনে গ্রথিত করিয়া সুখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি নিকটস্থ হয়, পরের বস্তু আপনার হয়, ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজও ঈশ্বরের একটী বিধান ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন কেবল বঙ্গদেশের কয়েকটী ঘটনা আমাদের জন্য, অন্যান্য দেশের গুরু, উপদেষ্টা এবং ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই; পৃথিবীর সমুদায় পর, কেবল বঙ্গদেশের কয়েক জন ব্রাহ্মই আমাদের আপনার লোক, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বর্গীয় ধর্ম্মের উপযুক্ত নহে। বঙ্গদেশের এই ১০।৫টী লোক যাহারা ধর্ম্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে কেবল ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া মরিব, এই জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ। সমুদায় যোগী ঋষি সাধু ভক্ত যাঁহারা জগতে আসিয়াছিলেন সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাঁহাদের স্বর্গীয় জীবন এবং সমুদায় উপদেশের শেষ ফল হইল এই ব্রাহ্মসমাজ।......ব্রাহ্মধর্ম্ম কতকগুলি মতের সমষ্টি নহে। সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে যে সকল ভক্ত এবং অগ্নিময় সত্য প্রেরণ করিয়াছেন সে সমুদায় একত্র হইলে যে একটী প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা দুর্জ্জয় বল হয় তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।" বিশেষবিধানসম্বন্ধে আর অধিক কথা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন করে না। যাঁহারা কেশবচন্দ্রের স্বমুখের এই কথাগুলি পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের মনে সহজে এই ধারণা হইবে যে, প্রতিবাদকারিগণ এ সকল কথা এক সময়ে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াও যে এ সম্বন্ধে বিবিধ কল্পিত অনৃত বচন রচনা করিয়াছেন, ইহা কেবল কেশবচন্দ্রকে জনসমাজে অপদস্থ করিবার জন্য। এ সকল কথা বলিতে ও লিখিতে হৃদয় নিতান্ত শোকভারগ্রস্ত হয়। কি করা

যায়, সত্যের অনুরোধে এবং মিথ্যাপবাদ ক্ষালনের জন্য এ সকল কথার উল্লেখ প্রয়োজন।

তৃতীয় আদেশ। প্রতিবাদকারিগণ বিবেক ও বুদ্ধি এ দুইয়ের বিষয় বিভাগ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায়ের নির্ণয় স্থলে বিবেক এবং বাণিজ্যাদি ক্ষতিলাভের বিষয়ে বুদ্ধির অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন। "যে কার্য্যকে যেরূপ দেখিয়াছি তাহার অন্যথারূপ বর্ণন করিব কি না? এ সকল প্রশ্ন বিবেকের অধিকারান্তর্গত। জগদীশ্বর একপ প্রশ্ন সকলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে ভার দিয়াছেন। আমি একরূপ ব্যবসাদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিব, কিম্বা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিব? এ প্রশ্নের সহিত বিবেকের কোন সম্পর্ক নাই। এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে ক্ষতিলাভের গণনা করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ কোন কার্য্যের মধ্যে আমাদের প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অধোগতি সন্নিহিত থাকিতে পারে। হয়ত বাণিজ্য করিতে কোন স্থানে গিয়া আমার চরিত্র দূষিত হইবে, কিম্বা কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার দর্শিবে। তাহা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই বিদিত আমার বোধাতীত। আমাদিগের বন্ধুদিগের মতে এ সকল স্থলেও মনুষ্য যদি প্রার্থনাপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট উত্তর দিয়া কি করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেন। কথাটা এই, আমি যথাদৃষ্ট বিষয়ের অন্যথা বর্ণন করিব কি না? প্রশ্ন করিলে ঈশ্বর বিবেকদ্বারা বলেন 'না'; এ কথা ব্রাহ্মদের সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু এ আদেশের মত সে প্রকার নহে। এ মতানুসারে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি কোন কার্য্য লইয়া কলিকাতাতে থাকিব, কিম্বা মফঃস্বলে যাইব, তাহাতেও ঈশ্বর স্পষ্ট করিয়া কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দেন। আমাদের যে আদেশের মতে আপত্তি, তাহা এই প্রকার আদেশ।" অবশ্য আপত্তি এখানে স্পষ্টভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বিবেক, বিশ্বাস, হৃদয় ও বিচারশক্তি দ্বারা ঈশ্বরানুপ্রাণনে সত্য সকল 'বিদ্যুল্লতার ন্যায়' 'গগনসঞ্চারী উল্কাপিণ্ডের ন্যায়' সহসা হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, প্রতিবাদকারিগণের এ কথায় কোন আপত্তি নাই। অনুপ্রাণিত ভাবোচ্ছ্বাসে স্বার্থচিন্তা প্রভৃতির তিরোধান হয়, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন। আপত্তি এই, ঈশ্বর মানবের সাংসারিক বিষয়ে কোন আলোক দান করেন না, তিনি কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মের, ন্যায় অন্যায়ের বিষয় লইয়া

আছেন। যেখানে বিবেকের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেখানেও ইহাঁদের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, কেন না 'জগদীশ্বর এরূপ (নৈতিক) প্রশ্ন সকলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে ভার দিযাছেন।' অনুপ্রাণন অর্থে ইঁহারা কি বুঝেন? মানবের আত্মাতে ঈশ্বরের ভর করা। এ ভর করাতে কি স্বয়ং ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন? না, 'সত্যদর্শনের উপযোগী যতগুলিবৃত্তি আছে, সমুদায় ঐশী শক্তির আবির্ভাবে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়।' সুতরাং এস্থলে বিবেক বা অন্যান্য বৃত্তির মধ্যবর্ত্তিতা স্পষ্ট স্বীকৃত হইতেছে। এখানেই ইঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা নহে; কেন না সহজ জ্ঞান ও বিবেকের অনুবোধে নীতি ও সত্যের অনুসরণ ইঁহারা এইরূপে নিকৃষ্টশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন;—"ইঁহারা যদিও শাস্ত্র বিশেষ বা মনুষ্যবিশেষের মধ্যবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বিবেকের মধ্যবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া ইঁহাদের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বাস করিতেছে। পুরাতন শাস্ত্রের সীমা এই খানেই শেষ হইল।" এখন নূতন শাস্ত্র ইঁহারা কি বলেন পাঠকগণ শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, কেশবচন্দ্রের আদেশবাদের সঙ্গে উহার কত দূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। "এখানে নূতন শাস্ত্র কি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ঈশ্বরের মুখ হইতে যে শাস্ত্র সাক্ষাৎ নির্গত হইয়া মানবীয় সূক্ষ্ম চৈতন্যে * যাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহাই নূতন শাস্ত্র। নূতন শাস্ত্রাবলম্বীদিগের নিকট বিবেক ঈশ্বরের মুখ, কেবল প্রতিনিধি নহে। ইহা বাহ্যদর্শী স্থূল চৈতন্যের অধিগম্য নহে, কিন্তু আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম চৈতন্যের বিষয়। যাঁহারা এই সূক্ষ্ম চৈতন্য লাভ করিয়া নূতন শাস্ত্রের অধিকারী হয়েন, তাঁহাদের আর নীতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিতে হয় না, তাঁহারা প্রতিবারে ঈশ্বরের

* স্থূল চৈতন্য ও সূক্ষ্ম চৈতন্য প্রতিবাদকারিগণ এইরূপে বিভাগ করিয়াছেন, 'মনুষ্য যত দিন তাঁহার ঈশ্বরকে তাঁহার অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করিতে না পারেন, তত দিন তাঁহার চৈতন্য জীবচৈতন্যের ন্যায় নিতান্ত স্থূল ও মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন। কেবল প্রভেদ এই যে, মানবচৈতন্য বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং বিকাশপ্রবণ, জীবচৈতন্যে সেই বুদ্ধিশক্তি ও বিকাশপ্রবণতার সমধিক অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়। মানবচৈতন্য ক্রমে স্বকীয় স্থূলত্ব পরিহার পূর্ব্বক সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাতেই মনুষ্যের এত মহত্ব, এত গৌরব।'

আদেশ শুনিয়া কার্য্য করেন। তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরে নিত্য বর্ত্তমান। তাঁহাদের শাস্ত্র চিরজাগ্রত চিরজীবন্ত। যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, সেখানে কে নীতিশাস্ত্রের মৃত বচন স্মরণ করিয়া তাহার অনুসরণ করে? সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং শাস্ত্রস্বরূপ।" "এ নূতন শাস্ত্র প্রতিনিয়ত অন্তরেই স্ফূর্ত্তি পায়, ইহা কখন বাহিরে ব্যক্ত হয় নাই। ইহা অব্যক্ত চির অব্যক্ত। বাহিরে ব্যক্ত হইলেই ইহার মাহাত্ম্য চলিয়া গেল, উহার নূতনত্ব দূর হইল, তৎক্ষণাৎ উহা পুরাতন শাস্ত্র হইয়া গেল। এই শাস্ত্র ভাষায় অনুবাদনীয় নহে।" একেবারে সংশয়বাদ হইতে রহস্যবাদে উপস্থিতি, এই কথা গুলিতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। ১৭৯৩ শকের ২৬ শে ভাদ্র কেশবচন্দ্র প্রত্যাদেশসম্বন্ধে ব্রহ্ম মন্দিরে যে উপদেশ দেন, তাহার কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতে সকলেই দেখিতে পাইবেন উহার মধ্যে সংশয় বা রহস্য-বাদের অণুমাত্র গন্ধ নাই, বিষয়টি যথাযথ বর্ণিত। "যদি বল তোমাদের অন্তরে ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, যখন প্রলোভন আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করে তখন বিবেক তোমাদিগকে পুণ্যপথে লইয়া যায়, তখন বুঝিতে পার ব্রাহ্ম হওয়া উচিত এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কর, তখন বুঝিতে পার ভ্রম কুসংস্কার দূর করিয়া মনকে জ্ঞানদ্বারা পরিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য এই জন্য জ্ঞানো-পার্জ্জন কর, তখন বুঝিতে পার ব্রহ্মমন্দিরে না আসিলে হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পার না এই জন্য প্রতি রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হও। যদি বল এ সকল ধর্ম্মবুদ্ধির কথা, তোমরা নিজে যাহা উচিত বোধ কর তাহা কিরূপে ঈশ্বরের কথা হইতে পারে? কিন্তু ইহা কি তোমরা জান না ঈশ্বর কোন ভাষায় ভক্তের সঙ্গে কথা কন? তিনি জানেন তাঁহার সন্তানেরা প্রথমেই তাঁহার মহোচ্চ উপদেশের অর্থ বুঝিতে পারে না। এই জন্য ইহা উচিত নয়, ইহা দ্বারা জগতের মঙ্গল হইবে, ইহা দ্বারা জগতের অনিষ্ট হইবে, এইরূপ সহজভাবে তিনি ক্ষুদ্র শিশুদিগকে উপদেশ দেন। যদি বল অনেক সময় ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না তাহা আমি মানি না। যত দিন নিম্ন-শ্রেণীতে থাকিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে, তত দিন বিবেকের বাক্য ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস, ইহাও তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য। সত্য বটে ইহা নিকৃষ্ট অধিকার; কিন্তু এই অবস্থায় তোমরা উৎকৃষ্ট আদেশের

অধিকারী হইতে পার না। প্রথম মনুষ্যকে বিবেক ক্ষুদ্র গুরু হইয়া উপদেশ দেন, যখন উচ্চশ্রেণীতে উঠিবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেই বিবেক তোমাদিগকে তাঁহার প্রত্যক্ষ সন্নিধানে উপস্থিত করিবে। তখন স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের মুখের কথা শুনিবে।" "ব্রাহ্মগণ! তোমাদের সঙ্গে কি ঈশ্বর কখন কথা বলেন নাই? তোমরা যখন সাধু কার্য্য কর, কে তোমাদিগকে সেই কার্য্য করিতে বলেন? যদি বল বুদ্ধির উত্তেজনায় এবং জগতের অনুরোধে তোমরা সৎকর্ম্ম কর, তবে তোমরা মিথ্যাবাদী। প্রত্যেক সত্য যেমন ঈশ্বর হইতে বিনিঃসৃত, তেমনি প্রত্যেক শুভ বুদ্ধি তিনিই প্রেরণ করেন। বাস্তবিক সেই পরম গুরু হইতে তোমরা প্রত্যেক সাধু ইচ্ছা লাভ করিতেছ। প্রত্যেক সত্য এবং প্রত্যেক সাধুভাবের জন্য তোমরা ঈশ্বরের নিকট ঋণী। সে ব্যক্তি চোর, সে অকৃতজ্ঞ, যে সত্য পাইয়া অস্বীকার করে। সে আপনার হস্তে অম্লানমুখে ঈশ্বরের গৌরব গ্রহণ করিতে চায়। এখনও ঈশ্বর সর্ব্বদা কথা কহিতেছেন, আর তোমরা অকৃতজ্ঞ হইয়া তাহা অস্বীকার করিও না। যখন একটি সদুপদেশ অন্তরে লাভ কর, অহঙ্কারশূন্য হইলেই জানিতে পারিবে, পরমেশ্বর স্বয়ং গুরু হইয়া তাহা দান করিলেন।" "জিজ্ঞাসা করি কে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে আনিয়া উপাসনায় যোগ দিতে বলিতেছেন। যদি সামান্য বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের আদেশ অস্বীকার করি, তবে কিরূপে প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার গুরুতর আদেশ সকল শ্রবণ করিব। পশুর হস্তে কি কেহ নানা প্রকার রত্ন দান করে? মনুষ্য পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে ইহা যদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বর যে তাঁহার সন্তানদিগের সহিত কথা কহেন, ইহা কেন অবিশ্বাস করিব? ঈশ্বর ইংরাজী সংস্কৃত কিংবা বাঙ্গালা ভাষাতে কথা কন না। তিনি হৃদয়ের ভাষাতে কথা বলেন। তিনি যাহা বলেন তাহাই সত্য, পাপীর হৃদয় তাঁহার মুখে যে কথা শুনে তাহাই পরিত্রাণ-শাস্ত্র। এই জন্য মনুষ্যের কথাকে শাস্ত্র বলিতে পারি না। ঈশ্বরের কথা যখন মনুষ্য আপনার ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করে, তখন সেই কথা দুর্ব্বল হইয়া যায়। সেই কথা আর তেমন জীবন দান করিতে পারে না। ঈশ্বরের মুখের বাক্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। ঐ বাক্য শুনিলে মৃতপ্রায় মনে উৎসাহ উদ্যম প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মুখে বলিবার সময় এবং পুস্তকে লিখিবার সময় তাহার তেজ হীন হইয়া যায়।" "তিনি

মনুষ্যের ভাষায় কথা কন না; কিন্তু তাঁহার ভাষা সমুদায় জাতি এবং সকল ব্যক্তিই বুঝিতে পারে। যে জ্ঞান ভিন্ন তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারে না, তাহাকে তিনি জ্ঞানের আলোক দ্বারা তাঁহার ভাষা বুঝাইয়া দেন। যাহার হৃদয় কোমল তাহার অন্তরে ভক্তি বিধান করিয়া তিনিই তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করেন; যে কার্য্য করে তাহাকে তিনি কার্য্যস্রোতের ভিতরে রাখিয়া শান্তি দান করেন। যে নিতান্ত দরিদ্র, যাহার জ্ঞান ভক্তি কিছুই নাই, তাহাকে তাহার উপযুক্ত উপায়ে তাঁহার ভাষা বুঝাইয়া দেন।" "আমরা ব্রহ্মের কথা শুনিতে পারি ইহা অহঙ্কারের কথা নহে। কিন্তু সে ব্যক্তি অহঙ্কারী যে ঈশ্বরের আদেশ আপনার কথা বলিয়া জগতে প্রচার করে। তিনিই যথার্থ বিনয়ী যিনি বলেন কোন সত্যই আমার নহে, ঈশ্বর সমুদায় সত্যের অধিপতি। তিনি যখন যাহা দেন তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নিজে কিছুই আনিতে পারি না, তিনি যাহা দেন তাহাই ভোগ করি। যখন তিনি বলেন, সন্তান! আহার কর, তখন আহার করি, যখন বলেন, বৎস! এই সাধু কার্য্যটি তুমি সাধন কর, তাঁহার কথা শুনিয়া তখন সেই কার্য্য করি, যখন বলেন, ঐ তোমার ভ্রাতা, তাহাকে আলিঙ্গন কর, তখনই ভ্রাতার পদতলে পড়িয়া নমস্কার করি। যাঁহারা প্রাণের সহিত এ সকল কথা বলিতে পারেন তাঁহারাই বাস্তবিক বিনয়ী। যাহারা আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া এ সকল প্রত্যক্ষ আদেশ অস্বীকার করে তাহারা দাম্ভিক।" "আমি সত্য বুঝি, আমি সাধু কার্য্য করি, আমি লোকের মন ভাল করিয়া দিই, এই অহঙ্কার ছাড়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন একটী সামান্য সত্যও পাইতে পার না। যখন চারিদিক্ অন্ধকার, কোথাও সত্যের আলোক দেখিতে পাও না, তিনিই তখন সত্য দেন। যখন পাপবিকারে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়, তিনিই তখন অন্তরের মধ্যে সুধা ঢালিয়া দেন।"

যে তিনটি বিষয়ের মত লইয়া প্রতিবাদকারিগণ বিবিধ শ্লেষ কটূক্তি, ব্যঙ্গ, নিন্দা ও গালিবর্ষণ করিয়াছেন, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাত তত্ত্বগুলিতে অর্থান্তর ঘটাইয়া জনসমাজের নিকটে ঐ সকল নিন্দিত ও ঘৃণাস্পদ করিতে যত্ন করিয়াছেন, আমরা এতক্ষণ যাহা প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এ তিনটি মতে ভাবতঃ কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল মনের গম্ভীর সংস্কারবশতঃ ঐ গুলিকে অন্যরূপে গ্রহণ করাতে। প্রতিবাদকারিগণের

পত্রিকা হইতে আমরা আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া অর্থান্তর ঘটান খণ্ডন করিতে পারিতাম, কিন্তু এতকালের পর সে সকল কথা লইয়া কেশবচন্দ্রের জীবনী পূর্ণ করা নিতান্ত অযোগ্য। কালস্রোতে যাহা আপনি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, নিন্দিতভাবে তাহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিবার প্রয়াস কখন প্রশংসনীয় বা নীতিসঙ্গত নহে। আমরা যাহা লিখিলাম, ইহাতে যদি প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া নামান্তরে অন্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রভেদ আনয়ন করিবার কোন হেতু ছিল না, ইহাতে কেবল বিদ্বেষ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল, আর আমাদের অধিক বলিবার কিছু প্রযোজন করে না। এই আন্দোলনের ব্যাপারটি উপলক্ষ করিয়া কেশবচন্দ্র বার্ষিক ব্রাহ্মগণের সাধারণ সভায় আপনার মনের কি ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন এ স্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বর্ত্তমান আন্দোলনসম্পর্কে সভাপতি যে দুঃখ প্রকাশ করিলেন এই দুঃখে সকলেই দুঃখিত। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রণালী যেরূপ ইহাতে বিচ্ছেদ অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতাশূন্য। ইনি সকল সম্প্রদায়কেই আপনার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহেন। বর্ত্তমান আন্দোলন দ্বারা একটি স্বতন্ত্রদল গঠিত হইয়াছে, যদিও সেই দলস্থ লোকেরা আপনাদিগকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বহির্ভূত জ্ঞান করেন; কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এরূপ দলবৃদ্ধি অনিবার্য্য। যদি মনে কর যে দলবৃদ্ধি হইবে না, এরূপ আশা করা অন্যায়। যত দিন মনুষ্যের অবস্থা এবং সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে তত দিন ভিন্ন ভিন্ন দল হইবেই হইবে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় পৃথিবীতে চিরকাল এরূপ দল হইয়াছে, এবং মনুষ্যের প্রকৃতি দেখিলেই বুঝা যায় এরূপ দল হইবেই কিন্তু কতকগুলি দলবৃদ্ধি হইলেই যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটি সম্প্রদায় হইবে এরূপ মনে করা ভ্রম। যেমন সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, যেমন জ্যোতি হইতে অন্ধকার নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ সকল সম্প্রদায়ের

সম্মিলনভূমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটি বিশেষ সম্প্রদায় হওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ইংরেজিতে যাহাকে Party বলে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল হইতে পারে, কিন্তু সে সমুদায় দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত। যত দিন সে সকল দলস্থ লোকেরা, ঈশ্বর এক, পরলোক আছে এবং পাপপুণ্যের বিচার হয়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এ সকল মূলসত্যে বিশ্বাস করিবেন, তত দিন তাঁহারা আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। ধর্ম্মের মূল চিরস্থায়ী। আমাদের ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মের মূল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এখন যদি সমুদায় প্রচারক চলিয়া গিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তথাপি তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু, কেন না মনুষ্যের সাধ্য নাই যে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মূল নষ্ট করেন। আমরা কয় জন চলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অক্ষত থাকিবেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে এখানকার প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যদিও আপনাকে এই সমাজের প্রচারক বলিয়া অস্বীকার করেন, তথাপি তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যেমন দুইপক্ষ পরস্পর বিরোধী না হইলে বহুকাল সংগ্রাম চলিতে পারে না, সেইরূপ উভয় পক্ষ পরস্পরের শত্রু না হইলে বিচ্ছেদ হইতে পারে না। যদিও আক্রমণকারী ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করেন, কিন্তু আক্রান্ত যদি ক্ষমাশীল হন সংগ্রাম চলিতে পারে না। ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কাহারও অমঙ্গল করিতে পারেন না। ইঁহার আপনার লোকেরাই যদি ইঁহার প্রতি শত্রুতা করেন, তথাপি ইনি তাঁহাদের প্রতি বৈর নির্য্যাতন করিতে পারেন না। শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই ইঁহার ক্রোড় প্রেমপূর্ণ থাকিবে। এই দেশে যদি শতাধিক দল সৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়ের প্রতি ইঁহার সদ্ভাব থাকিবে, অন্যথা ইনি অপরাধী হইবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কাহাকেও কুনয়নে দেখিবেন না, কাহাকেও কুবাক্য বলিবেন না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মসম্প্রদায় নহেন। সকলকে একত্র করিবার জন্য এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তখন সকলকে একত্র করিবার জন্য যে এই

সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ? অনেক বৎসর পরে নিরপেক্ষ ইতিহাসপাঠকেরা যখন এখনকার ঘটনা সকল আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কদাচ অনৈক্য বা বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। কোন বিরোধের ভূমির উপরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একটি উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তিনি কোন সমাজ সংস্থাপন করেন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহে প্রতিসপ্তাহে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা হইত, সেই গৃহ একটি সাপ্তাহিক উপাসনাস্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রণালী স্বতন্ত্র। ইহা একটি সাপ্তাহিক উপাসনাস্থান নহে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া একটি উপাসনাশীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন করা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। সকলের সঙ্গে ইঁহার বন্ধুতার সম্বন্ধ শত্রুতা নহে। উন্নতিস্রোতেই ইহা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এবং ব্রাহ্মসাধকদিগকে সচ্চরিত্র করিবার জন্য এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজও ইহার অন্তর্গত। অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষদিগের প্রতি সমুহ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখনও করেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন এখান হইতে কাহারও প্রতি কোন প্রকার বৈরনির্য্যাতন না হয়। সকলপ্রকার বিরোধ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রমুক্ত। প্রেমবিস্তারজন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যাহা করেন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহা সংসিদ্ধ করুন।

"আর একটী কথা। ব্রাহ্মসমাজে যাহা কিছু অপ্রেম অনৈক্য দেখা যায় এ সকল সাময়িক উত্তেজনা। যখন বর্ত্তমান অপ্রেমমেঘ কাটিয়া যাইবে, তখন সত্যসূর্য্য আরও উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইবে। অতএব সকলে একটু ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকুন, পরে এই বর্ত্তমান বিরোধ দ্বারা জগতে কত কল্যাণ হইবে সকলে বুঝিতে পারিবেন।"

অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র কি ভাবে কন্যা সম্প্রদান

করিয়াছিলেন এবং বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার কি মত ছিল, আমরা তাঁহার কথায় তাহা পাঠককে অবগত করিতে যত্ন করিব। ১৪ই ফাল্গুন সোমবার কুচবিহার-যাত্রাদিনে তিনি কন্যাকে এইরূপ উপদেশ দেন।

(১) বড় সংসার বলে অহঙ্কারী হবে না, যিনি দিচ্ছেন, তাঁকে পিতা বলে ভাল বাস।

(২) সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য্য করিবে, বড় বড় বিদ্বান্ আপনার মনের মত কাজ করে মরে।

(৩) কোন পৌত্তলিক কার্য্যে যোগ দিবে না। আর দেবতা নাই, সেই এক প্রভুর চরণে দাসী হইয়া থাকিবে। আমি রাণী চাই না, আমি চাই ঈশ্বরের দাসী। অন্য দেবদেবীর কাছে মাথা হেঁট করিও না। সেই এক দেবতার কাছে ভাত কাপড় নেবে, বিপদে সম্পদে তাঁহাকে ডাকিবে। দশ জন তোমাকে দশ রকম অলঙ্কার দিবেন, আমি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি, তোমার হৃদয় যেন ঈশ্বরকে খুব বাপ বলে ভাল বাসে। তিনি তোমাকে ভালবাসিবেন। তিনি তোমাকে ধর্ম্মের পথে, কল্যাণের পথে রাখুন। তুমি আর এক বার ভক্তির সহিত সেই দয়াময় পিতাকে প্রণাম কর।

বিবাহান্তে যখন চারিদিকে আন্দোলন উপস্থিত, তখন কুচবিহারে ২৭ শে ফাল্গুন কেশবচন্দ্র বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার মত এইরূপে উপদেশে ব্যক্ত করেন;— "যখনই ধর্ম্মজগতে একটী অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই অগ্নি একটী প্রচ্ছন্ন অনাবিষ্কৃত সত্যকে প্রকাশ করে। সেই অগ্নি একটী সত্য শিখাইবেই শিখাইবে, ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যের গঠন এই রূপ। ঈশ্বরের রাজ্যে কি যজ্ঞ কি পরীক্ষার অগ্নি কিছুই বিফল হয় না। সমক্ষে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, তন্মধ্যে অপরাধবিহীন আত্মা সীতার ন্যায় বসিয়া থাকে। জল যেমন তাঁহার পক্ষে অগ্নিও তেমনি। পরীক্ষার অগ্নিতে নিরপরাধী দগ্ধ হইবে না। ইহাতে জগতের কল্যাণ হইবে। অধিক অগ্নির প্রয়োজন। যেখানে অনেক শতাব্দীর জ্ঞানালোক দ্বারাও মনুষ্যের চৈতন্য হইল না, সেখানে খুব উজ্জ্বল অগ্নির প্রয়োজন। এই জন্য এই বর্ত্তমান আন্দোলন অগ্নি। ধর্ম্মরাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে বলে এবং পশুরাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে বলে আমরা জানি না এই অগ্নি আমাদিগকে তাহা শিখাইবে। স্বর্গের আদর্শবিবাহ কি এখন তাহা জগৎ বুঝিবে না, লক্ষ বৎসর পরে

যদি জগৎ বুঝে তা হলেও ভাল। পশুজগতে আসুরিক, শারীরিক, সংসারিক বিবাহ হয়, তাহারা আত্মার বিবাহ কি বুঝিতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধীন হইয়াছেন, তাঁহারা পশুবিবাহকে ঘৃণা করেন। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যেখানে দুই জন নরনারী উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন, সেখানে স্বর্গীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। বর্ত্তমান আন্দোলনে এই স্বর্গীয় উদ্বাহশাস্ত্র প্রকাশিত হইবে। অতএব ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই বিবাদ উত্তোলন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যন্ত্রীর অভিপ্রায় যন্ত্র বুঝিল না। আমরা যেন পৃথিবীকে সেইদিকে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই, যেখানে ধ্যান, যোগ, সংসার এবং বিবাহ এক হইবে। সংসারের সমুদয় শুভানুষ্ঠান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া লইতে হইবে। যেখানে প্রকৃত বয়স লাভ করিয়া আত্মা আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, পৃথিবীকে সেই উদ্বাহরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং পাত্র পাত্রীকে উদ্বাহসূত্রে বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে বলেন তোমরা হৃদয়ে হৃদয়ে একত্র হইয়া আমার সদ্‌গুণ কীর্ত্তন কর। যখন নরনারী এই স্বর্গীয় বিবাহে বদ্ধ হইবে, তখন পৃথিবীর প্রকৃত কল্যাণ হইবে। আর শারীরিক, জঘন্য, জড় পশুবিবাহের তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর করুন যেন মনুষ্যজাতি হইতে শীঘ্রই পশুভাব জঘন্য কলঙ্ক একেবারে চলিয়া যায়। সকলে ঈশ্বরের কৃপায় সংসারকে সংশোধিত করিয়া স্বর্গে পরিণত করুন। পৃথিবীতে সকলে হরিনামের মহিমা প্রকাশ করুন।”

বিদেশে আন্দোলনের ফল।

গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া যখন কুচবিহারের রাজার সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ দিলেন, তখন স্বয়ং সম্রাজ্ঞী উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সেক্রেটরী দ্বারা কেশবচন্দ্রকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন, ইহা আর একটা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? আশ্চর্য্যের বিষয় মনে না হইলেও তাঁহার মত ধর্ম্মনিষ্ঠা, নীতিপরায়ণা, সতী নারীর এ কার্য্যে অনুমোদন কিছুতেই সামান্য ব্যাপার নহে। যেস্থলে ধর্ম্ম ও নীতির সহিত বিরোধ সেস্থলে কোন প্রকারে তাঁহার যে কেহ অনুমোদন পাইবেন সাধ্য কি? লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম মিয়র, এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান ইংরাজ ভদ্রগণ কেশবচন্দ্রের এই কার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহা কিছু যেমন তেমন কথা নহে। একটি ভাবী রাজ্যের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি করিয়া ইঁহারা একথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে কেশবচন্দ্র যদি গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে অভিলাষ পূরণ না করিতেন তাহা হইলে তাঁহা কর্তৃক গুরুতর কর্ত্তব্যভঙ্গ হইত। ইংলণ্ডের ডেলিনিউসও এ সম্বন্ধে ঈদৃশ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মবাদিনী মিস কব, ব্রহ্মবাদী ভয়েসি সাহেব বিবাহের পক্ষ সমর্থন করেন। ভয়েসি সাহেব এ বিবাহকে কেবল ধর্ম্মসঙ্গত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন তাহা নহে, ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে অপরিহার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপে দিয়াছেন,—"ইংলণ্ডস্থ থিষ্ট সমাজের আচার্য্য রেভেরেণ্ড চারলস ভয়েসি সাহেব আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে, পত্রপাঠে বিবাহের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। যিনি এরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি ও প্রেমেরই সঞ্চার হয়। পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবহারের প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে দুরভিসন্ধিদোষে অপরাধী করিতে পারে এই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার বিশ্বাস এই, আচার্য্য মহাশয় এই বিবাহসম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন তাহা

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল যে মহৎ এবং ধর্ম্মসঙ্গত তাহা নহে কিন্তু উহা অনিবার্য্য এবং অবশ্যকর্ত্তব্য। ভয়েসী সাহেব ইহাও বলেন যে, এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহার এই আশা যে ক্রমে সকল দিক্ পরিষ্কার হইবে এবং নিন্দা গ্লানি পরিণামে কল্যাণের হেতু হইবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে আচার্য্য মহাশয়ের মনে যথেষ্ট শান্তি ও আত্মশুদ্ধি আছে, তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না।" এই আন্দোলন তাঁহার মতে ঈর্ষামূলক। প্রোফেসর মোক্ষমূলর বিবাহের সপক্ষ ছিলেন। তবে কি ইংলণ্ডে প্রতিবাদকারী কেহ ছিলেন না? কেশব চন্দ্রের বিশেষ বন্ধু মিস কলেট * বিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'ক্রিষ্টান লাইফ' 'ইনকোয়ারার' তাঁহার প্রতিবাদের সঙ্গে অতি তীব্র ভাবে আক্রমণ না হউক সায় দিয়াছেন। আমেরিকায় 'নিউইয়ার্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' 'ক্রিষ্টিয়ান উয়াল´ও' উদারতা প্রকাশ করিলেও মিস্ কলেটের রিপোর্টানুসারে প্রতিবাদের পক্ষ প্রতিপোষণ করিয়াছেন। পর পর যে সকল বিষয় বিবাহের সপক্ষে লিখিত হইয়াছে, মিস্ কলেট সে গুলির খণ্ডন করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার খণ্ডনের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন, কেন না আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি, তাহাই তৎপক্ষে যথেষ্ট। তবে তাঁহার 'ইন্‌কোয়ার' পত্রিকায় লিখিত প্রথম পত্রখানি এখানে আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"প্রধান কর্ম্মকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক যে কার্য্য অসমর্থিত, মণ্ডলীর বহুসংখ্যক লোক কর্ত্তৃক যাহা নিন্দিত, সেই কার্য্য মণ্ডলীর শুভাকাঙ্ক্ষিগণের কেমন করিয়া আশ্বস্ততা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা বোঝা সহজ নহে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের অনেক গুলি ইংরেজ বন্ধু—সাধারণ বিষয়ে যাঁহাদের বিচারশক্তি

---

* ইংলণ্ডে মিস কলেট ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিকল্পে বিশেষ পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার "ব্রাহ্ম ইয়ার বুক" অতি সুপাঠ্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের সপক্ষে কোথায় কে কি করিতেছেন তাহা তিনি নিপুণতা সহকারে সংগ্রহ করিতেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও অন্যান্য ইংরাজী গ্রন্থ তিনি ইংলণ্ডে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতাদির জার্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ জার্ম্মাণ পত্রিকায় সময়ে সময়ে বাহির হইত। এতদ্ব্যতীত অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতাও করিতেন।

অতীব সম্মানযোগ্য—উৎসাহের সহিত তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং উত্তরের প্রয়োজন হইয়াছে। ববকন্যার বয়সের ন্যূনতা বিষয়ে তাঁহারা আক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু একটি স্বাধীন রাজ্যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মবিস্তারজন্য যখন মহান্ সুযোগ উপস্থিত, তখন তদ্বিনিময়ে এ ন্যূনতা স্বীকারযোগ্য বলিয়াই তাঁহারা বিবেচনা করেন এবং কেশবচন্দ্রের এ বিবাহে সম্মতি দেওয়ার অভিপ্রায়ও তাহাই সিদ্ধান্ত করেন। এই শেষ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেও পূর্ব্বাপরসঙ্গতি এক দিক্ হইতে আর এক দিকে লইয়া যাওয়া ভিন্ন ইহাতে আর কি হইতে পারে? বিশুদ্ধ ধর্ম্মবিস্তার মূল বিষয় হইলেও উহা ভারতের উজ্জীবন পক্ষে কোন প্রকার অভাব কাঠিন ব্যাপার নহে। কোন্ যাদুমন্ত্রে ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে প্রবর্ত্তিত হইবেন সেইটি বাহির করাই প্রকৃত সমস্যা। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিশীল পক্ষের এইটি একটি মহৎ লক্ষণ যে তাঁহারা দৃঢ়তা সহকারে এই বিশ্বস্ততা লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছেন এবং ইহার অনেক গুলি সভ্যকে এইটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শিক্ষাদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মবিবাহের আন্দোলনের ইতিহাস বীরত্বের ক্রিয়ায় পূর্ণ, এবং ১৮৭২ সালের বিধান প্রবর্ত্তন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিবাহের আদর্শ দৃষ্টস্পষ্ট উচ্চ করিয়া দিয়াছে। ঐবিধানে যে সকল সংস্কারের বিষয় আছে, ১৮৭৬ সালের 'থিষ্টিক এনুয়াল', ভালই বলিয়াছেন;—'সে সকল যদি প্রতিব্যক্তি কার্য্যে পরিণত করিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে যে প্রকার ব্যবস্থা আছে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে অনেক দিন যাইবে। ব্রাহ্মসমাজ নূতন সমাজের পত্তনকালে সে গুলিকে মূলতত্ত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি এই নূতন গঠনে যথাযথ সম্বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার এই গুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে।' এই স্থলে আমরা একটি অতি প্রধান ফলদ মূলতত্ত্বের সংঘর্ষণে উপস্থিত—ইটি সভ্যতার একটি জীবন্ত বীজ, উহার সঙ্গে নানাবিধ সংস্কার-কার্য্য সংযুক্ত, সে গুলির দৃঢ়মূলত্ব সহজ করিবার পক্ষে উহা নিরতিশয় সহায়। কেশবচন্দ্র তাঁহার কন্যার বিবাহে ১৮৭২ সালের বিধান তুচ্ছ করাতে (উপরে যে প্রথম প্রতিবাদ প্রদত্ত হইল উহা দেখায় কেমন অনেক গুলি বিষয়ে নিঃসন্দেহ তিনি উহা তুচ্ছ করিয়াছেন) ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রকৃত পক্ষে তুচ্ছ

করিয়াছেন, এবং এই নবীন মণ্ডলী আজ পর্য্যন্ত যে সকল অমঙ্গল হইতে রক্ষিত হইয়াছে, সেই সকলকে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার শ্রেষ্ঠতর মূলতত্ত্বে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মবিস্তারের জন্য ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া লওয়া নিতান্ত আত্মঘাত। কেশবচন্দ্রের অভিপ্রায় কি, এসম্বন্ধে আমরা ইংরেজ—আমাদের পক্ষে তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি না। যখন সকল বিষয় বেশ জানা যাইবে তখন এই বিষয়টিসম্বন্ধে উদার ভাবে বিচার করা যাইবে। কিন্তু প্রকৃত বিচার্য্য বিষয়টি আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ভারতে যে সংস্কারকার্য্য চলিতেছে তাহার নেতৃত্ব কার্য্যে কেশবচন্দ্রকে আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না? হিন্দুধর্ম্মের মরুভূমি হইতে নবীন সংগ্রামরত মণ্ডলীর বাহির হইয়া আসিবার পক্ষে তিনি পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু দুঃখের সহিত আমাদিগকে 'না' বলিতে হইতেছে। কারণ একথা চিরদিনই সত্য যে 'যে ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়া পিছন দিকে তাকায় সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযুক্ত নয়।'

"কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজ পশ্চাৎদিকে তাকাইতেছে না, কিন্তু বিশ্বস্তভাবে এই বিপদের সম্মুখীন হইতেছে। বরং ইহার মূলতত্ত্বগুলির প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়া অপেক্ষা উহার প্রিয় নেতার সহিত সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত। সমুদায় আন্দোলনের মধ্যে এই বিষয়টি আমার নিকট অতি গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। নিঃসংশয় এই আন্দোলন দেখাইতেছে যে ব্রাহ্মসমাজ একজন মানুষের অনুসরণ করে এই যে অনেকে মনে করেন তাহা নহে, কিন্তু ভূতকালে উঁহার নিকটে যত অধিক ঋণ হউক না কেন (এঋণ অত্যধিকই বটে) উহা এখন স্বাধীন পদবী লাভ করিয়াছে, ভারতবাসিগণের বিবেকের উপরে আধিপত্য পাইয়াছে এবং কতকপরিমাণে ভারতীয় জীবন গঠন করিতেছে। যে কোন মতের হউন না কেন, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের যাঁহারা বন্ধু তাঁহাদের নীতিসম্মত সাহায্য ঈদৃশ মণ্ডলী পাইবার যোগ্য। এই সংগ্রামে প্রকৃত ব্রাহ্মগণকে আমাদের সমগ্র সহানুভূতি দিতে হইতেছে, কারণ মনুষ্যহৃদয়ে যে সকল গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে অতি গুরুতর পরীক্ষায় পড়িয়া তাঁহারা মহত্তর সংগ্রামে প্রবৃত্ত। ঈশ্বরের সমগ্র সত্য তাঁহাদের আলোক

ও বল হউক এবং দেশের উজ্জীবন এবং মণ্ডলীর রক্ষণ জন্য বিশ্বস্ত যত্নসমূহ কৃতকার্য্যে ভূষিত হউক।

এস্ ডি কালেট।"

'ক্রিষ্টান লাইফ' লেখেন—"আমরা জানি যে, সামাজিক মর্য্যাদা এবং সম্পদ্‌লাভ অনেক সময়ে মনুষ্যের চক্ষু কুজ্ঝটিকায় আবৃত করে, সুতরাং বিবেকসিদ্ধ ক্রিয়া ক্ষণকালের জন্য যথাযথ পরিমাণে প্রতিভাত হওয়া নিবৃত্ত হয়। মনুষ্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ যাহাতে সাংসারিক লাভ হইবে মনে হয়, তাহাকেই নীতিসঙ্গত বলিয়া সহজে মনকে প্রবোধ দেয়। কিন্তু ঐ সকল লোক সাংসারিক বুদ্ধির অধীন, ইহাদিগকে কখন বিধাতা ধর্ম্মের নেতা হইবার জন্য আহ্বান করেন না; এবং পৃথিবীও অল্পদিনের মধ্যে ইহাদিগের উপযুক্ত মূল্যানুসারে ইহাদিগকে গণ্য করে। কেশবচন্দ্র এক জন ধর্ম্মের শিক্ষক এবং সহস্র সহস্র লোক আদর্শ ও উপদেষ্টা বলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। যে কথা তিনি প্রচার করেন, সে কথা স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রমাণিত করা সমুচিত। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে এক জন রাজার (পাণিগ্রহণার্থ) পাণিপ্রাপ্তি অতীব চিত্তমুগ্ধকর, কিন্তু এস্থলে যে মূল্য বিনিময়ে দিতে হইবে তাহা যে অতীব ভীষণ কেশবচন্দ্রের কলিকাতাস্থ সহযোগিগণ তাহা দেখাইয়াছেন। যে সকল বুদ্ধিমান্ উন্নতমনা লোক প্রথম হইতে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্ভ্রম, ভালবাসা এবং অনুরাগ, হয়তো চিরদিনের জন্য, তাঁহাকে বলি অর্পণ করিতে হইল।"

ব্রহ্মবাদিনী মিস্ ফ্রানিন্সস কব "ক্রিষ্টান লাইফের' এই লেখার প্রতিবাদ করেন। উঁহার যে অনুবাদ ধর্ম্মতত্ত্বে তৎকালে প্রকাশিত হয়, আমরা তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম;—

"মহাশয়,—'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটী সুমহান্ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা', প্রস্তাবে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তদ্বিরুদ্ধে আমাকে আমার সুদৃঢ় বিমত প্রকাশ করিতে দিন। আপনি (ক্ষমা করিবেন যদি আমার আপনার লেখার ভাব বুঝিতে ভ্রম হইয়া থাকে) অনুমান করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার কন্যার জন্য এক জন রাজপুত্র বর পাইয়া বিমোহিত হইয়াছেন এবং তাদৃশ নীচ প্রলোভনের জন্য তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বিসর্জ্জন দিয়াছেন;

যন্ত্রতঃ কথা তিনি ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়ের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য বুদ্ধি হারাইয়াছেন।

"ব্রীটিষগবর্ণমেণ্টের মাননীয় প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের গ্রাহ্য করা ভাল হইয়াছে কি না এ বিষয়ে আমাদের সহজে মতভেদ হইতে পারে। আপনি এবং আমার অনেকগুলি অতি মাননীয় বন্ধু মনে করেন যে তাদৃশ প্রস্তাব গ্রাহ্য না করা ভাল ছিল, কিন্তু আমার মত এই যে, যে উপায় তাঁহার দেশের পক্ষে উচ্চতর আশা প্রদর্শন করিতেছে তদ্বিরুদ্ধে দ্বাররুদ্ধ করিলে তাঁহার পক্ষে অতি শোচনীয় গুরুতর দায়িত্ব ঘটিত। তিনি বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন কি অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন এ সম্বন্ধে আমরা যাই কেন মনে করি না, কেশবচন্দ্র সেনকে আমরা যেরূপ জানি তাহাতে তাঁহার ন্যায় লোক ঈদৃশ গুরুতর কার্য্যে উচিত এই নিতান্ত সরল বিশ্বাস ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ প্রকার অনুমান আমি অতি প্রদীপ্ত মনে প্রতিবাদ করি। ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমার যে অল্প কালের আলাপ হয়, তাহাতে আমার মনে তাঁহার কল্যাণগুন, তাঁহার সাধুতা, বরং আমায় বলিতে হইতেছে তাঁহার ঋষিত্ব আমার মনে এমনি মুদ্রিত হইয়াছে যে কোন জীবিত মনুষ্য আমার মনে সেরূপ মুদ্রিত করিতে পারে নাই, এবং সে বিমুদ্রণ কোন দিন বিলুপ্ত হইবার নহে। এক দিন আধ্যাত্মিক বিষয় কথোপকথন হইয়া যখন তিনি বিদায় লইয়া গেলেন, আমার স্মরণ আছে আমি আমায় বলিলাম 'এখন বোধ হয় আমি কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি খ্রীষ্টের সঙ্গে আলাপ করিয়া স্ত্রীপুরুষগণের মনের ভাব কি প্রকার হইত।' আমি তখনও তাঁহার সকল মতের অনুবর্ত্তন করিতে পারি নাই এবং পরেও যে কোন কোন শিক্ষা দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে, বিশেষ বৈরাগ্যযোগে আধ্যাত্মিকতা লাভের জন্য সমধিক প্রয়াসের উপযোগিত্বসম্বন্ধে আমার সংশয় করিবার কারণ আছে। কিন্তু এমন ব্যক্তি নীচ অভিলাষ কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়াছেন এরূপ ভাব আমি কোন কালে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না। আমি ঠিক এই কথাই তাঁহার মহৎ অনুরক্ত স্বগণ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যিনি বর্ত্তমান কার্য্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন বুঝা গিয়াছে তাঁহার সম্বন্ধেও বলিতে পারি। এমন হইতে পারে যে ইঁহার মন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন অপেক্ষাও সমাবদ্ধ।

"মহাশয় এক জন ধর্ম্মবন্ধুর উপরে বিশ্বাস কাহাকে বলে আমি বুঝিতে পারি না, যদি যাই তিনি এমন একটী কোন কার্য্য করিলেন যাহার আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না, অমনি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে ঘোর সংসারী হইলে তৎপ্রতি যে প্রকার স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ের দোষারোপ হইত তিনি তাদৃশ নীচ স্বার্থ সাধনাভিপ্রায় দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছেন। আমার পক্ষে আমি বলিতে পারি, আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় যে যদি কেশবচন্দ্র সেন এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিবেচনায় ভুল হইয়া থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এবং এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে যে তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা ঠিক কর্ত্তব্য জ্ঞানানুমোদিত এবং আমি এ বিষয়ে আরো নিঃসংশয় যে এই ঘটনাতে ক্ষুদ্র মনের নিকট যে পারিবারিক সম্বন্ধি লাভ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা তাঁহাদিগের নিকট অতি ক্লেশকর বলিয়া অনুভব হইয়াছে। এ ক্লেশ কেবল তাঁহারা আপনাদের বিশুদ্ধাভিপ্রায়ের দ্বারা পরাজিত করিয়াছেন।

ফ্রান্সিস পাওয়ার কব।"

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে মিরারে নিবদ্ধ সেই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির আমরা উল্লেখ করিতেছি, যে প্রবন্ধের ভাব পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদকারিগণ এই বলিয়া উপহাস করিয়াছেন যে, মিরার এক দিকে আশঙ্কা করিয়াছেন যে, প্রতিবাদকারিগণ ধ্যান, উপাসনা, বৈরাগ্য ও ভক্তি শূন্য এবং বিশেষ বিধান, প্রত্যাদেশ ও মহাপুরুষঘটিত মতে অবিশ্বাসী হইবেন, আর এক দিকে প্রতিবাদকে বিধাতৃনিয়োজিত, সত্য ও পবিত্রতাবর্দ্ধনে সহায়ক, ব্রাহ্ম সমাজের শাস্ত্রের একাংশ স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই প্রকারের মত কি পরস্পর বিরোধী নয়? তাঁহাদের বোঝা উচিত ছিল যে, যে ভাবে প্ররোচিত হইয়া প্রতিবাদ ঘটিয়াছিল, কালে সেই ভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে ধ্যানাদিতে অনাস্থা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মূল প্রতিবাদ যে বিষয় লইয়া সে বিষয়—বর্ত্তমান ব্যাপারে নিয়োগযোগ্য না হইলেও—যে যে স্থলে উহার যথাযথ নিয়োগ হইতে পারে তত্তৎস্থলে পূর্ব্ব হইতে লোকের মন জাগ্রৎ ও প্রস্তুত রাখাতে বিশেষ কল্যাণকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি ও অমঙ্গল হইতে বিধাতা এইরূপে সত্য ও মঙ্গল উৎপাদন করিয়া থাকেন। প্রতিবাদসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণের কি প্রকার ভাব

ছিল তাহা প্রদর্শন জন্য আমরা ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি এ স্থলে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের গৌরবান্বিত মণ্ডলীর আমরা সভ্য এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। কত উচ্চ আমাদের অধিকার, কত প্রশস্ত আমাদের সহানুভূতি, কত পবিত্র আমাদের কার্য্য, কত উজ্জ্বল ও সুমিষ্ট আমাদেব বিধান যে বিধানাধীনে আমরা বসতি করিতেছি! আমাদের মণ্ডলী সর্ব্বান্তর্ভাবী। প্রতিবাদকারী বিধিত্যাগকারী সকলকেই ইহা আমাদের অন্তর্ভূত করিয়া লয়। আমাদের আপনার গৃহের লোকেরাই আমাদের শত্রু। যাহারা আমাদের নিন্দা করে তাহারা আমাদেরই শিবিরস্থ। বিরোধী দণ্ড চুম্বন করাই আমাদের ধর্ম্মমত। ক্ষমা করিয়া যাওয়া অন্তর্ভূত করিয়া লওয়াই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা আমাদের চরিত্রের দোষক্ষালন অভিপ্রায় করি না। আমরা কি আমাদের মণ্ডলীর অতীব অনুপযুক্ত নই? কিন্তু আকাশের ন্যায় উচ্চ আমাদের ধর্ম্মের আমরা অবশ্য প্রশংসা করিব, এবং ইহার মহত্ত্ব প্রদর্শন করিব। কত উচ্চ কত স্বর্গীয় সেই ধর্ম্ম যে ধর্ম্ম আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে শেখায় যে, যাহারা আমাদের বিরোধী তাহারাও আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান, যাহারা আমাদিগের প্রতি অত্যাচারনিরত তাহাদিগকেও নিয়ত বন্ধুভাবে দেখিতে হইবে, এবং অতি তীব্র প্রতিরোধ এবং অতি উত্তেজক সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদও সেই পরিত্রাণপ্রদ বিধানের অন্তর্গত, যে বিধানের সহিত আমরা সংযুক্ত। লোকে না জানিয়া শুনিয়া আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করে যে, বিশেষ বিধাতৃত্ব এবং বিশেষ দেবনিঃশ্বসিত আর সকলকে বাদ দিয়া কেবল আমাদেরই ব্যবহারের জন্য, এইরূপ আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি। আর সকলকে বাদ দিয়া কি আমরা সম্ভ্রম চাই? ঈশ্বর করুন এরূপ না হয়! আমরা রক্ষণশীল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি; তথাপি আমরা নিতান্ত করুণার পাত্র যদি আমরা সেই সমাজের ভক্তিভাজন আচার্য্যকে জীবিত ব্রাহ্মগণের মধ্যে এক জন সমধিক দেবনিঃশ্বসিতবান্ এবং ভারতের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র এই ভাবে না দেখি! প্রতিবাদকারিগণ আমাদের এবং আমাদের পবিত্র পক্ষের উপরে লজ্জা ও কর্দ্দম নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগের হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তথাপি সমুদায় প্রতিবাদের আন্দো-

লনকে বিধাতৃনিয়োজিত, এবং উহাতে যে নির্ব্বহিতা নিয়োজিত হইয়াছে; স্বর্গের নিয়োগে উহা ব্রাহ্ম সমাজকে বিশুদ্ধ ও দৃঢ় এবং সমুদায় দেশকে উপকৃত করিবে, এই ভাবে আমরা উহা অবলোকন করি। প্রত্যেক মানুষ যিনি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, প্রত্যেক পত্রিকা প্রত্যেক কথা যাহা আমাদের বিরুদ্ধে লিখিত ও কথিত হইতেছে, যত দূর উহা সত্য ও পবিত্রতার পক্ষ সমর্থন করিতেছে, তত দূর উহা আমাদের ঈশ্বরের ও আমাদের মণ্ডলীর। প্রতিবাদের আন্দোলন উহার সর্ব্ববিষয় সহ আমাদের অপৌরুষেব গ্রন্থের নিশ্চয়ই নূতন পবিশিষ্ট অধ্যায়। আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক এবং দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি, প্রভু পরমেশ্বর আমাদের নিকটে আমাদের মধ্য দিয়া এবং আমাদের বিরোধে যাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়াছেন তাঁহাদের ভিতর দিয়া কথা কহেন। আমাদের শিবিরে এবং তাঁহাদের শিবিরে আমরা তাঁহাকে কার্য্য করিতে দেখি।"

আত্মপ্রকাশ।

কেশবচন্দ্র আপনি কে তাহা জানিতেন। তিনি এই তীব্র আন্দোলনে ভীত হইবেন ইহা কি কখন সম্ভব? সিংহের বল দুর্জ্জয় বল যাঁহাতে বিরাজমান, তিনি মশকের ধ্বনিতে আপনার বিচিত্র নিয়তি ভুলিয়া গিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবেন কেন? তাঁহাতে পুরুষের পুরুষকার, তেজ, বল, ও উৎসাহ যেমন ছিল; তেমনি নারীপ্রকৃতিসিদ্ধ কোমল ভক্তি ও প্রেমে হৃদয়ের আর্দ্রতাও ছিল। যাঁহাদের জন্য তিনি জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিতরে একটু অসদ্ভাব দর্শন করিলে যাঁহার সমুদায় রজনী নিদ্রা হইত না, তাঁহার দুর্জ্জয় প্রেমের নিকটে সকলেরই পরাজয়স্বীকার অবশ্যম্ভাবী। কেশবচন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক বেদী হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন, আবার যখন উপাসকমণ্ডলীর অনুরোধে পুনরায় বেদী গ্রহণ করেন, তখন আপনার জীবনসম্বন্ধে (২৩। ৩০ বৈশাখ ১৮০০ শক) যে কথাগুলি * বলিয়াছিলেন, সে গুলি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহার এই কথাগুলি মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার দেখান হয় নাই, এ জন্য যদিও তিনি তৎকালে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি এ কথা গুলি যখন তাঁহারই কথা, তখন তৎপ্রতি সমুচিত সম্মানদানে আমরা কেন কুণ্ঠিত হইব? সে সময়ে এ গুলি অযথাভাবে লোকে গ্রহণ করিবে এ আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ ছিল, এখনও সেরূপ আশঙ্কার কারণ কোন কোন স্থানে থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা সত্য তাহা চির দিন সত্য, তৎপ্রকাশে পশ্চাৎপদ হইবার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না।

"ব্রহ্ম মন্দিরের উপাসকগণ, যখন তোমরা গত রবিবার প্রণয়ের সহিত প্রেমের সহিত অনুরোধ করিলে, এই পবিত্র বেদীর আসন পুনরায় গ্রহণ

---

* ইহার প্রথমাংশ পরসময়ে বেদী হইতে যে জীবনবেদ ব্যাখ্যাত হয় তদনুরূপ।

করিতে হইবে, তখন আমি বলিয়াছিলাম, আগামী রবিবার কয়েকটা কথা বলিবার ইচ্ছা করি, সেই কথা আজ শুনিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে জীবনের দু পাঁচটী কথা বলিতে পারি। জীবনে সময়ে সময়ে যাহা অনুভব করিয়াছি, গূঢ় ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি। আজ একটী বিশেষ কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যখন অল্প বয়সে ঈশ্বর ডাকিলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাঁহার সে কথা শুনিলাম। সেই সময় হইতে তাঁহার সঙ্গে আমার জীবন্ত সম্বন্ধ রক্ষা করা প্রয়োজন হইল। যখন সাকার দেবতা পরিত্যাগ করা হইল, তখন ইচ্ছা হইল যে পাপে তাপে অধীর হইয়া সংসার অরণ্য মধ্যে যাঁহাকে ডাকিব, তিনি কোথায়, তিনি কেমন ভাল বাসেন, সজীবভাবে অবধারণ করিতে হইবে। আমার জীবন্ত পরমেশ্বর চাই। আমি এমন এক জনকে ধরিব, যাঁহাকে ধরিলে আমার জীর্ণ তরি ডুবিবে না। আমার দীক্ষাগুরু প্রার্থনা, মানুষ নয়। তোমরা এ কথা বিশ্বাস কর, অনুরোধ করিতেছি। আমার দীক্ষাগুরু প্রার্থনা, এই প্রার্থনাকে অবলম্বন না করিলে আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে চিনিতে পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের পূজা সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করিলাম। সময় সময় ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুষ্ঠান শোধন করিতে হইবে, এই বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতাম, জিজ্ঞাসা করিতাম, জিজ্ঞাসা করিয়া শান্ত হইতাম। ইহাতে কি শিখিলাম? কখন ঘরে, কখন ছাতের উপরে বসিয়া সরল ভাবে মানুষকে মানুষে যেমন জিজ্ঞাসা করে, ঠিক সেই রূপ ঈশ্বরের কাছে বসিয়া জীবনের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম। অনেক সময় মানুষের প্রার্থনা কল্পনার ব্যাপার হয়, এজন্য আশানুরূপ প্রার্থনার ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রার্থনায় কল্পনা থাকিলে ঘোর বিপদ, সুতরাং প্রার্থনাবিষয়ে সাবধান হইতে হইবে; এই বিশ্বাসে পদে পদে গুরুকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন হইল। ঠিক প্রার্থনা হইতেছে কি না, সংসারের যে সকল বন্দোবস্ত করা যাইতেছে, তাহা ঠিক ধর্ম্মের অনুমোদিত, হইল কি না? যে সকল সাধনের উপায় গ্রহণ করা যাইতেছে, সে গুলি প্রকৃত কি না জানি না। উপধর্ম্মবাদিগণ গুরু ও ধর্ম্মপুস্তক হইতে জীবনের নীতি শিখিয়া থাকে, মানুষের উপদেশ শুনে। যে দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম

সে দিন হইতে সে পথ বন্ধ হইল। সুতরাং প্রতিবার ঈশ্বরের কাছে যাইতে হইল। সংসারের সুশৃঙ্খল করিতে হইবে, গুরুজনের নিকট লোকে শিক্ষা করে; কোন বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রয়োজন হইলে বন্ধুর নিকট সৎপরামর্শ গ্রহণ করে; কোন্ পুস্তক পড়িতে হইবে তাহা জ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাসা করে। ইহাতে সুশৃঙ্খলা না হইয়া অনেক সময় বিশৃঙ্খলা হয়, সৎপরামর্শে অসৎ ফল উৎপন্ন হয়, পুস্তক পড়িতে গিয়া লোকে নাস্তিকতার বিষ পান করে। এসকল ঠিক হইতেছে কি মন্দ হইতেছে কে বলিবে? এই সকল ভাবিয়া ব্রহ্মের পাদপদ্ম ধরিলাম, তাঁহাকে প্রাণের ঠাকুর করিয়া হৃদয় মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলাম। পথে চলিতে আবশ্যক হইলে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতাম। তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লইলাম। বারবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। মানুষকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলে সে বিরক্ত হয়। এত বড় মহান্ ঈশ্বরকে বার বার কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব এ ভাবিয়া সঙ্কুচিত হই নাই। কেন না এমন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, যাহাতে বার বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে সকলি বৃথা হইয়া যায়। যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া না লওয়া যায়, তবে এক জন ক্রমাগত পাঁচবৎসর বিপরীত পথে চলিতে পারে, কল্পনায় কাজ করিয়া পরিশেষে মহাবিপদে পড়িতে পারে। সুতরাং আমার পক্ষে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রয়োজন হইল। এই সময়ে পথে, ছাদের উপরে, ঘরে, বিপদের সময়, সম্পদের সময়, সংসারের কার্য্য করিবার সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাছে যাইতাম, এবং তাঁহার কথা শুনিতে চেষ্টা করিতাম। তাঁহার উত্তর শুনিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। উত্তর না পাইয়া ডাকিলে কেহ কি কখন সুখী হয়? কাহাও যদি ডাকিয়া উত্তর পায় তবে কি সে সুখী হয় না? ফলতঃ জবাব চাই, জিনিষ চাই। যত ক্ষণ না তাঁহার উত্তর পাইতাম বসিয়া থাকিতাম। প্রথমে ব্রহ্মের স্পষ্ট উত্তর পাইলাম না বটে, কিন্তু বুঝিলাম ব্রহ্ম হাসিলেন। ক্রমে অল্প অল্প তাঁহার উত্তর শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এক এক সময়ে এমন হইয়াছে কোন স্থানে যাইতে হইলে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অমুক স্থানে যাও বলিলে তবে গিয়াছি। অমুক লোকের বাড়ীতে যাও বলিলেন, সেখানে গিয়া অমূল্য সত্য লাভ করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছি।

ক্রমে জীবনের ইতিবৃত্তে দেখা গেল ছোট ছোট বিষয়েও ঈশ্বরকে ডাকা চাল। এ জীবনের ভিতরে আনন্দের নূতন নূতন পথ দেখিতে পাইলাম। অনন্তর একটি ভারি ভার আমার উপরে পড়িবে বুঝিলাম। সময়ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের উপদেষ্টার পদ, আচার্য্যের পদ পাইলাম। ব্রাহ্মদিগের কাছে এই পদ পাইলাম, এটি উপলক্ষের কথা, লোক ভুলাইবার কথা, মিথ্যামিশ্রিত কথা। কোন মানুষ আপনাকে উপদেষ্টা বলিতে পাবে না। নিয়োগ পত্র দেখিয়াছি, তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই। দেখিলাম তাহাতে তাঁহারই স্বাক্ষর, যিনি ছাদের উপরে, ঘরে, আমার কথা শুনিয়া উত্তর দিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা শুনিয়া কার্য্য করা একটি লোভের ব্যাপার। মনে করিও না ইহার জন্য ২।৫ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিতে হয়। অত্যন্ত দরকার হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, অমুক অমুক বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে এই এই উত্তর দেওয়া যায় কি, দেওয়া যায় না? অমুক পুস্তক পড়িব, কি পড়িব না? অমুক কর্ম্ম করিব কি করিব না? প্রথমতঃ হাঁ কি না এইটি শুনিবার বিষয়। ক্রমে জীবনে শ্রবণের ব্যাপার আরও প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। অনেকে এইরূপে সাধন আরম্ভ করিলে ক্রমে আদেশ শুনিতে পায়। সে যাহা হউক যখন এই ভার পাইলাম, এই স্থানে বসিলাম, জানিলাম আর উঠিতে হইবে না। ঈশ্বর যখন বসাইলেন, তখন মনুষ্য আর উঠাইতে পারে না। ক্রমে ঈশ্বর সেই সকল গুণ দিতে লাগিলেন যাহাতে এ কার্য্যের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। আমাতে উপযুক্ততা নাই এই বলিয়া কি ঈশ্বরের কথা শুনিব না? যদি তিনি আমায় আচার্য্যের কার্য্য দিলেন, তখন আমার সংস্কার যে প্রকার হউক না কেন, আমি কেন সঙ্কুচিত হইব? পথে, ঘরে, ছাদে যাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছি, তিনিই যখন আমায় এ ভার দিলেন, তখন আমার নিকটে উহা ঘরের কথা বলিয়া মনে হইল। যিনি আমায় প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন দেন, তিনিই আমায় বেদীতে বসিতে বলিলেন, সুতরাং আমি ইহাকে ঘরের কথা মনে না করিয়া আর কি মনে করিব? উপাসনার সময়ে তাঁহার সঙ্গে যেরূপ বার বার কথা বলিয়াছি, সেই কথা সকলকে বলিব, সুতরাং ঘরের কথা বলিতে আর সঙ্কোচ কি? আমি সাধারণও বুঝি না, গোপনও বুঝি না, যাহা বলিবার তাহা বলিব। আজ এই কথা বলিলাম, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ যদি চূর্ণ হয়, চাহি

দিকে গ্লানি নিন্দা হয় হউক, * আমি সুখ্যাতি অখ্যাতির মুখাপেক্ষা করিতে পারি না; আর সত্যকে গোপন করিলে চলে না।

"আমি যদি ব্রহ্মের ভৃত্য হই, তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হই, তাঁহার অন্ন পান দ্বারা যদি আমার শরীর রক্ষিত হয়, তবে তাঁহার অভিপ্রায় সম্পাদন করিতেই হইবে। তিনিই আমাকে ব্রাহ্ম করিলেন, তিনিই আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম জানাইলেন। অমুক স্থানে যা, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কর, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কর, তিনিই আজ্ঞা করিলেন। সে কালে আমি তোমার কথা শুনিব না, এ বলিয়া তাঁহার সে আদেশ লঙ্ঘন করি নাই, এ আদেশটিও লঙ্ঘন করিতে পারি না। যদি একটী আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম আর একটী ছাড়িব কি প্রকারে? যিনি ধন ধান্য দিলেন, শরীরকে পরিপুষ্ট করিলেন, বয়স বৃদ্ধি হইল, তিনি সেবা করিতে বলিলেন, কেন সেবা করিব না? এই জন্য খাওয়াইয়া পরাইয়া তিনি কি মানুষ করিলেন? মানুষের কথা শুনিয়া কি তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিব? আমার মানুষের কথায় প্রয়োজন নাই। মানুষের কথা শুনিলে মরিতে হইবে। আমি কোন দিকে তাকাইব না। যখন তিনি আমায় আদেশ করিলেন, তখন এই বুঝিলাম, এ আমার মরণ বাঁচনের কথা। যদি এই কাজ গ্রহণ করি বাঁচিব, যদি না করি মৃত্যু হইবে। আমি মরিব না বাঁচিব এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। মরিব না, বাঁচিব, এই স্থির করিয়া বলিলাম, যে আজ্ঞা প্রভু, আমি তোমার আদেশ পালন করিব। বাঁচিবার জন্য জীবিকার জন্য আমার এ কর্ম্ম করিতে

---

* অনুসন্ধানে আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে প্রতিবাদকারিগণ এই উপদেশের কিয়দংশের সার (ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে) আপনাদের মনোমত করিয়া পত্রিকায় করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত অংশের পূর্ব্বে তাঁহারা এইরূপ বলিয়াছিলেন, "কেশব বাবুর আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া যেরূপ বিশ্বাস এবং অন্যের মনে সেই বিশ্বাস দৃঢ়াঙ্কিত করিবার জন্য যেরূপ প্রয়াস, তাহা তাঁহার একটী দুরারোগ্য রোগস্বরূপ ও ব্রাহ্মসমাজের ঘোরতর কলঙ্কের কারণ হইয়াছে।" উদ্ধৃতাংশের অবশেষে সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "কুচবিহার বিবাহানুষ্ঠানের পর এইরূপ নির্ভীকভাবে মহাপুরুষ ও আদেশবাদের প্রচার দেখিয়া ব্রাহ্মগণ কি কেবল আশ্চর্য্য প্রকাশ করিবেন। ব্রাহ্মসমাজের দুরবস্থা অমঙ্গল আশঙ্কা এখনও দূর হয় নাই দেখিয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হউন।" একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে উদ্ধৃতাংশের ভাষার সহিত যাহা কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন তাহার সম্পূর্ণ পার্থক্য ও অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত।

হইবে। নিয়োগপত্রে যে ভার আছে তাহা উপহাসের বিষয় নয়; আমার প্রতারণা করিবার বিষয় নয়। অত বড় প্রকাণ্ড ভার কি প্রকারে সম্পাদন করা হইবে? ঘটী হইতে জল ঢালিয়া তৃষ্ণা দূর করা যেমন সহজ ইহাও তেমনি সহজ। এত বড় ভার একটি ছোট ভাণ্ড হস্তে ধারণ করার মত। অহঙ্কার হইল, বুঝি ভারি ভার বহন করা হইল। অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নহে। যখন ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করা গেল, পৃথিবীকে বুকে লওয়া গেল। ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করিলে ইহকাল পরকাল, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে আসিল, ভার না কি? কাজ অত্যন্ত ভারি হইল, এ কথা শুনিয়া দয়াময় হাসিলেন এবং বলিলেন 'আমি ভারের কাজ করিব।' যদি তিনি না করেন, মৃত্যু। মনে হয় এটি একটি প্রকাণ্ড ভার। এত বড় একটি সমাজসংস্কারের কার্য্যে অনেক জ্ঞান চাই, বিদ্যা চাই, ধর্ম্ম চাই, এ সকল কথা কিছুই নয়। আমি পুনরায় বলিতেছি, জল খাওয়া যেমন সহজ, বেদীতে বসা তেমনি সহজ।

"ফলতঃ প্রচার করিব না হয় মরিব এই মূল কথা। এই প্রচার যত্নসাধ্য নহে, সহজসাধ্য। যদি কেহ বলে তুমিতো ইহার উপযুক্ত নও। তোমার তেমন সাধন ভজন কোথায়? বিশ্বাস ভক্তি কোথায়? দেখিতেছি তোমার কুসংস্কার অনেক। উপর হইতে অমনি ইঙ্গিত হইল, এ কথা ফাঁকি দিবার কথা, ক্রুটি বদ্ধ করিবার কথা, এ কথায় কর্ণপাত করিও না; এই কথা বলিয়া কেবল ভীত করিতে চায়, বিদায় করিয়া দিতে চায়। মানুষের কথায় আমি উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত বুঝিতে চাই না। যদি অনুপযুক্ত হই, তবে আমার কি; নিয়োগকর্ত্তার দোষ। বেদী হইতে আমি যাহা বলিব তাহাতে পৃথিবীর লোক সুখ্যাতি কি অখ্যাতি করিবে আমি তাহা চাই না। আমি উপাসনার বীজ রোপণ করিব, কে জানে তাহার ফলাফল। পাপীর যাহাতে পরিত্রাণ হয় আমি সেই উপাসনা বিতরণ করিতে চাই। এসকল কথার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর আছে। ইহার উত্তর ভবিষ্যতে লোকে বুঝিবে।

"যোগ্যতার কথা যখন হইল, তখন বলিতে পারি একটী যোগ্যতা আছে, এবং সেই যোগ্যতাতেই মনের আনন্দ। কি বিষয়ে? না আমি ভালবাসি। যে ভালবাসে সেই চাকর হয়। ভৃত্য হইলেই ভাল বাসিতে হয়। লোকে ভৃত্যকে ভাল বাসে, ভৃত্যও প্রভুকে ভাল বাসিয়া থাকে। সময়ে সময়ে ভাবি আর

মনকে বলি, মন তুমি ঠিক করিয়া বল দেখি তুমি কি ভাল বাসিয়া মরিতে পার? ভাল বাসিয়া মরিতে পারি এ জ্ঞানটুকু কিন্তু বিলক্ষণ উজ্জ্বল আছে। শত্রু আক্রমণ করিলে, কোটী কোটী লোক আক্রমণ করিলে, খড়্গাঘাতে মৃত্যু উপস্থিত হইলেও প্রগাঢ় প্রাণের ভালবাসা যায় না। প্রগাঢ় ভালবাসার মধুরতা কি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ একটী ভিতরের কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, আমি তাঁহার অপেক্ষা অন্য লোককে ভালবাসি। আমার পূর্ব্ব বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথার মিল হইল। আমি ভালবাসার সময়ে আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই, আমার আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়। পরকে ভাল বাসিতে গিয়া আমার হৃদয় সর্ব্বদা ভালবাসার দ্বারা উৎপীড়িত। আমার এ ভালবাসাকে গুণ বল আর স্বভাব বল যাহা ইচ্ছা বলিতে পার; কিন্তু এ ভালবাসাকে আমি চেষ্টা করিয়া অর্জ্জন করি নাই। আমি এ ভালবাসা মনের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছি। ভাল-বাসিয়া পরের ভৃত্য হইলাম, অপরকে ভাই বলিলাম, এখন আর ছাড়িতে পারি না; এখন আর উপায় নাই। কাট আর মার যাই কর, কার্য্যে থাকিতেই হইবে। যদি তোমরা অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পার, ঐ অমুক ব্যক্তি কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, আমি সকলের আগে গলায় বস্ত্র দিয়া তাঁহার পূজা করিব, তাঁহাকে ঈশ্বরের চিহ্নিত জানিয়া তাঁহাকে আপনি গদীতে বসাইব। কিন্তু ভাই, তোমরা একটি কাজ করিও, আর এক জন যে প্রাণের সহিত ভাল বাসে, তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, তাহাকে আনিও। আমি সরল মনে বলিতে পারি, আর কেহ নাই যে আমার মত তোমাদিগকে ভাল বাসে। যত দিন তেমন লোক দেখিতে না পাইব, শরীরে যত দিন রক্ত আছে ততদিন দস্যুর হাতে রাক্ষসের হাতে প্রিয় ভাই ভগিনীগণকে সমর্পণ করিব না। আমা অপেক্ষা বা আমার সমান এক জন লোক ভালবাসে বলিয়া দাও; দেখ আমি তাহাকে সমুদায় ভার দেই কি না? আমি তোমাদিগের নিকট ঋষি বা মহর্ষি চাই না, তোমাদিগের দুঃখ দেখিয়া কান্দিবে, প্রচারকগণ এবং তাঁহাদিগের পরিবারের মুখে যদি অন্ন না যোটে তবে কান্দিবে এমন একজন চাই। যদি বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে আমার অস্থির মধ্যে শোকের চিহ্ন আছে কি না? প্রাণেশ্বর যদি বলেন অমুককে

তে যার স্থানে প্রেরণ করিলাম; অমনি আমার জীবন শেষ হইবে; প্রাণ-ত্যাগ করিব, আমার কর্ম্মকাজ তখনি ফুরাইবে। আর এক জন আমার ভাই ভগ্নাদের জন্য কাঁদিবে ইহা বুঝিলেই আমার সমুদায় কর্ম্ম শেষ হইল।

"দেখ আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই, আমি বিষয় কার্য্য করিতে কার্য্যালয়ে যাই না। আমি যখন বসিয়া থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে শয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই ভগ্নী কে কোথায় রহিলেন, কাহার কি অবস্থা হইল, কেবল এই ভাবি। আমার ভাবিবার বিষয় আর কি আছে? আমার আর কোন বিষয়ও নাই, সম্বলও নাই, বল আমি চব্বিশ ঘণ্টা বসিয়া কি করি? কেবল আমার হৃদয়ের পুতুলগুলিকে সাজাই কাপড় পরাই, প্রাণের ভিতরে লইয়া তাহাদিগের সেবা করি। আমার বস্ত্র আমার মাণিক বন্ধুগণ। রাত্রি দুই প্রহর হইল, একটা বাজিয়া গেল, বন্ধুগণকে তবু যাইতে দিতে ইচ্ছা হয় না, মনে হয় একাকী কি প্রকারে থাকিব? ঈশ্বর আমাকে বন্ধু দিয়াছেন, আমি যখন তাঁহাদিগকে ভাবি, আমার মনে কত আনন্দ হয়, আমি কাহাকেও বলি না। ভাইয়েরা দুঃখ দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু তাঁহাদের ভাবনা ভাবিয়া কত আনন্দ হয়, কত সুখ পাই। অন্য লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্য লোকের সুখে সুখ, এই আমার সুখ এই আমার কার্য্য। এই জন্য এখনও আছি, এই জন্য এখনও থাকিব। সকলে বলুন আর না বলুন সেবা করিব এই উপরের আজ্ঞা। বিবাদ করিতে চাও কর, আমি মনকে কখন ঠকিতে দিব না। কেন না আমার এ ঘরের কথা। আমার এ কথাতে তর্কবিতর্ক আসিতে পারে না। কি সম্পর্কে আমি কার্য্য করিব—এক জন ভালবাসে এই সম্পর্কে। কেহ অহঙ্কারী বলিতে চাও বল, তবু একথা বলিতে ছাড়িব না। আমার ঘরের কথা, আমার ঈশ্বরের সঙ্গে কথা, তাই এ কথা বলিলাম।"

অন্যতর উপদেশটি এই;—"স্থল বিশেষে মনের কথা খুলিয়া বলাতে দোষ নাই। যখন পৃথিবীতে জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্যা যত ছিল তাহার এক জন বাড়িল; যত প্রতারক বাস করিতেছিল, তাহার এক জন বৃদ্ধি হইল। ইহা পৃথিবীর সম্বন্ধে ভাল হইল কি মন্দ হইল, সে বিষয়ে মত ভেদ হইতে পারে, ইহার ফল যাহা হইবার তাহা ভবিষ্যতে হইবে, তবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু এক জন চুরী করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে,

ইহাতে আর সন্দেহ নাই। 'সন্দেহ নাই' বলের সহিত বলিতেছি, কেহ ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে না; নিশ্চিত প্রতিবাদ করিতে পারে না। ইহার সাক্ষী শত্রুগণ এবং মিত্রগণ। শত্রুদলও বলেন মিত্রদলও বলেন এ কথা সত্য। এক জন ভারি প্রবঞ্চক যশোমানলাভের প্রত্যাশায়, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার ইচ্ছায়, আপনার ঐহিক অভাব মোচন করিবার জন্য, নানাপ্রকার কৌশল এবং কপটতার জাল বিস্তার করিতেছে, পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে ঈশ্বরের নামে অপহরণ করিতেছে। এক জন লোক নানাপ্রকার নিগূঢ় কৌশলে গূঢ় ভাবে মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিতেছে, নগরে গিয়া কখন নিজ নামে কখন বিনামী করিয়া লোকের হৃদয় চুরী করিতেছে। শত্রু মিত্র দুইয়ের কথা ভিন্ন প্রকার কিন্তু মূলে এক। শত্রুরা এক জন চোরের পরিচয় প্রদান করিতেছে, যে ব্যক্তি কপট ধূর্ত্ত বিষয়ী, যাহার ভিতরে এক বাহিরে এক, সংসার অন্তরে বাহিরে সাধুতা, অন্তরে বেশভূষার বাসনা, বাহিক শোভাতে যোগী এবং ধার্ম্মিক, মুখে তপস্যা, চক্ষে ভক্তি, হস্তে সেবা, মস্তক অবনত, সুতরাং শরীরের বাহ্যিক লক্ষণে ভক্ত এবং যোগী বলিয়া গণ্য; ভিতরে বিষয়ের গরল, বাহিরে নিস্পৃহের ভাব। ঈশ্বর ইহার উপলক্ষ্য, সংসার লক্ষ্য। এ ব্যক্তি নিশ্চয় কপট চোর। আমিও বলি এ ব্যক্তি চোর, কিন্তু অন্য ভাবে, অন্য লক্ষণে, এ ভাবে এ লক্ষণে নয়।

"আমি আমাকে চোর বলিতেছি; বিরোধী দল যে চোর বলিতেছে তাহাদের কথা খণ্ডন করিতেছি না। কারণ এ ব্যক্তি যথার্থ কোন্ প্রকারের চোর তাহার বিচার ভবিষ্যতে হইবে। এই বেদী হইতে সাব্যস্ত করা যাইতেছে, এক জন চোরের জন্ম হইয়াছে। শত্রু মিত্র, এ দুদলের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে যোগ দিতে পারি; আমার দ্বারা চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাও বলিতে পারি। কি-রূপে কি কৌশলে চুরী করিব চিন্তা ভাবিতে লাগিল। চোরের ব্যবসায় চোরের কৌশল লইয়া কোন্ স্থলে কি রূপে কার্য্য করিলে ব্যবসায় চলিবে চিন্তা হইল। একটি অভ্যাস ছিল, সেটি এই; ব্রহ্ম বলিয়া এক জন আছেন তাঁহার মুখ দর্শন করিতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিতাম, ঈশ্বরের নিকট উত্তর শুনিতাম। আজ বলিতেছি, তাকাইতাম আর এখানে ওখানে উপরের দিকে সমক্ষে পশ্চাতে সুন্দর মুখ দেখিতাম। ঈশ্বরের মুখ চিরসুন্দর। কদি-

কাতা সমাজে বিফুগান করিত, 'ভুলো না চিরসুহৃদে'। চিরসুহৃৎ কে? আমরা কি তাঁহাকে দেখিতে পাই না? মানুষ নন, নিরাকার ইহাতে ভুল নাই; কিন্তু 'ভুলো না চিরসুহৃদে' যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, দেখি তিনি কাছে কি না? চক্ষু তুলিলাম, এক জনার মুখ দেখিলাম, সে মুখ আর ভুলিবার নহে। মুখ দেখিলাম ইহাতে আর ভুল নাই আর ভ্রান্তি নাই। আমি আছি, ইহা যেমন সত্য বলিয়া মানি, এ মুখ দেখা যায় আমি তেমনি সত্য বলিয়া মানি। এই সেই মনোহর রূপ ঘরের মধ্যে, ঘরের কোণে, সমক্ষে নিকটে। সেই এই মুখ জীবনের বস্তু, সেই এই শীতল সুকোমল পদ জীবনের সার ধন। এই মনোহর জিনিষ আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি; দেখিয়া বুকের ভিতরে রাখিয়াছি।

ঈশ্বর দয়া করিয়া দর্শন দিলেন। ছেলে মানুষের মধ্যে প্রথা আছে এক জন আহ্লাদিত হইলে দশ জন আহ্লাদিত হয়। এক জন যদি হাঁ করে আর দশ জন দর্শক অজ্ঞাতসারে হাঁ করে। এক জনের মুখ ম্লান হইলে তার সঙ্গে সঙ্গে দশ জনের মুখ ম্লান হয়। তেমনি যদি এক জনকে হাসিতে দেখা যায়, নিজের মুখও হাসি হাসি ভাব ধারণ করে। যখন দেখিলাম সেই মুখ কখন কখন ঈষৎ হাস্যযুক্ত হয়, তখন আমারও মুখ মনোবিজ্ঞানের নিয়মে ঈষৎ হাস্যের ভাব ধারণ করিল। তাঁহার মুখ হাসিতেছে, সুতরাং আমার মুখও হাসিল। সার কেবল এই হাসি মুখ। এই মুখ দর্শনেই চুরীর কৌশল শিখিলাম। মুখ দেখিলাম দেখিয়া সুখী হইলাম। এই মুখ দেখিবার জন্য চুরি করিতে হয়, চৌর্য্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। পৃথিবীর ইহাতে সায় নাই। কেবল বিপদ কালে নিকটে বসিয়া বলিলাম "মুখ দেখাও' আর একটি বার দেখাও। দুঃখ বিপদে সন্তপ্ত প্রাণে তোমার কাজ ভাল লাগে না, তোমাকে দেখিতে চাই। যাই আনন্দ মুখ দেখিলাম, চক্ষু হইতে জলধারা পড়িল, প্রাণ শীতল হইল, অত বিপদ দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। যাহাতে দর্শন ঘনীভূত হয় তাহার উপায় ধ্যান তপস্যা যোগ। কিন্তু এ সংক্রান্ত একটা কথা আছে। আমার অনেক ক্ষণ দর্শন হয় নাই, দীর্ঘ কাল তাঁহার দিকে তাকাইতে পারি নাই, নৈমেষিক দর্শন হইয়াছে। একবারে একটি নিমেষ, পল, বা অর্দ্ধ মিনিট দর্শন হইল আর হইল না। ইহাতে বোধ হয় দর্শন

পলকের জন্য হয়, ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট ২ মিনিটের জন্য হয় না। কিন্তু ঐ যে পলকের মত দর্শন, ঐ বিন্দুই সিন্ধুপ্রায় হয়। পলকের দর্শন ভিন্ন মনুষ্যের হয় না, পাপিজীবনের পক্ষে ইহাই পরম পদার্থ, ইহাই বহুমূল্য রত্ন। একটি বার দর্শন করিলে পৃথিবীর সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া যাওয়া যায়। এইরূপ একবার দুইবার দর্শন হইতে হইতে জীবনের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সঞ্চার হয়; জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। এই সুখ সকলেরই অর্জ্জন করা আবশ্যক। তাঁহার কথা শুনাও উচিত, তাঁহাকে দেখাও উচিত। দেখা শুনা, শুনা দেখা, একবার দেখা একবার শুনা, একবার রূপদর্শন করিলাম একবার তাঁহার মুখের কথা শুনিলাম, এই দুটি ব্যাপার দ্বারা জীবন পবিত্র হয়। দর্শনের কথা বলিতেছি, কিন্তু ইহা কি দুর্ল্লভ? এই যে তিনি আছেন ইহা যদি বলিতে না পারিলে তবে দর্শন বহু দূরে। বিনা চেষ্টায় এখনি যদি বলিতে পার এই তিনি আছেন, তবে হইল, নতুবা বুদ্ধি দ্বারা ভাবিতে লাগিলে আর তিনি চলিয়া গেলেন। বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু ভক্তিচক্ষে এই তুমি এই আমি সহজ পরিচয়।

"এই দর্শনের আনন্দে এই দর্শনের সুখে জগতের লোককে ডাকিয়া আনিয়া মত্ত করিতে হইবে সুখী করিতে হইবে। এই আনন্দ এবং মত্ততার মধ্যে সকল কাজ করিয়া লওয়া যায়। পাঁচ জন ভাইকে বলিলাম তোমরা সকলে মিলিয়া স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন কর। স্বার্থপর হইয়া, দুর্ব্বাসনা এবং রিপুর বশীভূত হইয়া কেহ সে কথা শুনিল না, সাধন ভজন সকল মিথ্যা হইল। কথা বলিয়া কিছু হইল না, আস্তে আস্তে নিগূঢ়ভাবে ২ জন ৫ জন ১০ জন ২০ জনকে অধিকার করা গেল। বিনামে অধিকার করা হইল। ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ, প্রেম, মিষ্ট সম্ভাষণ এইরূপ একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তৃত হইল। যাঁহারা সংসারের রাজ্যে পথিক, তাঁহারা একজন দুইজন তিনজন করিয়া ক্রমে জালে পড়িলেন। কেহ কেহ জাল কাটিয়া গেলেন বটে কিন্তু আজও তাঁহাদের পায়ে জাল লাগা আছে। এই জালে যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগের অনেকে দূরে আছেন, এবং তাঁহারা জানিতেছেন না যে কেহ তাঁহাদিগের কিছু চুরী করিতেছে। জীবন আছে ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, এক জনের হস্তে এখনো সকলে আছেন, ইহাও তেমনি নিশ্চিত বিশ্বাস। এটি অভ্রান্ত মত যে কেহ ছাড়িয়া যাইতে

পারে না। এক জন লোক চুরী করিতেছে ইহা প্রকাশ হউক, বা না হউক; সকলের উপরে চুরী চলিতেছে, এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সুখ আছে। প্রেম লোকের মন চুরী করিতেছে। তাহারা ধরা পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বরবিষয়ে ভিতরে ভিতরে কত মত গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাব তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।

"ঈশ্বর চোরের কার্য্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাই করিয়া ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে। তিনি আপনি চোরের সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর চোরের সহায়, এমন সতর্ক প্রহরী কেহ নাই যে এ চুরী বন্ধ করিতে পারে। চোরের কার্য্য চলিল, স্বয়ং ঈশ্বর চোরের কার্য্য বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। এত আন্দোলন অথচ নিশ্চিন্ত আছি, সুখী আছি। কিসের জন্য? এই জন্য যে জানি যে, যে একবার জালে পড়িয়াছে, সে আর কোন প্রকারে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। কেহ নূতন দল স্থাপন করিতে চান, দলাদলী করিতে আরম্ভ করেন, করিয়া কি করিবেন? প্রত্যেক প্রস্তাবক অর্থাৎ প্রচারক একথা নিশ্চয় যে দলাদলী স্থাপন করিতে পারেন না। কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়া যদি মনে হয় যে তাঁহারা ঘরের বাহিরে গেলেন; জানিও যে তাঁহারা ঘরের বাহিরে গেলেন না, ঘরেতেই রহিলেন। যদি এক সহস্র ক্রোশও কেহ চলিয়া যান যাউন, হস্তপদ বান্ধা রহিয়াছে। প্রেম দ্বারা ঈশ্বর যাহাদিগকে ধরিয়াছেন, তাহারা কোন রূপে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। একবার যাহারা পরিবারের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, তাহারা সে সূত্র কি প্রকারে ছেদন করিবে? প্রত্যেক ব্যক্তি যাঁহারা ঈশ্বরের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা প্রেমের নামে ঈশ্বরের নামে এক এক জন পাঁচ শত সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিয়া দিবেন এবং তাঁহারা চুরী করিয়া সকলকে বদ্ধ করিবেন। যাঁহারা একপ কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারা কখন পলায়ন করিতে পারেন না। বুদ্ধি বিচার যাহা বলুক, প্রাণ ইহা কখন স্বীকার করিবে না। অতএব আমি জানি সে লোক কখন শত্রু হইতে পারে না। চোরের ভাগ্যে এইজন্য সর্ব্বদা আহ্লাদ। যাহারা আপনাদিগকে শত্রু বলিবে তাহারাও মিত্র। বক্ষের রক্তের সঙ্গে যে মিলিত হইয়া আছে সে কিরূপে ভিন্ন হইবে? আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কি আমার শরীরের সঙ্গে বিবাদ করিবে? আমি আমার কখন পর হইতে পারি না। যিনি একবার

বদ্ধ হইয়া হৃদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বাহিরে বিদায় হইয়া গেলেও বক্ষঃস্থলে চির দিনের জন্য আবদ্ধ আছেন ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। চোরের ব্যবসায় মহৎ ব্যবসায়। সকল পৃথিবী চলিয়া গেলেও সেই আমার ঘরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন। যিনি ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, দূরে গেলেন, তাঁহাকে কি ছাড়া যায়, তিনি চিরদিনের জন্য বক্ষে বদ্ধ আছেন। চুরীর শাস্ত্রে কেহ পর হইতে পারে না। ব্রহ্মনামের সুধা জগতের লোককে দিয়া প্রমত্ত করিয়া তাহাদিগের চিত্ত হরণ কর, দেখিবে ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি ব্রাহ্মের ভালবাসার সঙ্গে জড়িত আছেন এবং চিরদিন থাকিবেন।"

চারিদিকের ঘোরতর আক্রমণের ভিতরে কেশবচন্দ্র কিপ্রকার প্রশান্ত ভাব রক্ষা করিয়াছেন, এবং এই আক্রমণকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন ১২ চৈত্রের ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশে উহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। আমরা সেই উপদেশটি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই দিন প্রতিবাদকারিগণ উপাসনায় ব্যাঘাত জন্মাইতে যত্ন করিয়াছিলেন।

"অদ্য আর বক্তৃতার বিষয় খুঁজিবার জন্য দূর দেশে যাইতে হইবে না। ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা ব্রহ্মমন্দিরে কোটি সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। আজ নাম কীর্ত্তন করিবার অপেক্ষা নাই, পূজনীয় ব্রহ্মের নাম করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তিনি তাঁহার অগ্নিময় আবির্ভাবে এই গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন। যাঁহারা আমাদের বিরোধী হইয়াছেন তাঁহারা অজ্ঞাতসারে আমাদের পরম উপকার করিলেন; আমরা বিরোধিগণের চরণ ধরিয়া ধন্যবাদ করিতেছি। বিরোধিগণ তোমরা অতি বন্ধুর কার্য্য করিলে, তোমাদেরই জন্য জগদ্ধাত্রী তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা চমৎকাররূপে মনুষ্যসমাজে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তোমাদেরই জন্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় জগতের ঈশ্বর বিপদের সময় কেমন নিকটস্থ হন, ভক্তবৎসল হরি কেমন কোমল, কেমন তিনি প্রেম প্রকাশ করেন। বিরোধিগণ যতই আক্রমণ করে, জননী ততই সাধককে আপনার সুমিষ্টক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করেন। যতই সাধকের হৃদয় আক্রমণে সন্তপ্ত হয়, ততই তিনি তাহাকে সুশীতল করেন। দেখ আজ দুঃখযন্ত্রণা শোক বিপদ্ কিছুই রহিল না, রহিলেন কেবল ঈশ্বর। আজ ব্রহ্মমন্দিরে আদি অন্তে কেবল ব্রহ্মের

আবির্ভাব। তিনিই আজ আমাদিগের বক্ষঃস্থলে প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

"সুন্দর হরির মধুময় আবির্ভাব আরও প্রাণের সহিত ভাল বাসিব, এবং তাঁহার মহিমা পরাক্রমের সহিত প্রচার করিব। বন্ধুগণের আর অকালে ইহলোক পরিত্যাগের ভয় রহিল না? বিরোধিগণ আজ যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, তাহাতেই তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলেন। আজ আমার বন্ধুগণের মস্তকে এই আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে, তোমরা দীর্ঘায়ু হইয়া পবিত্র ধর্ম্মের ভার দুঃখী জগতে প্রচার করিয়া ইহাকে সুখধাম কর। যদি তোমরা মান হারাইয়া থাক ঈশ্বর তোমাদের মান বাড়াইবেন, যদি দুঃখী হইয়া থাক, ঈশ্বর তোমাদিগকে চিরসুখে সুখী করিবেন বলিয়াছেন। যদি তোমাদের প্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, আবার তোমরা বীরের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। যদি পাপে আক্রান্ত হইয়া থাক, অনুতাপানলে পুড়িয়া সাধু সচ্চরিত্র হইবে। যদি দুঃখের আগুন চারিদিকে জ্বলিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও ঈশ্বর তোমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে মহিমা পূর্ণ করিবেন। শত্রুগণ শত্রুতা করিয়া কি করিতে পারে? এ পৃথিবীর শত্রুতা বাস্তবিক মিত্রতা। এখানে শত্রুর ন্যায় বন্ধু আর কেহ নাই। এখানে একটী কটু কথা সহ্য করিলে সেই কটুকথা আশীর্ব্বাদ হইয়া মস্তকে অবতরণ করে, জনসমাজের প্রচুর কল্যাণ সাধন করে।

"দেখ আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, এই বেদীর ঈশ্বর, ব্রহ্মমন্দিরের ঈশ্বর জ্বলন্তভাবে দক্ষিণে বামে সমক্ষে পশ্চাতে বিদ্যমান। আজ শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, স্বর্গীয় আবির্ভাবে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়াছে। আর কেন আমি এ দেশ ও দেশ করিয়া বেড়াইব? এই যে আজ আমাদিগের ঈশ্বর করতলস্থ বস্তু হইয়া আছেন। বিরোধিগণ আগুন জ্বালিয়া কি করিবে? আমরা ব্রহ্মের ক্রোড়ে রক্ষিত হইব। আমাদের ভাইগণ আমাদিগকে কটুকথা বলিল, তাহাতে আমাদিগের কি হইল? তাহারা না বুঝিয়া আমাদিগকে অপমান করিল তাহাতেই বা চিন্তা কেন, ভাবনা কেন? তাহারা আক্রমণ করিয়া কি আমাদিগের মনকে সন্তপ্ত করিতে পারে? কৈ হৃদয়ে কটু কথার তো একটি চিহ্ন নাই। আমরা কি তাহাদিগের আক্রমণে হৃদয়ের শান্তি বিসর্জ্জন

দিতে পারি ? আমরা যত কান্দিব তত শান্তি উপার্জ্জন করিব। আমরা এই শান্তি ফেলিয়া যদি সংসারের প্রচুর মান সম্পত্তি পাই, তবু তাহা গ্রহণ করিব না। সকল অবস্থায় আমাদের এই শান্তি রক্ষা করিতে হইবে। যদি অশান্ত হই তবেই আমাদের ক্ষতি। মাতাকে শান্তিপ্রেমের আধার করিয়া সর্ব্বদা প্রাণের মধ্যে যত্নের সহিত রাখিব।

"দেখিও প্রাণ যেন কখন মলিন না হয়। মলিন হইল বলিয়া যদি ভাই বন্ধুগণ কিছু বলে, তবে তাহাতে বিরক্ত হইও না। হৃদয় বা মলিন হয় এ বিষয়ে চিরকাল ভয় রাখিবে। ক্রোধপূর্ণ নয়নে কাহার পানে তাকাইও না। যে ব্যক্তি শান্তভাবে সমুদায় বহন করে তাহার মস্তকে অমৃত বর্ষণ হয়। বিরোধি-গণের প্রতি সর্ব্বদা দয়া রক্ষা করিতে হইবে, কেন না তাহারা জানে না কি করিতেছে। তাহারা বিরোধ দ্বারা পুণ্য পবিত্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। আমরা জানিতে পারিয়াছি বিরোধও ঈশ্বর সৃজন করিয়া থাকেন। সম্পদ্ বিপদ্ সকলই সমান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এক দিকে উর্দ্ধে আরোহণ করিবে, আর এক দিকে নীচে যাইবে। দীর্ঘজীবী হইতে হইলে পরীক্ষার আগুনে পুড়িতে হইবে। ব্রহ্মের বিধান এই, এ বিধান অতিক্রম করিতে পার না। বিধাতার বিধি আজ আরো অধিক বুঝিতে পারা যাইতেছে। দেখ বিরোধের ভিতরে কেমন চমৎকার বস্তু, আক্রমণের ভিতর কেমন অপূর্ব্ব সুখ সম্পদ্। বিরোধ পাঁচ মিনিটের জন্য, আক্রমণ অতি অল্প সময়ের জন্য, কেন না ইহার মধ্যে ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়। আক্রমণ বিরোধের মধ্যে যে বলের সহিত বলিতে পারে না, আক্রমণ বিরোধে ব্রহ্মের প্রবল জ্যোতি প্রকাশ পায়, সে কখন ব্রহ্মে বিশ্বাসী নহে। প্রবল আক্রমণে বিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত হয়। আগে সামান্য ভাবে চারি দিকে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যাইত; এখন পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ব্রহ্মের জ্যোতি কেমন স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত! কেমন সত্যের সাক্ষী হইয়া বিদ্যমান! চারিদিকে আগুন জ্বলিয়াছে, দেখ ভিতরে কেমন পুষ্পের সুকোমল শয্যা। বাহিরে এত আগুন, অথচ প্রাণ কেমন শীতল হইতেছে। যত তোমাদের প্রতি আক্রমণ হইবে তত শীঘ্র শীঘ্র তোমরা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া শীতল হইবে। বিরোধিগণ যখন রণস্থলে মার মার! করিতে থাকিবে, তখন তাহার মধ্যে তোমরা ধ্যানে নিমগ্ন হইবে, অন্তরে সুন্দর পুষ্প সকল ফুটিবে,

তরুপল্লবলতাতে হৃদয় মনোহর ভাব ধারণ করিবে। তখন বুঝিবে ব্রহ্মের কেমন মহিমা।

"প্রিয় সাধকগণ যুগে যুগে কালে কালে সময়ে সময়ে কত বিপদে পড়িয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাদিগকে কত কষ্টে ফেলিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সুখে বসিয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই দৃষ্টান্তের কবচে আপনাদিগকে আবৃত কর। ঈশ্বর যাহাদিগের আশ্রয় স্থান, তাহাদিগের কোন ভয় নাই! ঈশ্বর কখন ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বরের চরণ যখন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলাম, তখন মনুষ্যের সাধ্য কি যে উহা ছাড়াইয়া লয়। যে প্রাণনাথের চরণ জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে সুখের স্থানে বসিয়া আছে, কেহ তাহাকে কোন প্রকারে দুঃখ দিতে পারে না। সাধককে দুঃখ দেয় পৃথিবীতে এমন কে আছে? যখন সাধক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তখন অবসন্ন হইও না, বিশ্বাসী মনে সর্ব্বদা ঈশ্বরের চরণ আশ্রয় করিয়া থাক। বিশ্বাসীর দুঃখ কোথাও নাই, আপনি আপনার দুঃখের কারণ হইতে পার, অপরে কখন তোমাদের দুঃখের কারণ হইতে পারে না। ঐ দেখ! সকলে আমাদিগকে অপমান করিল, আমাদিগকে সকলে ছাড়িয়া দিল, যাই এই কথা বলিলে ব্রহ্ম হাসিয়া ফেলিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ প্রকাশিত করিলেন। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? এই আজ আমাদিগকে হাসাইলেন কে? আজ যাহারা দুঃখ দিতে আসিল তাহাদিগকে সহজে হারাইলেন কে? কেহ কি আমাদিগকে দুঃখী করিতে পারিল? আজ এই বিরোধের অবস্থায় যে রত্ন হাতে পাইয়াছি যত্নের সহিত তাহা বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া আমরা সুখে দিন যাপন করিব; পরে আর কেহ আমাদিগকে দুঃখী করিতে পারিবে না। যদি অধর্ম্ম করি তবেই দুঃখ। মনুষ্যের কটূক্তি কখন আমাদিগের হৃদয় ভেদ করিতে পারিবে না। যত বিষাক্ত বাণ আমাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবে, অমৃতবিন্দু হইয়া উহা আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। তোমরা শান্ত ভাবে বসিয়া থাক, আর অন্যের দুঃখ দেওয়ার যত্ন দেখিয়া নির্জ্জনে বসিয়া পরিহাস কর। যদি দুঃখ আইসে তোমাদিগের এক গুণ বিশ্বাস দশ গুণ হইবে, দশ গুণ শান্তি বিশগুণ হইবে। তোমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাক, ব্রাহ্মসমাজের কখন অমঙ্গল হইবে না। দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর, তাঁহার নাম স্মরণ কর, সাধন ভজন কর। ইহাতে এই হইবে,

দুঃখ বিপদে দুঃখ দিতে পারিবে না। যাহারা আজ অল্পবিশ্বাসী আছে তাহারা পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে। যাহারা মরিবে বলিয়া শ্মশানে যাইতেছে, তাহাদিগকে জাগ্রৎ জীবন্ত জলন্ত দেখিতে পাইবে। সাধন ভজনে দুঃখী সুখী হয়, অসহায় সহায় পায়, নিঃসহায় প্রচুর ধন লাভ করে। যোগের অবস্থায় বিপদে ঘেরিলে ধ্যান আর ঘনতর হয়। যত লোকে করতালি দিবে, তত তোমরা আরো আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিবে। বাহিরে যত কটূকথা শুনিবে হৃদয়ে তত ব্রহ্মের মধুর কথা শুনিবে। বাহিরে যত অন্ধকারে ঘেরিবে ততই অন্তরে উজ্জ্বল ব্রহ্মরাজ্য প্রকাশ পাইবে। বাহিরের বিরোধকে আক্রমণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরাজ্যে বসিয়া থাকা চাই। সেখানে বসিয়া থাকিলে অধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম, অনিষ্টের মধ্যে ইষ্ট, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল লাভ হইবে; সমুদায় অভদ্র তিরোহিত হইবে। বন্ধুগণ, ব্রহ্মে লীন হও, আরো তাঁহাকে ভাল বাসিতে থাক, সুখ শান্তি তোমাদেরই।"

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা।

১৭৯১ শকে কেশবচন্দ্র বন্ধুবর্গ সহ খাঁটুরা গ্রামে গমন করেন, সেই হইতে ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্তের গৃহে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা আরম্ভ হয়। এই উপাসনায় গ্রামের ও তৎসংলগ্ন অপর গ্রামের কয়েক জন ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন। ভ্রাতা ক্ষেত্র মোহনের অনুপস্থিতিকালে উপাসনাকার্য্য এক এক বার বন্ধ থাকিত। এই উপাসনার ফলস্বরূপ একটি যুবা প্রাচীন কুসংস্কারের শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া ব্রহ্মসমাজে যোগ দান করেন। বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী লেপ্টেনাণ্টগবর্ণরের নিয়োগানুসারে সন্নিহিত গোবরডাঙ্গার নাবালক জমীদারগণের অভিভাবক হয়েন, তিনি এই সময়ে সর্ব্ববিষয়ে ইঁহাদের সহিত যোগ দান করেন। তাঁহার মত প্রাচীন সম্মানিত ব্যক্তি যোগ দেওয়াতে স্থানীয় লোকদের মনে অবশ্য সম্ভ্রম উপস্থিত হয়। আজ নয় বৎসর হইল সমাজের কার্য্য চলিতেছে। ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের উৎসাহে যে অঙ্কুর ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ খাঁটুরা এবং গোবরডাঙ্গা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলে উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থানে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে (১৮০০ শকের ৬ আষাঢ়) কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে তথায় গমন করেন। এ সম্বন্ধে তৎকালের ধর্ম্মতত্ত্বে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এইরূপ নিবদ্ধ আছে।

"বিগত ৬ই আষাঢ় খাঁটুরা গ্রামে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের নির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় কয়েক জন বন্ধু সহ তথায় গিয়াছিলেন। ৫ই আষাঢ় সন্ধ্যার সময় সংকীর্ত্তন ও স্তোত্র পাঠান্তে আচার্য্য মহাশয় সমবেত ভদ্র ও সাধারণ লোক-দিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। ইহাতে দুই শ্রেণীর লোককে ভিন্ন প্রকারে উপদেশ অর্পিত হয়। যাঁহারা ভদ্রশ্রেণী তাঁহাদিগকে চিত্তসংযম, আরাধনা, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতিতে নিয়মিত সময় দিতে অনুরোধ করেন। যাহারা সাধারণ লোক, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া যাহাদের জীবন রক্ষা করিতে

হয়, তাহাদের সময়ের অভাব, জ্ঞানের অল্পতা হইলেও ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম করিবার সময় আছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ৬ই আষাঢ় প্রাতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ হয়। প্রতিষ্ঠিত মন্দির যদিও বৃহৎ নয়, দেখিতে অতি সুন্দর ও সুরুচিনিষ্পন্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে ধান্যক্ষেত্র, প্রশস্ত প্রান্তর, অথচ গ্রামমালায় পরিবেষ্টিত। বিশুদ্ধ বায়ুর এত সমাগম যে একটু বায়ুবেগ হইলে সম্বৃত বস্ত্রে উপবেশন করিতে হয়। সায়ংকালে উপরিউক্ত দত্ত মহাশয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, বারণ্ডায় ছাদে এবং মণ্ডপে প্রায় সহস্র লোক সমবেত হইলে, সঙ্গীত ও শ্লোক পাঠানন্তর আচার্য্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করেন। অনেকগুলি সাধারণ লোক একত্র হইলে সেখানে গোল না হইয়া যায় না। কিন্তু যখন বক্তৃতা হইতেছিল, তখন একটী সূচী নিক্ষেপ করিলেও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ ভাবে সকলে নিস্তব্ধ এবং সকলের চক্ষু আচার্য্য মহাশয়ের মুখমণ্ডলে বদ্ধ ছিল। বক্তৃতান্তে যখন সঙ্গীত হইতেছিল, তখন সাধারণ লোকে মিলিত হইয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। যখন বাহির হইয়া গেল, তখন তাহাদিগকে পথে হরিধ্বনি করিয়া যাইতে অনেকে শুনিয়াছেন। ৭ই আষাঢ় গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ জমিদার মহাশয়ের গৃহে বক্তৃতা হয়। ইহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভদ্র সাধারণে প্রায় চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। আর্য্যজাতিত্বে আমরা সমুদয় ভেদজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করি, তাহাদিগের সহিতও কেমন মিলিত হইতে পারি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যাঁহারা মনে করেন ব্রাহ্মধর্ম্মের আকর্ষণ ও অগ্নি হ্রাস হইয়াছে, তাঁহারা কেমন ভ্রান্ত।”

৬ আষাঢ় প্রাতে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কেশবচন্দ্র এই উপদেশ দেন :—

“এই আর্য্যস্থান পুণ্য স্থান, এই ভারত ভূমি পুণ্য ভূমি, কেন বলি? এই ভূমিতে ঋষির জন্ম হইয়াছে। ভারতভূমি কৃতার্থ হইল, কেন না ঋষি ও ভক্ত উহাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহাদের জীবন সার্থক, যাহারা ঋষি ও ভক্তের জন্ম ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ঋষিজীবন এবং ভক্তজীবন ভিন্ন ধর্ম্ম আর কিছু নহে। এই দুই জীবন ধর্ম্মের দুই শাখা, পুণ্যের দুই ভাব।

দুইটি একত্র করিলে সত্য ধর্ম্ম, ঈশ্বরের ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম কাহাকে বলে? এক দিকে ঋষি এক দিকে ভক্ত, এ দুয়েব মিলন প্রকৃত ধর্ম্মেব দৃষ্টান্তস্থল। ঈশ্বর ধর্ম্মের দুইটি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন 'ঋষি তুমি ভারতে গমন কর। সংসার দুঃখের স্থান। এখানে ধন মান পরিবার ইন্দ্রিয়সুখ সকলের মন প্রমুগ্ধ করে, অধর্ম্মের আকর্ষণে সকলে ডুবিয়া মরে। তুমি গিযা সমুদায় আসক্তি পরিত্যাগ কবিযা বৈরাগী উদাসীন সন্ন্যাসীব ভাব ধাবণ কর। কি জানি কিছুতে পাছে মুগ্ধ কবে এ জন্য চক্ষু মুদ্রিত কব। হিমালযশিখব, গিবিগহ্বব, গঙ্গা যমুনা শতদ্রু নদী, নিবিড় জঙ্গল, যেখানে লোকালয় নাই, টাকা নাই, সেই খানে গিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিমিলিত নযনে ধ্যানে নিমগ্ন হও। যদি স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে লইতে চাও, তাহাদিগকে আশ্রমেব ভিতরে স্থান দাও। তাহাদিগকে ধ্যানেব পথে দৃষ্টান্ত দ্বারা আকর্ষণ কর।' ঈশ্বরেব এই আদেশে ভারতেব কত মুনি ঋষি জন্ম গ্রহণ কবিলেন; নির্জ্জনে ধ্যান ধাবণা কবিয়া দেশেব কত মঙ্গল করিলেন, এবং সাধন ভজনে আত্মসমর্পণ দ্বারা ধর্ম্মেব উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

"ঈশ্বরেব ভক্তকে বলিলেন, 'তুমি ভারতভূমিতে যাও। ধর্ম্মেব অপরাংশ গিয়া সংগঠন কর। পৃথিবী নিতান্ত শুষ্ক হইযাছে। কেবল কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞান কাণ্ডের শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম কি, প্রকৃত যাগ যজ্ঞ কি, প্রকৃত জ্ঞান কি, লোকে বুঝিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে হরিভক্তি নাই; হরিনাম-রসামৃতের আস্বাদ কেহ পায় নাই। উহা শুষ্কতা, সাংসারিকতা, অধর্ম্ম, কুসংস্কার, ধর্ম্মহীনতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। যাও, এই সকল দেখিয়া ক্রন্দন কর এবং হরিপদ স্মরণ করিতে করিতে চক্ষু হইতে তোমার আনন্দধারা নিপতিত হউক, গাত্র রোমাঞ্চিত হউক। তুমি ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া কখন হাসিবে কখন কাঁদিবে, কখন নৃত্য করিবে; কখন ব্রহ্মামৃতসাগরে ডুবিবে। তুমি আপনি আনন্দনীরে ভাসিবে, এবং তোমাকে দর্শন করিয়া তোমার প্রতিবাসীরাও আনন্দনীরে মগ্ন হইবে। একটি দুইটি করিয়া ক্রমে সমুদয় দেশ সেই মধুময় রসের আস্বাদ জন্য উপস্থিত হইবে। হে ভক্ত! তুমি গিয়া ভারতভূমিতে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশ কর। তোমাকে দেখিয়া তাপিতহৃদয় সাধকগণের শান্তি হইবে। তুমি আপনি যে নাম করিয়া সুখী হইবে, অপরেও সেই নাম করিয়া সুখী হইবে। তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমার কথা শুনিয়া ভারতের

নগরে নগরে ধর্ম্মের জয়ধ্বনি হইবে। মৃদঙ্গ বাজাইয়া নামকীর্ত্তন কর, গ্রামে গ্রামে মহারোল উঠিবে, প্রেমের প্রবল তরঙ্গে দেশ বিদেশ ভাসিয়া যাইবে; এক এক করিয়া সহস্র ভক্ত আসিয়া একত্র মিলিত হইবে। ক্রমাগত নাম করিতে থাক, পৃথিবীর সকল শোক তাপ বিদূরিত হইবে।'

"দুঃখী ভারতের দুঃখ বিমোচন জন্য ঈশ্বর এই দুইটি অঙ্গে ধর্ম্ম নির্ম্মাণ করিলেন এবং দুই জনকে দুইটি ভাব প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কাল ক্রমে দুই অঙ্গ মিলিত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মের উদয় হইল। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃত ঋষি এবং চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রকৃত ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের এক জন বেদ, এক জন শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিলেন। এক দিকে জ্ঞানশাস্ত্র ঋষিমত, আর এক দিকে ভক্তিশাস্ত্র প্রেমের মত। এক দিকে হিমালয় ঋষিগণের স্থান, আর এক দিকে নবদ্বীপ ভক্তের জন্মভূমি। এক দিকে ধ্যান ধারণার গভীর প্রশান্ত ভাব, আর দিকে ভক্তি প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস। এই দুয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হও দেখিবে আশ্চর্য্য রত্ন লুক্কায়িত আছে। আজও পর্ব্বতে গিয়া দেখিতে পাইবে, হিমালয়ের এই উচ্চ শিখরে এই স্থানে ঋষিগণ বসিয়া সন্ধ্যাকালে করযোড়ে পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিতেন। গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীকূলে যাও, দেখিবে অমুক স্রোতস্বতীর কূলে অমুক ঋষির আশ্রম ছিল। সেই সেই স্থানে বসিয়া তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিয়া কত অপূর্ব্ব রসাস্বাদ লাভ করিতেন। সামান্য গৃহে প্রবেশ কর, আজও দেখিতে পাইবে প্রভু চৈতন্য কি করিয়াছিলেন। কুসংস্কার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শুষ্ক জ্ঞানে জর্জ্জরিত এই দেশ উজ্জ্বল হইল কেন, শীতল হইল কেন? প্রেমের প্রভাবে। তাঁহার নামে সমুদয় দেশ প্রেমজলে প্লাবিত হইয়াছে, আজও প্লাবিত হইতে পারে। এত যে ধনের লালসা, এত যে সভ্যতার আড়ম্বর, প্রকৃত ভক্ত চৈতন্যের ভক্তিতে মুগ্ধ হইলে মত্ত হইলে সকলি ভুলিয়া যাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? যাতে এক সূত্রে এই দুইটি ফুল একত্র গাঁথা হইয়াছে। ধ্যান ফুল ভক্তি ফুল বিশ্বাসসূত্রে গাঁথিয়া গলায় পরিব। এই দুই প্রকার ভাব একটি একটি ঘরে রাখা হইয়াছে, যাহার নাম ব্রহ্মমন্দির। আজ যে এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহা নূতন নহে, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা

হইয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধার হইতেছে; চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ভক্তি আসিয়াছিল তাহারই আবার আবির্ভাব হইতেছে। ইহা দেখিয়া কাহার চিত্তে না আহ্লাদ হয়? এই দুই অমূল্য রত্ন থাকিতে কি দুঃখ। হায়! এমন অমূল্য রত্ন নির্ব্বোধ লোকেরা ভুলিয়া গেল। এখন বলে কি না, আমাদের ধর্ম্ম নাই; নিরাকার ভাবিতে পারি না। ভ্রমান্ধ বলিয়া আবার আপনার দেশকে নিন্দা করে। আপনার দেশের গৌরব ভুল কেন? ভাব দেখি, এক জন প্রাচীন ঋষি নদীতটে বসিয়া ভাবিতেছেন; তাঁহার সম্মুখে কোন মূর্ত্তি নাই; তিনি পৃথিবীর সমুদায় বিষয় অতিক্রম করিয়াছেন; নিমীলিত নয়নে হৃদয়াকাশে উঠিয়া ভিতরে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিতেছেন; ভিতরে ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়া তিনি ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে বাস করিতেছেন। সংসার তাঁহার নিকটে তুচ্ছ হইল। লক্ষ লক্ষ টাকা আনিয়া তাঁহাকে ভুলাও দেখি, তিনি কিছুতেই ভুলিবেন না। ধর্ম্ম ছাড়া বর্ত্তমান ধন মান সভ্যতা সমুদায় তাঁহার নিকটে তুচ্ছ। আর কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিব না, সেই ঋষি ভাব ধারণ করিব। ঋষিতুল্য হইয়া মাঠে ছাতে বৃক্ষতলে, যেখানে গঙ্গানদী গুন গুন স্বরে প্রবাহিত সেখানে, যেখানে পর্ব্বতরাশি চারিদিকে নিজ মহত্ত্ব ও সৌর্য্য প্রকাশ করিতেছে, সেখানে নিভৃত স্থানে, কিছু নাই, কোন মূর্ত্তি নাই কেবল অনন্ত আকাশ, বলিব হে অনাদ্যনন্ত ভূমা মহান! আর শরীর মন ব্রহ্মে নিমগ্ন হইবে, 'একমেবাদ্বিতীয়মে' নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। এইরূপে দুঃখ শোক চলিয়া যায়, হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়, মায়া মমতা বিনষ্ট হয়।

"ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়া থাকা ব্রাহ্মের চেষ্টা, ব্রাহ্মের প্রাণগত সঙ্কল্প। কিন্তু কেবল ঋষি হইলে সব দুঃখ যায় না। সুখের প্রয়োজন, প্রেমের প্রয়োজন। এক দিকে ঈশ্বরে চুপ করিয়া মগ্ন হইয়া থাকিলাম, আর একদিকে তাঁহাকে স্মরণমাত্র প্রেমধারা পড়িতে লাগিল এই পূর্ণাবস্থা। ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মৃদঙ্গ বাজাইয়া পথে পথে হরিনাম কীর্ত্তন, পরিবারমধ্যে প্রেমময়ের নাম উচ্চারণ, সকলে মিলিয়া তাঁহার নামামৃতের রসাস্বাদ, ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার অনুরাগে উন্মত্ততা, ইহাতে নূতন কিছু আসিল না। বঙ্গভূমিতে যে অনুরাগতরু এক দিন ছিল, সেই অনুরাগতরু সতেজ হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য দর্শন কি চমৎকার শোভা। এ দেশে কি ধর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে? আজ কি

একটা শুষ্ক ধর্ম্ম গ্রহণ করিব? শুষ্ক মন্ত্র প্রাতে উচ্চারণ করিব? শুষ্ক অনুষ্ঠানে জীবন কাটাইব? এরূপ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। এ দেশে এখনও যে ভক্তি দেখিতেছি। ঋষিগণের সেই নিরাকার ব্রহ্মে এখন সেই ভক্তি অর্পণ করিতে হইবে। * প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে দেখিব আর তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইব। হৃদয়ের ভিতরে ঋষির নিকটে তিনি দর্শন দিবেন, ভক্তের প্রেমে তিনি হৃদয় বিগলিত করিবেন মাতাইবেন। আমরা ঋষি-ভক্ত হইয়া অনন্ত ঈশ্বরকে গলায় মালা করিয়া জীবনে ধারণ করিব। আমাদের কি দুইই হইতে পারে? এই কি বিশ্বাস করিব, এই ভারতে আর সেই ঋষি এবং ভক্তের সমাগম হইতে পারে না? না না কখনই না, এ যে ভারতভূমি পুণ্যভূমি।

"ভ্রাতৃগণ! সময়ে সময়ে তোমাদের নিরাশা উপস্থিত হয়। তোমরা মনে কর আমরা বড় মন্দ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এখানে ভাল বীজ রোপণ করিলে, তাহার স্থলে কণ্টক বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুষ্করিণী খনন করিলে উহা অল্প দিনের মধ্যে শুকাইয়া যায়। এখানে গোলাপের বাগান প্রস্তুত করা আর মরুভূমিতে পুষ্পোদ্যান স্থাপন করা সমান। আমি তোমাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি, এই দেশে ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না? নরনারী বালক বৃদ্ধ যুবা এ দেশে এক সময়ে ভক্তিরসের আস্বাদ পাইয়াছেন কি না? যদি এ কথা সত্য হয় তবে জানিও, এ ঘরে লোকে প্রচুর পরিমাণে প্রেম ও আনন্দ লাভ করিবে। আজ এই মন্দিরে এই প্রথম বক্তৃতা হইল, তোমরা ঋষি হইবে ভক্ত হইবে। ঋষি ও ভক্তের ভাবে 'প্রভু, কোথায়' বলিয়া আনন্দে তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরিবে। তাঁহার নিরাকার শ্রীচরণ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমাগত আনন্দ বাড়িবে, পুণ্য বাড়িবে এবং সে অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে ক্ষুধা বাড়িবে। আজ আমরা যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি, এই জাতির ইহা আদি ধর্ম্ম; আজ আমরা যে দেবতার পূজা করিতেছি, প্রাচীনেরা এই দেবতার পূজা করিতেন। আর কেন ভাই নিরাকার ঈশ্বরের

* নিরাকারে ভক্তি ইহা এ দেশে অপ্রসিদ্ধ। গাজীপুরের পবনাহারী বাবার নিকটে এক জন পণ্ডিত এক দিন বলিতেছিলেন, ভক্তি কেবল সাকার পূজাতেই হইতে পারে ('রূপং বিনা মহেশানি ন হি ভক্তিঃ প্রজায়তে')। তদুত্তরে যোগী পবনাহারী ভাবে গদগদ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কেশব বাবা যে কথা বলেন সে অন্য দেশের; শাস্ত্রের অতীত।'

পূজা প্রচার করিতে ক্ষান্ত থাক। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে স্বতঃপরতঃ ঈশ্বর-সাধকের দল বৃদ্ধি কর। এই দল বাড়িলে এখন গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে যে দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বিমোচন হইবে, আহ্লাদ আনন্দ বাড়িবে। আজ আমরা কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি? যে বন্ধুর নিমন্ত্রণে আসিলাম তিনি ধন্য হইলেন এবং আমার পক্ষে এ নিমন্ত্রণ সামান্য নিমন্ত্রণ নহে। এই ক্ষুদ্র গ্রামে দয়াময় পিতা এমন একটি সুন্দর সুগঠিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। লোক নাই, অথচ ভাবী অভাব জানিয়া তিনি ইহা স্থাপন করিলেন। এখানে তাঁহার কথামৃত পান করিয়া যদি দুইটি তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা শান্ত হয় তবে কত লোক সেই রস আস্বাদ করিবার জন্য আসিবে; প্রভু দয়াময়ের নামে গ্রামের সমুদায় দুঃখ শোক চলিয়া যাইবে।

আজ আমরা এখান হইতে কি শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া যাইব? মানিলাম গ্রামে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, জ্বর রোগের অত্যাচার আছে। একবার সকলে মিলিয়া ব্রহ্মনামামৃত পান কর দেখি সকল দুঃখ যায় কি না? সকলের মনের সাধ পূর্ণ হয় কি না? আজ দশ পনর কুড়ি বৎসর হইল আমরা সেই প্রাণের ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, কত সুখ শান্তি পাইয়াছি। যদি না পাইতাম, সেই সুখের কথা বলিতে এত দূর আসিতাম না। একবার প্রেমিক হইয়া হরিনামের রসাস্বাদ গ্রহণ কর, তাঁহার চরণ বক্ষে ধারণ কর, দেখিবে অল্প দিনের মধ্যে কি হয়। এ ধর্ম্ম শুষ্ক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে। বক্ষে হরির শোভা দেখিবে, মহাপ্রভুকে হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে, দেখিবে এমনই আনন্দরস উথলিয়া উঠিবে, সেই আনন্দে সমুদায় সংসার ডুবিবে সমুদায় পৃথিবী ডুবিবে। সেই প্রভুর নিকটে গেলে যেরূপ মিষ্ট বচন শুনিতে পাইবে এমন আর কোথায়ও শুন নাই। তিনি তোমাদিগকে হাতে ধরিয়া সত্যের পথে লইয়া যাইবেন। যদি পথ হারা হও 'গুরো! পথ হারা হইয়াছি' এই কথা বলিলে তখনই সদ্গুরু ভ্রম হইতে রক্ষা করিবেন। সংসার উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া 'প্রভো! কোথায় রহিলে' বলিয়া ডাকিলে অমনি তিনি সমুদায় তাপ নিবারণ করিবেন। দশ জন ভক্তের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে চাহিলে প্রভু তাহাই করিয়া দিবেন। শাস্ত্র গুরু সাধুসঙ্গ বৈরাগ্য যাহা কিছুর প্রয়োজন কিছুরই অভাব থাকিবে না। পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী

হইতে হইবে না। একাকী ডাকিতে চাও ডাক, ক্রমে স্ত্রীও তোমার সহধর্ম্মিণী হইবেন। একাকী ডাকিয়া কষ্ট নিবারণ হইবে, গৃহের সকলে মিলিয়া প্রভুর নিকটে আসিলে তাঁহার পরম মঙ্গলময় ক্রোড়ে সকলে সুরক্ষিত হইয়া শান্তি পাইবে। সকলের এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। এক জন দশ জন ক্রমে শত শত জন এই স্থানে ঈশ্বরের কথা শুনিবে। এখানে যেমন মন্দির স্থাপিত হইল এইরূপ স্থানে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক। মন্দিরের নিশান আজ সকলকে ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ডাকিতেছে। সেই ঈশ্বরের চরণে আশ্রিত হইলে ইহলোকে কল্যাণ পরলোকে সদগতি হইবে"

অপরাহ্নে তিনি সাধারণ লোককে যে উপদেশ দেন আমরা তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

"হে ঈশ্বর সন্তানগণ! হে মনুষ্য সন্তানগণ! ঈশ্বরের ধর্ম্ম কথা শুনিবার জন্য তোমরা এখানে আসিয়াছ, মনোযোগ দিয়া শুন। ধর্ম্মের কথা শক্ত কথা নয়, সহজ কথা। ধর্ম্মের এমন সহজ উপায় আছে, যাহা সকলে সাধন করিতে পারে। তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণের দিক্ দিয়া দেখিলে ধর্ম্ম বড় কঠিন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ভক্তি ও বিশ্বাসের দিক্ দিয়া দেখিলে উহা সহজ। ঈশ্বরের সূর্য্য তোমাদের মস্তকের উপরে ঈশ্বরের আকাশ তোমাদিগকে ঘেরিয়া আছে; ঈশ্বরের বৃষ্টি তোমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছে; ঈশ্বরের গঙ্গা চলিতেছে; ঈশ্বরের হিমালয় মেঘ সকলকে ভেদ করিয়া মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে, ফুলের গন্ধ লইয়া বায়ু চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে, গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে, মনুষ্যের শরীর সুস্থ করিয়া চলিতেছে। মানুষ কেন নিরাশ হও? কেন বল ঈশ্বরের ধর্ম্ম বন্ধ হইয়াছে. ঈশ্বর আর এখন অবতীর্ণ হইয়া কথা কন না; তিনি গরীব বলিয়া সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। একে গরীব তাহাতে মূর্খ, কোন প্রকার শাস্ত্র অভ্যাস করা হয় নাই, তাই বলিয়া কি ঈশ্বর তোমাদিগকে উপেক্ষা করিলেন? একবার ধ্রুবের কথা স্মরণ কর, প্রহ্লাদের কথা স্মরণ কর। ঈশ্বর কি তাঁহাদিগকে শিশু বলিয়া অজ্ঞান বলিয়া দেখা দেন নাই? ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি এখনও এমন দেখা দেন যে ঘোর তপস্যা করিয়াও কেহ তেমন দেখা পায় না। কোথায় শুনিয়াছ, ছেলের

ক্রন্দন শুনিয়া মা উপেক্ষা করিয়াছেন? তোমরা সংসারে ঘোর বিপাকে ডুবিয়াছ, যদি তাঁহার নিকট ক্রন্দন কর, তিনি তোমাদিগকে দেখা দিবেন।

"এখন যে গ্রামে যাই সেই গ্রামেই রোগের কথা যন্ত্রণার কথা। টাকা নাই, সন্তানেরা আহার পায় না। স্বামী স্ত্রীর মন অলঙ্কার দিয়া তুষ্ট করিতে পারেন না। অন্ন অভাবে ঔষধ অভাবে অনেক লোক মরিতেছে। ভদ্র লোকের পরিবারগণেরও দুঃখ। কোথাও ধর্ম্মের গন্ধ নাই। এ যুগ কলিযুগ। সত্য ত্রেতা দ্বাপর চলিয়া গিয়াছে, এখন এই অন্ধকার সময়ে মনুষ্যসন্তানের আর আশা করিবার কিছু নাই, ঈশ্বর নিদ্রিত। কে বলে এখন ঈশ্বর নিদ্রিত? আকাশে ঈশ্বরের চন্দ্র সূর্য্য যেমন আছে ঈশ্বরও তেমনি আছেন, কলিযুগ বলিয়া ঈশ্বরের মৃত্যু হয় নাই। পৃথিবীতে আজও বারি বর্ষণ হইতেছে, আজও ধানের ক্ষেত্রে ধান জন্মিতেছে। ধান্যতৃণকে জিজ্ঞাসা কর 'কে তোমাকে সৃজন করিল?' সে উত্তর দিবে 'আমার ঈশ্বর আমায় সৃজন করিয়াছেন।' ফুলের বাগানে যাও দেখিবে ফুল হাসিতেছে। জিজ্ঞাসা কর তোমাদিগকে কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, না তোমরা আপনি জন্মিয়াছ? তোমাদের এ সৌন্দর্য্য সুগন্ধ কোথা হইতে আসিল? ফুল তখনি তোমাদিগকে উত্তর দিবে, 'আমাদের সাধ্য কি যে আমরা আমাদের সৃজন করি? আমাদের মুখের এ সৌন্দর্য্য এবং সৌগন্ধ যিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন তিনিই দিয়াছেন।' আকাশ হইতে অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি পড়িতেছে, বৃষ্টিকে জিজ্ঞাসা কর, 'তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? তোমরা কি নাস্তিক মেঘ হইতে আসিতেছ?' তখনি তাহারা বলিবে 'না, আমাদের মেঘ নাস্তিক নহে, আমাদের আকাশ কখন নাস্তিক নহে। সাধ্য কি নাস্তিক আকাশ নাস্তিক মেঘ হইতে ভূতলে পড়িব।' দেখ চন্দ্র সূর্য্য দুটী প্রকাণ্ড তেজোময় মশাল জ্বলিতেছে। পৃথিবীর অন্ধকার বিনাশ করিয়া কেমন শান্তি প্রকাশ করিতেছে। সূর্য্য কোথা হইতে আসিল? সূর্য্য কি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিতেছে না? প্রতিদিন প্রাতঃকালে উদিত হইয়া কি ঈশ্বরের জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে না, পৃথিবীর নাস্তিকতা বিনাশ করিতেছে না? চন্দ্র যদি চারিদিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বর্ষণ না করিত, তবে শরীরের কষ্ট শ্রান্তি কে দূর করিত? শ্রান্ত জগৎ কি একেবারে পুড়িয়া যাইত না? ঈশ্বরের নামে লোকে তিরস্কার করিবে, তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবে, এই জন্য কি তিনি এই সকল প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড সাক্ষী রাখিয়া দিয়াছেন? এ সকল দেখিয়াও, হে মনুষ্য, তুমি কেন নাস্তিক হও? কেন বল, সত্য যুগে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে এখন কলি-যুগে আর কিছু হইবে না। এত স্পর্দ্ধা কেন! এত অহঙ্কার! প্রতিদিন যে অন্ন আহার করিতেছ জিজ্ঞাসা করি, উহা কোথা হইতে আসিল? বলিবে আমি পরিশ্রম করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, বাজার হইতে চাউল কিনিয়া আনিয়াছি, রন্ধন করিয়াছি, নিজ হস্তে তুলিয়া খাইয়াছি। মানুষ কি বলিলে? এই কি তোমার বুদ্ধি? তুমি সকল করিলে? কোন্ রাজা জমীদার নরপতি আপনার চেষ্টায় শরীর রক্ষা করিতে পারে? শরীরের রক্ত কি তোমার দ্বারা চলে? যদি এক মিনিট ঈশ্বরের শক্তি ইহাতে না থাকে, এখনি সকল বন্ধ হইয়া যায়, এক মিনিটে সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়। বাঁচিয়া আছ কাহার জন্য? তুমি জ্ঞানী হইলে, বুদ্ধিমান্ হইলে, সে জ্ঞান সে বুদ্ধি কাহার শক্তিতে? এই যে দক্ষিণ বাহু, ইহা কি ব্রহ্মের শক্তি বিনা বাড়াইতে পার? অন্ন মুখে দিবে, হাত উঠাইবে কি প্রকারে? পদে পদে শক্তি চাই কিন্তু শক্তি বলিতে আর কি আছে? সেই এক মূল শক্তি ঈশ্বর আছেন।

"ভক্তিভরে পাঁচ জনে মিলিয়া ডাকিলে তিনি মন্দিরে দেখা দেন, আবার একাকী নির্জ্জনে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হন। চক্ষু মুদ্রিত করিলে যেমন তাঁহাকে দেখিবে, চক্ষু খুলিয়াও তেমনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। অপর মানুষ সেখানে কিছু দেখিল না, কিন্তু তুমি তোমার প্রাণের হরিকে দেখিলে। যদি এরূপ হয় তবে আমার সকলি দেখা হইল। আমার প্রাণের বন্ধু পিতা মাতা রাজা প্রভুকে যদি দেখিলাম তবে আর কি দেখিবার অবশেষ থাকিল? হরি আমার বিষয়, হরি আমার আসল জিনিষ। যখন তাঁহাকে দেখিলাম তখন এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, ইঁহাকে ছাড়িয়া সংসারে ফিরিয়া যাইব কি প্রকারে? খুব কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে তিনি আপনি বদ্ধ হইলেন; আরো আমার পরমানন্দ হইল। অন্তরে বাহিরে হরি আমায় ঘেরিলেন। চক্ষু বন্ধ করিয়া প্রাণের ভিতরে তাঁহাকে দেখিলাম, চক্ষু খুলিয়া চারিদিকে তাঁহাকেই দেখিতে পাইলাম। আমার প্রাণের কত আরাম হইল। সূর্য্য চন্দ্র বৃক্ষ লতায় আমার হরি, মনের ভিতরে হরি, সর্ব্বত্র হরির মহাস্য মুখ। এ সব মিথ্যা, হরিই সত্য। মনের মধ্যে যিনি তাঁহাকে

দেখবেন তিনিই বাঁচিবেন। প্রতিদিন হরিনামসুধা পান কর; অন্ততঃ দিনের মধ্যে ৩।৪ বার তাঁহার নাম কর, ভাবিতে হইবে না। এমনি পেটুক হইবে যে আর সে নামসুধা পান না করিয়া থাকিতে পারিবে না। কৈ সে নাম কৈ? সে নাম লোকে সাধন করে কৈ? একবার তোমরা সকলে সেই নাম কর, সেই নাম সাধন কর। এই নাম করিতে হইলে কি করিবে? মিথ্যা কথা কহিবে না, চুরি করিবে না, হিংসা করিবে না, কাহাকেও ঠকাইবে না, পরের স্ত্রীর প্রতি মন্দ দৃষ্টিতে তাকাইবে না, মনে মনেও ব্যভিচার করিবে না; সকলের প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিবে। চরিত্র মন্দ হইলে; চোর হইয়া হরিনাম করিলে নামের ফল দেখিতে পাইবে না। বরং এ প্রকার নামের অবমাননা করিলে মৃত্যু হইবে। অন্যের প্রতি দয়া করিতে গিয়া তোমাদিগের দানের আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। অমুক স্থানে একটী বিধবা আজ তৃষ্ণায় কাতর। যাই প্রভু আজ্ঞা করিলেন 'যাও অমুক বিধবাকে জল দাও' অমনি সে আজ্ঞা শুনিয়া তাহার মুখে জল দিলে তোমার রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয় হইল। একটি অসহায় শিশু রৌদ্রের আঘাতে মৃত প্রায়, রাস্তায় পতিত, শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে প্রাণে বাঁচাইলে তোমার পুণ্যের অবধি রহিল না। এইরূপে ঈশ্বরের ভক্ত হইয়া ঈশ্বরের চাকর হইয়া যাহা তিনি করিতে বলেন তাহা করাই সার সত্য ধর্ম্ম, আর যাহা কিছু সকলি অসার এবং মিথ্যা। তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া বহু শাস্ত্র পড়িয়া সাধু হইবে তাহা নহে। শত শত তীর্থ ভ্রমণ করিলে শরীর মন পবিত্র হইবে তাহা নহে। মনে যদি পাপ থাকে বাহিরে তীর্থভ্রমণ বৃথা, বহু শাস্ত্র পাঠ বহু তর্ক নিষ্ফল। যদি সব ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া হরিনাম কর, তবে নিশ্চয় তাঁহাকে পাইবে। ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহার নাম কর। ওগো আমি বড় সাধু হইয়াছি, বড় উপাসক হইয়াছি, এইরূপ ধূমধামে দরকার নাই। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি তোমার প্রাণের ভিতরে দেখা দিবেন। তথায় স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সকল আমার, ইহা আর ভাবিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের যে ভক্ত হয় ঈশ্বর তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'তাহার সকল ভার মাথায় করে বই' 'গাভী যেমন বৎস পাছে থাকে সদা কাছে কাছে আমার তেমনি ভক্ত সঙ্গে থাকি সদা তেমনি করে।'

"যে কুঁড়ে ঘরে বসিয়া আমি পাপী বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে ঈশ্বরেরই নাম

স্বার করিয়াছে, ঈশ্বর তাহার চক্ষের জল মোচন, এবং তাহাকে খুঁজিয়া লইয়া সকল দুঃখ দূর করেন। যাও তোমরা ঘরে গিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার পূজা কর, ভক্তি ফুল তাঁহার চরণে দাও, পরিবার মধ্যে তাঁহাকে ডাক, দেখ এক মাসের মধ্যে দুঃখ দূর হয় কি না? তোমরা স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাই ভগ্নী মিলিয়া সেই করুণাময় ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন কর, ইহকালেই তোমাদের পরম মঙ্গল হইবে। ঈশ্বর উপস্থিত সকলের মনে ভক্তি সঞ্চার করুন, সকলকে শুদ্ধ ও সচ্চরিত্র করুন, সকলের ভার লইয়া সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বারবার তাঁহাকে প্রণাম করি।"

ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্তের চিত্ত চির দিন কেশবচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত। তাঁহার পত্নী ভগিনী কুমুদিনী যখন ঈশ্বরের জন্য বিষম অত্যাচার সহ্য করিয়া পতি কর্ত্তৃক কলিকাতায় আনীত হন, তখন কেশবচন্দ্রের গৃহ তাঁহাকে আশ্রয় দান করে এবং কেশবচন্দ্রের মাতা তাঁহার মাতৃস্থানীয়া হইয়া কত যত্ন করেন। অন্যান্য অনুরাগবন্ধনের বিষয় মধ্যে এ ঘটনাটিতেও ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের চিত্ত কেশবচন্দ্রের সহিত দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র ধনিগৃহের সন্তান। যদি তাঁহার বৈরাগ্যের বাহ্যাড়ম্বর থাকিত তাহা হইলে উহা অনেক লোকের চক্ষে সহজে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইত, কিন্তু কেশবচন্দ্র আপনার বৈরাগ্য সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। ভ্রাতা ক্ষেত্র মোহনের চিত্ত এই সময়ে তাঁহার প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যের পরিচয় পাইয়া নিতান্ত মুগ্ধ হয়। কেশবচন্দ্রকে গোবরডাঙ্গার জমীদার বাড়ীতে গমন করিতে হইবে। ভদ্রবেশে গমন করিবার উপযুক্ত তাঁহার কিছুই ছিল না। দত্তজপ্রদত্তবস্ত্রমধ্যে যে একটী জামা ছিল, তাহা ছিন্ন। কেশবচন্দ্র সূচীকার্য্য দ্বারা সেই জামাটীকে ভদ্রাকার দান করিবার জন্য ক্ষেত্র বাবুর নিকটে সূচী ও সূত্র চাহেন। এই ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সামান্য অন্নপান ভোজনাদিতে কেন প্রবৃত্তি তিনি বুঝিতে পারিলেন। ঘটনাটী সামান্য বটে, কিন্তু উহা তাঁহার মনে এমনি মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে যে, আজও তিনি অতি আহ্লাদের সহিত ঐ কথা বর্ণন করিয়া থাকেন। এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ও এখানে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য। কেশবচন্দ্র গোবরডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে বক্তৃতান্তে সাদর-নিমন্ত্রণে পান ভোজন সমাধা করিয়া ছেঁকড়া গাড়ীতে কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান করেন। এক জন প্রচারবন্ধু অগ্রে পদব্রজে

গোমাতে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অধিক রাত্রিতে কেশবচন্দ্র একা আসিয়া পঁহুছিলেন; প্রচারবন্ধু তাঁহার গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। কেশবচন্দ্র তো কোন কালে কোন লোকের উপরে ভাষায় বা ব্যবহারে প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন না, যিনি সঙ্গী হইলেন তাঁহারও সেই দশা। সুতরাং তাঁহারা উভয়ে ছেঁকড়া গাড়ীর গাড়োয়ানের অনুগ্রহের উপর সম্যক্ নির্ভর করিয়া চলিলেন। গাড়ী ভাল করিয়া চলে না, পথে স্থানে স্থানে বিলম্ব করে; কে আর তাহাদিগকে শাসনবাক্যে সচেতন করে? দত্তপুকুরে আসিয়া পূর্ব্ব গাড়োয়ান অন্য গাড়োয়ানের হাতে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। এ গাড়ী খানি পূর্ব্ব গাড়ী হইতে নিতান্ত অপকৃষ্ট। পথে যাইতে যাইতে প্রচারবন্ধুর সহিত বিবিধ বিষয়ে আলাপ হয়। তন্মধ্যে বন্ধুগণের কল্যাণের জন্য আপনার অধিকার তিনি কি প্রকার সঙ্কোচ করিয়াছেন বিশেষরূপে বলেন। মহিলাগণের সঙ্গে স্বাধীন প্রমুক্ত ব্যবহারে তিনি মনে করেন না যে তাঁহার কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে, কিন্তু কি জানি বা তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহার বন্ধুগণ বিপাকে পড়েন এই ভয়ে তিনি এ অধিকার সঙ্কোচ করিয়াছেন। নারীগণের প্রতি দুষ্টতা প্রকাশ জনসমাজের বিনাশের হেতু, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা তিনি তাহা ভয় করিতেন। তিনি ইহার সঙ্গে ইহাও বলেন যে, সংসারে মান সম্ভ্রমাদি তিনি কোন কালে অন্বেষণ করেন নাই, অপ্রার্থিত ভাবে তাঁহার নিকটে সে সকল আপনি আসিয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে গাড়ী দমদমায় আসিয়া উপস্থিত। সেখানে দত্তপুকুরের গাড়োয়ান তত্রত্য একজন গাড়োয়ানের হস্তে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিল। এই গাড়ীখানি শেষোক্ত আলাপের কথাগুলি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। এত পথ গাড়োয়ানদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়া আসা হইয়াছে; তদ্বিরুদ্ধে কিছু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা হয় নাই, এবার যে গাড়ীখানি মিলিল, উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর, অতি উৎকৃষ্ট, ঠিক বাড়ীর জুড়ী গাড়ীর মত। কেশবচন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়াই বলিলেন, দেখ চাওয়া যায় নাই, এ জন্য কলিকাতাপ্রবেশের পূর্ব্বে ঈদৃশ গাড়ী মিলিল। তাঁহার কন্যা সুনীতি রাজমহিষী, তাঁহার বাড়ীর গাড়ীবারাণ্ডায় সিপাহী পাহারা; ছেঁকড়া ভাড়া গাড়ী লইয়াই সেখানে প্রবেশ করিবার কথা ছিল, কিন্তু দৈবক্রমে সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রহিল।

আমাদের মণ্ডলীর ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে যিনি যাহা অবগত আছেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদিগের নিকটে পাঠাইতে আমরা অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদনুসারে ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন আমরা তাহা সাদরে নিম্নে প্রকাশ করিতেছি;—

"যখন প্রথম কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় হয়, তখন আমরা কতকগুলি যুবক পাঠ্যাবস্থায় উক্ত বিদ্যালয়ে গিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত পরিচিত হই। ইংরাজী শিক্ষা ও বক্তৃতা দিতে তিনি যে এক জন খুব যোগ্য লোক ছিলেন ইহা আমরা সহজেই তখন বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার গভীর চিন্তা-শীলতা তত্ত্বদর্শিতা প্রভৃতি বিশেষ গুণ সকল কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পরে সঙ্গতসভা স্থাপিত হইল। আমরা তাহার সভ্য হইলাম। আমরা একপাঠী কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া একটী সভা করিলাম। তাহার নাম 'ব্রাহ্ম ইণ্টিমেট এসোসিয়েসন'। স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত ও সভ্য ভব্য করা ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান কার্য্য আমরা মনে করিতাম। ঐ সভাতে স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য উন্নতিকর বিষয়ের আলোচনা হইত। বামাবোধিনী পত্রিকার জন্ম এই সভা হইতে হয়। যদিও কেশবচন্দ্র বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশে ও স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে আমাদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ও উৎসাহ দেখাইতেন, কিন্তু পরি-বার মধ্যে লেখাপড়া সভ্যতা ও সুখসচ্ছন্দতার নিমিত্ত আমরা যেরূপ ইচ্ছা করিতাম সেরূপ যত্ন অনুরাগ তাঁহার দেখিতাম না। তজ্জন্য তাঁহার এবং তৎকালের যাঁহারা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া সকল কার্য্য করিতেন, তাঁহাদি-গের বিষয় আমাদিগের সভাতে আমরা সমালোচনা করিতাম। সময়ে সময়ে এজন্য তাঁহাকে কোন কোন বিষয়ে অনগ্রসর মনে করিতাম। বহুকাল পরে যখন তিনি তাঁহার মনের গূঢ় ও উচ্চ মহৎ ভাব সকল মত বিশ্বাসে প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলাম, তাঁহার ঐ সকল গূঢ় ভাবের লক্ষণ কোন কোন বিষয়ে বহু দিন পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

"১৮৬৯ খৃঃঅব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে কেশবচন্দ্র অধিকাংশ প্রচারকগণ সহিত খাঁটুরাগ্রামে প্রচারার্থ গমন করেন। তখন তাঁহাকে এক জন সম্রান্ত কৃত-বিদ্য বক্তা বলিয়া লোকে জানিত। খাঁটুরার যে দত্তবাটীতে তিনি গিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বড় লোকের ন্যায় ভৃত্য দ্বারা তৈল মাখাইয়া স্নান আদি

করান ও খেতপাথর রূপার বাশন প্রভৃতিতে আহারীয় দ্রব্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা হইতে যে সকল প্রচারক ও ব্রাহ্ম বন্ধু গিয়াছিলেন তাঁহাদিগের কাহার সঙ্গে ভৃত্য ছিল; কেশবচন্দ্রের ভৃত্য ছিল না।

"এক দিবস স্থানীয় জমিদারদিগের বাটীতে তাঁহার আহার ও বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ হয়। সেখানে যাইবার জন্য তিনি আমার নিকট ধুতি চাদর ও জামা চাহেন। নূতন ও ভাল কাপড় তখন আমার নিকট না থাকায় আমি উহা দিতে কুণ্ঠিত হইলাম। পরে সামান্য রকমের যাহা ছিল তাহাই আনিয়া দিতে হইল। তিনি তখন আমার নিকট সূচ সুতা চাহিলেন এবং তদ্দ্বারা যাহা সংশোধন করিবার তাহা করিয়া পরিধান করিলেন। পরে উক্ত জমিদার বাটীর কার্য্যান্তে সেই দিবস যখন কলিকাতায় গমন করেন, তখন গাড়ীতে উঠিবার সময় আমাকে ডাকিয়া বলেন, তোমার কাপড় দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই বলিয়া কাপড় খুলিয়া দেন। আমার তাহাতে বড় লজ্জা বোধ হয় এবং সকলের সাক্ষাতে ঐ কাপড়ের কথা উল্লেখ করাতে এক জন প্রচারকও বলেন, 'আঃ, কাপড়ের কথা আর এখানে কেন?'

"যে সময় সঙ্গতে অনুষ্ঠান লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন কার্য্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া কোন অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজে আরম্ভ হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে তিনি সঙ্গতের কোন কোন সভ্যকে তাঁহার কলুটোলার বাটীতে অনুষ্ঠানে পরিবার লইয়া যোগ দিতে বলেন। এক জন অত্যন্ত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও সেই শুভানুষ্ঠানে সস্ত্রীক উপস্থিত হন। তিনি স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া কেশবচন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলেন, ইঁহাদের মধ্যে তুমি আজ কুলীন। তখন দেশাচারের বিরুদ্ধে কোন সংস্কারের কথা উত্থাপন হইলে আমাদের অধিক উৎসাহ হইত। সেরূপ বিষয়ে তাঁহার কোন অমত হইতে পারে ইহা মনেই আসিত না। বিধবা-বিবাহে দলবদ্ধ হইবার নিমিত্ত কতকগুলি মুদ্রিত কাগজ স্বাক্ষর জন্য একদা সঙ্গতে আমাদিগের নিকট প্রেরিত হয়। আমরা সেই কাগজের বিষয় পড়িয়াই আহ্লাদিত হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় কেশবচন্দ্র সেখানে আসিয়া বলিলেন, উহাতে স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও।

আমরা বলিলাম, এমন দেশহিতকর ভাল বিষয়ে আপনার কুন্ঠিতে চিন্তা কি? তিনি বলিলেন, যে কোন প্রকারে বিধবাদের বিবাহ হইলেই কি দেশের উপকার হইবে? ধর্ম্মশূন্য বিবাহের প্রবৃত্তিতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইবে।

"হিন্দু পরিবার হইতে কোন মহিলা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিলে আমরা তাহাকে আনিতে খুব উৎসাহিত হইতাম এবং তাঁহাকে বলিতাম। তিনি স্থিরভাবে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং যদি তিনি বিধবা ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন বুঝিতেন, তাহা হইলে এমন ভাবে কথা কহিতেন যাহাতে আমরা আশানুরূপ উৎসাহ না পাইয়া দুঃখিত হইতাম।

"একটী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসের জন্য স্বজনের নিকট উৎপীড়িত এবং পিতা কর্ত্তৃক গৃহবহিষ্কৃত হন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন। তাঁহার বাটীতে সেই সময় তিনি একবার পীড়িত হন। বৈদ্য চিকিৎসকেরা যেরূপ পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন, কেশবচন্দ্র তাঁহাকে সেইরূপ দ্রব্য খাইতে দিতেন। রোগী সেইরূপ পথ্য পাইয়া মনে করিল ইনি সে কালের কুসংস্কারের রীতি নীতি এখনও সব ছাড়িতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহাকে বলিল, এখনতো আর এরূপ পথ্যের ব্যবস্থা নাই; এখন চিকিৎসকেরা রোগীর ইচ্ছামত যথেষ্ট খাইতে দেন। তিনি বলিলেন, এখানে তাহা হইবে না, এ যে বৈদ্যের বাড়ী।

"যখন আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের ভাব প্রবল ছিল, পৌত্তলিকতা দূষিত দেশাচার প্রভৃতি বিনাশ করা প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান করিতাম, সেই সময় এক দিন কেশবচন্দ্র খাঁটুরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গোবরডাঙ্গার জমিদারদিগের সহিত তোমাদিগের কিরূপ ভাব।' তদুত্তরে আমি বলি যে জমিদারদিগের সহিত আমাদের ভাল ভাব নাই। পল্লীগ্রামের জমিদারেরা প্রজাদিগের উপর যেরূপ অন্যায় অত্যাচার ও আধিপত্য করে তাহাতে আমরা ব্রাহ্ম হইয়া উহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। উহাদের বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা ভিন্ন অন্য কোন লোক কোন বিষয় লিখিতে সাহস করে না, এই জন্য আমাদিগের প্রতি উহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কাগজে লিখিয়া ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কি বিশেষ

উপকার করিতে পারিয়াছ? উহাতে লোকের নিকট সাহস দেখান ও অসদ্ভাব বৃদ্ধি করা হয়, ফল ভাল হয় না। সদ্ভাবে লিখিয়া দোষ সকল সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল হইতে পারে।' যদিও তাঁহার কথা তখন মনঃপূত হয় নাই, কিন্তু তদবধি প্রকাশ্যরূপে কাগজাদিতে লিখিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত হইলাম।"

ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত উপরে যে কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে কেশবচন্দ্রের অতি প্রথম জীবন হইতে যে স্থির ধীর প্রশান্ত ভাব ছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যে কোন দেশসংস্কারের মূলে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরানুরাগ নাই, পবিত্রতার সহিত অভেদ্য যোগ নাই, সে সকল দেশসংস্কারের ব্যাপারে তিনি কি প্রকার দৃষ্টিতে দেখিতেন, এই ক্ষুদ্র স্মৃতিলিপি তাহাও স্পষ্ট দেখাইতেছে। অন্যায়াচারীর প্রতি কঠোর ব্যবহার না করিয়া সদ্ভাব দ্বারা চিত্তপরিবর্ত্তনসাধন যে তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল, ইহাও ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের লেখাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

উৎকট পীড়ান্তে শারদীয় উৎসব প্রতিষ্ঠা।

ঘাঁটুরা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের কয়েক দিন পর কেশবচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। জ্বরের প্রকোপ দেখিয়া প্রথমে অনেকের মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহান্তে দুই তিন দিন তিনি সুস্থ থাকেন। ইহাতে সকলের মনে আশা হয় যে আর জ্বর পুনরাবর্ত্তন করিবে না। এই আশায় ২১ জুলাইয়ের (১৮৭৮) মিরার ব্রাহ্মবন্ধুগণকে আর কোন ভয় নাই বলিয়া আশ্বাস দেন। এ আশ্বাস প্রদান বিফল হইয়া গেল, জ্বরের পুনরাক্রমণে কেশবচন্দ্র একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। ব্রহ্মমন্দিরের ঋণপরিশোধ এবং ট্রষ্টীনিয়োগ জন্য ২৪ সেপ্টেম্বর যে সভা আহূত হইবার বিজ্ঞাপন ৩১ মার্চ্চের মিরারে দেওয়া হয়, সেই বিজ্ঞাপনানুসারে কার্য্য হওয়ার ঘোর প্রতিবন্ধক উপস্থিত দেখিয়া ১৮ আগষ্টের মিরারে সভা স্থগিত রাখার সংবাদ বাহির হইল। এই সময়ে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মগণ আলবর্ট হলে কেশবচন্দ্রের উৎকট পীড়োপলক্ষে একত্র মিলিত হন, এবং বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত প্রেমচাঁদ বড়াল মহাশয়কে তাঁহাদের সকলের সহানুভূতি প্রকাশ জন্য তৎসন্নিধানে প্রেরণ করেন। রোগের চিকিৎসা হইতে লাগিল, অথচ চিকিৎসা দ্বারা প্রশমনের লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পাইল না। সকলের মন ভাবনাচিন্তায় অস্থির। জ্বরের প্রকোপ যদিও তত ছিল না, অল্প অল্প জ্বর চলিতেছিল, তথাপি এই জ্বরে দৌর্ব্বল্য এত অধিক বাড়িল যে, শয্যাত্যাগের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হইল। অনেকের মনের ধারণা এই যে, তাঁহার এই জ্বর মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেজনাঘটিত, এমন কি তাঁহারা কল্পনাযোগে প্রলাপোক্তি পর্য্যন্ত ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা নিয়ত তাঁহার শয্যার পার্শ্বে থাকিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাঁহারা কিন্তু কোন দিন প্রলাপোক্তি শ্রবণ করেন নাই। কঠিন জ্বরের প্রাদুর্ভাবে প্রলাপোক্তি ঘটা কিছু অদ্ভুত বিষয় নহে, কিন্তু যখন তাহা হয় নাই তখন হয় নাই বলাই ঠিক। আমাদের মনে হয় বর্ষার অন্তে ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত

দেশ খাঁটুরায় গমন করাতে তিনি তত্রত্য ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। *সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রমানাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের মত এই যে, স্বহস্তে রন্ধনাদি কৃচ্ছ্র সাধনে তাঁহার ঈদৃশ পীড়া উপস্থিত। হইতে পারে বিবিধ কারণে পূর্ব্ব হইতে তাঁহার দেহ ম্যালেরিয়ার প্রভাব অতিক্রম করিবার উপযুক্ত ছিল না, তাই তদ্দ্বারা অভিভূত দেশে গমন করাতে তিনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাদৃশ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

যদি কেশবচন্দ্রের কোন দিন জ্বরের মধ্যে প্রলাপোক্তি হয় নাই তাহা হইলে ঈদৃশ কথা চারিদিকে রটিল কেন? রটিবার একটি বিশেষ কারণ আছে। নিপুণ চিকিৎসাতেও জ্বর ও দৌর্ব্বল্যের লাঘব না হইয়া বরং দিন দিন জ্বরে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন যখন তিনি দেখিলেন, তখন ঔষধ সেবনের প্রতি তিনি বীতরাগ হইলেন। তাঁহার অন্তরে এই কথা উঠিল যে, ঔষধসেবনে কিছু হইবে না, গঙ্গায় নৌকায় বেড়াইলে তবে এ রোগের প্রশমন হইবে। এই কথা তাঁহার মনে এমনই দৃঢ়মুদ্রিত হইয়াছিল যে, তিনি ভাগীরথীতে নৌকায় বেড়াইবার নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর যে প্রকার দুর্ব্বল, শয্যা হইতে উত্থান করিবার সামর্থ্য নাই, তাহাতে একপ অবস্থায় গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাঁহাকে ভাগীরথীতীরে লইয়া যাওয়া কোন মতে সম্ভবপর নহে। যদিও বা কথঞ্চিৎ সম্ভব হয়, তথাপি কিঞ্চিৎ নীরোগ ও সবল করিয়া না লইয়া নৌকায় ভ্রমণ কিছুতেই স্বাস্থ্যকর হইবে না, এই বিশ্বাসে স্বজন আত্মীয়গণ বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশবচন্দ্রের অন্তরাত্মার কথার প্রতি চির দিন অক্ষুণ্ণ নির্ভর ছিল, এস্থলে বাধা দিলে যে তিনি নিতান্ত অধীরতা, অস্থিরতা এবং নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিবেন, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এখনই আমায় নৌকায় লইয়া যাইতে হইবে, এই বলিয়া যতই তিনি প্রমত্ত ভাবে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ততই অনেকের মনে হইতে লাগিল, ঘোর প্রলাপ উপস্থিত। কেশবচন্দ্র বন্ধুবর কালীনাথ বসু পোলিস ইনস্পেক্টরের (পরে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) শরণাপন্ন হইলেন, এবং এই উপায় অবলম্বন করা অত্যন্ত শ্রেয়ঃ-সাধক কেশবচন্দ্র প্রশান্ত ভাবে তাঁহাকে এমনি বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার বন্ধুর হৃদয়ে তাঁহার কথার প্রতি অণুমাত্র অনাস্থা উপস্থিত হইল না, এবং তিনি কেশবচন্দ্রকে আশ্বস্ত করিয়া সমুদায় আয়োজন করিয়া দিলেন। ডাক্তার দুর্গাদাস কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট

তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, কি জানি বা রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় 'বাই নাম স্যালেসাই' ঔষধ লইয়া তিনি রোগীর অনুবর্ত্তন করিলেন। কেশবচন্দ্রের পত্নী তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন। শুশ্রূষা কার্য্যে ব্যাপৃত ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু সঙ্গে গেলেন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের আবশ্যক মত অনেক বিষয়ের আয়োজন করিতে হইত, এজন্য কলিকাতাতেই তিনি স্থিতি করিলেন। বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে গিয়া নৌকায় দেখা করিয়া আসিতেন। ডাক্তর অন্নদাচরণ খাস্তগিরি মহাশয় তৎকালে কাশীপুরের হস্পিটালে ছিলেন। মনে হয় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রভাব-জ্ঞানে তিনি অধিক মাত্রায় কুইনাইন দিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু কেশব চন্দ্র সে ঔষধ সেবন করিলেন না। ডাক্তার দুর্গাদাসও বলরক্ষক কিঞ্চিৎ ঔষধ দান ভিন্ন আর কিছু রোগীকে দেওয়া উচিত নয় বিশ্বাসে সে ঔষধ সেবন না করিবার পক্ষে কেশবচন্দ্রের সহায় হইলেন।

এ সময়ে প্রতিবাদকারিগণের পত্রিকার সংবাদস্তম্ভে লিখিত হয়, "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্রসেন উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। তাঁহার আরোগ্য জন্য সকল ব্রাহ্মের সহানুভূতি প্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।" এ ঘোর আন্দোলনের সময়ে ঈদৃশ কথাগুলির প্রতিবাদ হইবে না কিরূপে আশা করা যাইতে পারে। উহার যে প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহা সেই পত্রিকাই এইরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পীড়া শান্তির জন্য আমরা ব্রাহ্মগণকে সহানুভূতি প্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, মফস্বলস্থ কোন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদের দুইটি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, (১) এক জনের পীড়া শান্তির প্রার্থনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য কিরূপে হইবে? (২) কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে অবতারবাদ প্রভৃতি আনিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা করা ব্রাহ্মগণের সাধারণ কর্ত্তব্য কিনা?" এই দুই প্রশ্ন এইরূপে মীমাংসিত হইয়াছে, "প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক মঙ্গল ভিন্ন অন্য প্রকার প্রার্থনা বৈধ কি না এ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ আছে সত্য। কিন্তু আমরা যত দূর বুঝি এই বলিতে পারি, যে যখন অন্যের শারীরিক পীড়ার জন্য স্বভাবতঃ শুভ ইচ্ছার উদয় হয় এবং সেই ইচ্ছা ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করিলে আত্মপ্রসাদ ভিন্ন আত্মগ্লানি

উপস্থিত হয় না, তখন তাহাকে অবৈধ কেন বলিব? দ্বিতীয়তঃ কেশব বাবু যদিও কোন কোন কার্য্যবশতঃ ব্রাহ্মসমাজের অগৌরব বা অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার এত কালের পরিশ্রম ও ব্রাহ্মসমাজের হিতার্থ চেষ্টা বিস্মৃত হওয়া ঘোরতর অকৃতজ্ঞতার কার্য্য। যে ব্রাহ্মগণ শত্রুদিগের প্রতিও ভালবাসা প্রকাশের উপদেশ দেন, তাঁহারা সমাজের এক জন পরমোপকারী, পুরাতন বন্ধুর দুঃখে কি সমদুঃখিতা প্রকাশ ও তাঁহার মঙ্গল জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন না? তাঁহার কোন ভ্রম বা প্রমাদবশতঃ তিনি যদি ব্রহ্মসমাজের অনিষ্টকারী হইয়া থাকেন, তাঁহার শুভ প্রার্থনা আমাদিগের অধিকতর কর্ত্তব্য।"

কেশবচন্দ্র গঙ্গার বক্ষে নৌকায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১২ আগষ্ট সোমবার তাঁহার পীড়া কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়া দু দিন পরেই স্বাস্থ্যপ্রত্যাবৃত্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদবস্থায় তিনি ৪ সংখ্যক কাশীপুরস্থ শিলবাবুদের উদ্যানবাটীতে নৌকা হইতে উত্তীর্ণ হন। এখনও তিনি নিরতিশয় দুর্ব্বল। রজনীতে ভাল করিয়া নিদ্রা হয় না তবে জ্বরের বিচ্ছেদ হইয়াছে। এই সময় ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে চিকিৎসার্থ তথায় লইয়া যাওয়া হয়। গঙ্গায় পরিভ্রমণে যে উপকার হইয়াছে, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই বলেন। অনেক বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে যান, এজন্য তিনি সাবধান করিয়া দেন, এখন কেশবচন্দ্রের বিশ্রামের প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে যেন কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়। এক পক্ষ কাল উদ্যানবাটীতে স্থিতি করিয়া ২৮ আগষ্ট তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। এখনও তাঁহার দেহ কার্য্যক্ষম হয় নাই। ১৫ সেপ্টেম্বর ব্রহ্মমন্দিরে একটী প্রার্থনামাত্র এবং পর রবিবার আরাধনা পর্য্যন্ত তিনি করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর (১৭ আশ্বিন) রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা উপদেশ উভয় কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করেন। এ দিন তিনি দুর্গোৎসবোপরি নিম্ন লিখিত উপদেশ দেন।

"শরৎকালে বঙ্গদেশ দুর্গোৎসবে প্রমত্ত হন। শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত এই সময়ে হিন্দুগণ দুর্গাপূজা করেন। ব্রাহ্ম, নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, মহোৎসবই বটে। চারিদিকে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, নারী সকলেই উৎসবের মত্ততায় উন্মত্ত। হিন্দুদিগের এই শ্রেষ্ঠতম উৎসবদর্শনে ব্রাহ্মের চিত্ত উদ্বেলিত

হইল। তিনি এই উৎসবের অসারাংশ পরিত্যাগ করিয়া সারাংশ গ্রহণ করিলেন; তুষ পরিত্যাগ করিয়া শস্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মের হৃদয় হিন্দু-হৃদয়। হিন্দুদিগের উৎসব হইতে তাঁহার হৃদয় ভাল অংশ গ্রহণ করিল। তিনি তাঁহার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই উৎসবের সময় তুমিও কি হিন্দুদিগের ন্যায় ভক্তিতে প্রমত্ত হইতে পার?' হৃদয় হইতে তিনি সায় পাইলেন। বিবেকী ধীর ব্রাহ্ম এই শারদীয় উৎসব অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন যথার্থই দুর্গতিহারিণীর পূজা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি বলিলেন, যাঁহার পূজা করিলে সকল দুর্গতি দূর হয়, আমি কেন তাঁহার পূজা না করিব? ব্রাহ্ম দেখিলেন দুর্গতিহারিণীর পূজা করিলে যে কেবল দুর্গতি দূর হয় তাহা নহে; কিন্তু যখন ভক্তের হৃদয়ে দুর্গতহারিণী প্রকাশিত হন, তিনি তাঁহার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গণেশ কার্ত্তিক প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া আসেন। ব্রহ্ম তাঁহার সমুদয় স্বরূপগুলি লইয়া সাধকের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। পাপ দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ দিতে যিনি আসেন, তিনি সম্পদ্, বিদ্যা, কল্যাণ এবং শ্রী সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হন। ঈশ্বর কি শক্তি সম্পদ্‌বিহীন হইয়া অথবা অজ্ঞান অকল্যাণ লইয়া আসিতে পারেন? লক্ষ্মী ঈশ্বরের সম্পদ্, যে সম্পদ লাভ করিলে সকল ধনকে তুচ্ছ করা যায়, যে ধনের দ্বারা মন প্রসন্ন হয় অর্থাৎ আত্মার মধ্যে যথার্থ সন্তোষ, প্রসন্নতা লাভ করা যায়, ঈশ্বর সেই ধন, সেই লক্ষ্মীকে লইয়া ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত হন। পতিতপাবন যখন পতিতকে উদ্ধার করিতে আসেন, তখন তাঁহার এক হস্তে ধন এবং অন্য হস্তে বিদ্যা লইয়া উপস্থিত হন। যিনি সকল জ্ঞানের আকর সেই যথার্থ বিদ্যা সত্য সরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বর জ্ঞানের জ্যোতি বিকাশ করিতে করিতে সাধকের ঘরে আসেন। এইরূপে যখন ব্রহ্মসাধকের ঘরে সম্পদ এবং বিদ্যা উভয়ই প্রকাশ করেন তখন তাঁহার যথার্থ কল্যাণ হইতে লাগিল এবং কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যেমন দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গণেশ কার্ত্তিক, তেমনি নিরাকার দুর্গতি-হারিণীর এক দিকে সম্পদ্ এবং সৌন্দর্য্য, অন্য দিকে বিদ্যা এবং কল্যাণ। নিরাকার ব্রহ্মসহবাসে ভক্ত যে কেবল শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং কল্যাণ লাভ করেন তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার হৃদয় শীঘ্রই শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। সেই

দুর্গতিহারিণী হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে যেমন সকল দুঃখ-দুর্গতি এবং অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়, তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুখ, শান্তি এবং সৌন্দর্য্যের সমাগম হয়। কল্যাণদাতা সুন্দর ঠাকুর ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত, সুতরাং ভক্ত যাহা করেন তাহা হইতে কল্যাণ এবং সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠাত হয়। যিনি যথার্থ সৌন্দর্য্য, যাঁহাকে দেখিলে প্রেমের সঞ্চার হয়, মন তাঁহারই পূজা করিতে চায়, কোন ভয়ানক দৈত্যের পূজা করিতে কাহারও রুচি হয় না। দুর্গার আজ্ঞাধীন সিংহ অসুরকে বিদীর্ণ করিতেছে, সেইরূপ যখন যথার্থ দুর্গতিনাশিনী মনুষ্যের মনে আপনার নবীন স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করেন, তখন তাঁহার অতুল প্রভাব এবং অসীম শক্তি ও তেজ মনের সমস্ত আসুরিক ভাব দলন করে। বস্তুতঃ তখনই দুর্গতিহারিণীর প্রকৃত পূজা হয় যখন অসুর বধ হয়। সমস্ত দেশ যে উৎসবে মত্ত হইয়াছে ইহার ভিতরে অবশ্যই গভীর উৎসব আছে, ব্রাহ্মণ, তোমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম কর। বাহ্যিক মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের ভাব দর্শন কর। মিথ্যার মধ্যে সত্য আবিষ্কার কর। মিথ্যাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হও। অসত্য ত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ করিবার এই সময়। হিন্দুদিগের এই উৎসবে একাধারে পাঁচটি ভাব লাভ করিবে। সম্পদ, বিদ্যা, কল্যাণ, শ্রী এবং পরিত্রাণ। যে পূজাতে কেবল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন প্রেমিক এবং শ্রীসম্পন্ন হইল, তাহা পূর্ণ পূজা নহে। যে পূজাতে বল, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য্য এ সমুদায় লাভ করা যায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুবাসনা দুর্মতিরূপ অসুর বধ হয়, সেই পূজাই প্রার্থনীয়। অতএব, ব্রাহ্মগণ, যিনি দুর্মতি দূর করেন, সেই দুর্গতিহারিণীকে এই সময়ে ডাক। দুর্গতিনাশন ঈশ্বরের পূজা কর। হিন্দুদিগের এই সাংবৎসরিক উৎসবের সময় নানা প্রকার অসাধুভাব প্রকাশ পাইবে বটে, কিন্তু আবার অনেকের মনে সংসার এবং ধর্ম্মসম্পর্কে নানাবিধ সাধুভাব সকলও সঞ্চারিত হইবে। এস, আমরাও সেই সকল সাধুভাব লইয়া সেই দুর্গতিহারিণী জননীর পাদপদ্ম পূজা করি। নিরাকার হৃদয়সিংহাসনে নিরাকার দেবতাকে বসাইব। লক্ষ্মীর ভাব, সরস্বতীর ভাব, গণেশের ভাব, কার্ত্তিকের ভাব সকলই গ্রহণ করিব। ভারতবর্ষে অচিরেই সেই শুভদিন আসুক যখন মূর্ত্তি পূজা চলিয়া গিয়া নিরাকার সুন্দর ব্রহ্মপূজা হইবে। সেই নিরাকার

জনণীয় পূজা করিয়া এস প্রিয় দেশকে পাপ, পৌত্তলিকতা হইতে উদ্ধার করি। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার নিরাকার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে অধিকার দিন।”

এবার কেশবচন্দ্র ভাদ্রোৎসব করিতে পারেন নাই। তাঁহার উৎসবতৃষ্ণা অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে। তিনি নূতন প্রণালীতে উৎসব না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? শরৎকালে এ দেশ উৎসবময়, ব্রাহ্মসমাজ এ সময়ে উৎসববিহীন থাকিবেন, ইহা কখন দেশোচিত ভাব নহে। উৎসব করিতে হইবে স্থির হইল। পূর্ণিমাতিথি শারদীয় উৎসবের জন্য স্থির হইল। কেশব ভাগীরথী বক্ষে কয়েক দিন বাস করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট; সেই বক্ষে ব্রহ্মপূজা করিবার জন্য উৎসুকচিত্ত। ভাগীরথীর শোভা পূর্ণিমা তিথিতে। পূর্ণশশী ও ভাগীরথী নদী উভয়ের পূর্ণ শোভা দর্শন করিয়া পূর্ণব্রহ্মের মহিমাকীর্ত্তন করা হইবে, সকলের চিত্তে এই বাসনা। ধর্ম্মতত্ত্ব ব্রাহ্মগণের এই হৃদয়ের ভাব অনুবর্ত্তন করিয়াই বলিয়াছেন “পূর্ণ ব্রহ্মে উৎসব পূর্ণ, অপূর্ণ তিথিতে তাহার সমাধান হয় না, সে উৎসব চির পূর্ণিমাময়।” উৎসব করা স্থির হইলে ১৬ই আশ্বিন ধর্ম্মতত্ত্বে এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়;—“আগামী পূর্ণিমা দিবসে ভাগীরথীর উপরে নৌকায় শারদীয় উৎসব হইবে। তজ্জন্য ছয়খানা বৃহৎ নৌকা ভাড়া করার প্রস্তাব হইয়াছে। উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিবেন, ব্যয়ানুকূল্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট এক টাকা করিয়া চাঁদা ধরা গিয়াছে।” ২৫ আশ্বিন (১০ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার প্রাতে ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত হন। নিয়মিত উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, সেই উপদেশের শেষাংশ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“দুঃখের পর সুখ, অনুতাপের পর আত্মপ্রসাদ, উত্তাপের পর বৃষ্টি, শারদীয় উৎসবের এই শাস্ত্র এই অর্থ। শারদীয় উৎসবের এই শোভা গগন এবং পৃথিবী উভয়কেই মনোহর করে। আহা ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা!! কি অসীম জীববাৎসল্য!! তাঁহার কৃপাতে শরৎকালের প্রতিদিনে প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ্মী পূজা হইতেছে। জীববৎসল ঈশ্বর যখন দেখিলেন যে, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পৃথিবীর বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে, তিনি আকাশের মেঘকে আজ্ঞা দিলেন, মেঘ, তুমি বন্ধুভাবে পৃথিবীর বক্ষে তোমার শীতল বারি বর্ষণ কর। মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে কেবল সুশীতল করিল তাহা নহে; কিন্তু

পৃথিবীর উর্ব্বরতা অথবা উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন করিয়া জীবদিগের প্রাণরক্ষার জন্য রাশি রাশি শস্য সমুৎপন্ন করিল। ধর্ম্মরাজ্যেও এইরূপ স্বর্গ হইতে বারি বর্ষণ হয়। ভক্তবৎসল পরিত্রাতা, দুর্গতিহারিণী জগন্মাতা যখন দেখিতে পান যে, মনুষ্যসকল পাপতাপে অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার দুঃখী পুত্র এবং দুঃখিনী কন্যাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে কৃপাবারি বর্ষণ করেন। পৃথিবীর জলে পৃথিবী বাঁচিতে পারে না। মনুষ্যের অসার প্রেমবারি পান করিয়া মনুষ্যের পরিত্রাণ হয় না। স্বর্গ সদয় না হইলে পৃথিবীর দুঃখ দূর হয় না। কবে উত্তপ্ত ব্রাহ্মসমাজের মস্তকে স্বর্গ হইতে কৃপাবারি বর্ষিত হইবে। কবে যথার্থ লক্ষ্মীশ্রীর সমাগমে প্রচুর ধনধান্য সুশোভিতা শারদীয়া প্রকৃতির ন্যায় ব্রাহ্মসমাজও হাস্য করিবেন? ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার পাদপদ্মরূপ অক্ষয় ধনরত্ন লাভ করিয়া চিরসুখী হই।"

মধ্যাহ্নকালের পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া ভাগীরথীতীরে গমন করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "মধ্যাহ্নকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে সকলে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় পত্র পুষ্প ও ব্রহ্মনামাঙ্কিত-নিশান-পরিশোভিত সুবিচিত্র তরণীযোগে সমবেত বন্ধুগণ নদীবক্ষে ভাসিলেন। যে সকল বন্ধু পশ্চাতে ছিলেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র তরীযোগে উপস্থিত হইয়া কেহ কেহ বৃহত্তরী আরোহণ করিলেন। নৌকাতে সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, বন্ধুবর্গের সুমিষ্ট সম্ভাষণ চলিতে লাগিল। তরণী উত্তরাভিমুখে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলিল। প্রায় চারি ঘণ্টায় দক্ষিণশ্বরে সকলে পঁহুছিলেন। তথায় বিশ্রামান্তে সায়ংকালে ভাগীরথী-বক্ষে তরণীর উপরে সুস্নিগ্ধ পূর্ণচন্দ্রের মেঘনির্ম্মুক্ত জ্যোৎস্নায় ব্রাহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ সঙ্গীত তদনন্তর অষ্টোত্তরশত নাম পাঠ হইয়া......উপাসনা ও উপদেশানন্তর প্রার্থনা হইয়া উৎসব শেষ হইল।" প্রতিবাদকারিগণ এই শারদীয় উৎসব এবং ব্রহ্মমন্দিরে দুর্গোৎসবোপরি প্রদত্ত উপদেশ উপলক্ষ করিয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। এ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যে যুক্তিমূলক সে যুক্তি কত দূর সঙ্গত, * তাহা পাঠক হৃদয়ঙ্গম

* ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাংশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত যুক্তির দিকে দৃষ্টি করিলে তাহা হইতে এই সার উদ্ধৃত হয়; পৌত্তলিকগণ যে সকল দেবতার পূজা করেন, সেই

করিবেন বলিয়া উপরে দুর্গোৎসবোপরি প্রদত্ত উপদেশটি আমরা দিয়াছি, ভাগীরথীবক্ষে যে উপদেশ হয় সেটি দীর্ঘ হইলেও নিম্নে দিতেছি।

"প্রাতঃ কালে শরৎসূর্য্য আমাদিগের শারদীয় উৎসবের সাক্ষী হইয়াছেন, শরৎকালে শরচ্চন্দ্র আমাদিগের সায়ঙ্কালীন শারদীয় উৎসবের সাক্ষী হই-তেছেন। প্রাতঃ কালে স্থলে উৎসব ভোগ করিয়াছি, সায়ঙ্কালে জলে উৎসব ভোগ করিতেছি। এই ভাগীরথী বহুকালের প্রসিদ্ধ নদী। ইনি প্রাচীন হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া নানা দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া চারিদিকে লক্ষ্মীশ্রী বিস্তার করিতে করিতে আসিতেছেন। ইঁহার মধ্যে কত কোটি কোটি লোক অবগাহন করিয়া আপনাদিগকে শুদ্ধ মনে করিয়াছেন। কত পুরাতন কালের এই গঙ্গা। ইনি পুরাতন যোগী ঋষিদিগের প্রিয়তম নদী। ইহাঁর উভয় পার্শ্বে তাঁহারা কত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার তটে বসিয়া কত ভক্ত ভক্তিতে গদগদ হইয়া ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা করিয়াছেন!! কত যোগী গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে যোগেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন!! কত সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী প্রকৃত বৈরাগ্য সাধন করিয়াছেন!! এই ভাগীরথীকে দর্শন করিলে সহজেই ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন হয়। ভাগীরথীর দুই দিক্ আধ্যাত্মিক গৌরব এবং ভৌতিক কল্যাণে পরিপূর্ণ। এই ভাগীরথী ভারতের একটি প্রধান গৌরব। কত বৎসর যে এরূপ করিয়া ভাগীরথী চারিদিকে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক শ্রীবর্দ্ধন করিতে করিতে ভারতে প্রবাহিত হইতেছেন কেহ বলিতে পারে না। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি এই গঙ্গা নদী। ইঁহার দুইকূল হইতে যে ঈশ্বরের নিকট কত স্তবস্তুতি, কত আরাধনা প্রার্থনা উঠিয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই। ঈশ্বরের স্তবস্তুতি করিবার জন্য গঙ্গা এখনও আপনার বক্ষ বিস্তার

সকল দেবতাসম্বন্ধে আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটান কখন উচিত নয়। কেন না তাহা হইলে পৌত্তলিকগণের এমন আরাধ্য দেবতা নাই, যাহার সম্বন্ধে ঈদৃশ অধ্যাত্ম অর্থ ঘটান না যাইতে পারে। জড় গঙ্গাকে জীবিতের ন্যায় সম্বোধন করিয়া হৃদয়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে ঋগ্বেদে উদূখল প্রভৃতিকে জীবিতবৎ যে সম্বোধন করা হইয়াছে তাহা আর অন্যায় কি? হিন্দু ও খ্রীষ্টানগণের ব্যবহৃত শব্দ সকল গ্রহণ করা অসঙ্গত; কেন না তদ্দ্বারা অনেক চিন্তাহীন ব্যক্তি খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণবগণের মত গ্রহণ করিয়া ভাবোচিত ভাব হইতে বঞ্চিত হয়।

করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের শ্রীবৃদ্ধির কারণ এই গঙ্গা। শরৎকালে গঙ্গার আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। এ সময় গঙ্গার যেমন প্রাবল্য এমন আর কখনও হয় না। শরৎকালে গঙ্গা পূর্ণাকৃতি লাভ করেন। গঙ্গা চিরকালই ভারতেব কল্যাণকারিণী; কিন্তু শরৎকালে বিশেষরূপে ইনি ভারতের গৌরব এবং শ্রীবৃদ্ধি করেন। যে গঙ্গা হইতে আমরা এত উপকার লাভ করিতেছি, যাঁহা দ্বারা ভূমি উর্ব্বরা হইতেছে, বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে, নানা প্রকারে দেশের লক্ষ্মীশ্রী বৃদ্ধি হইতেছে, এমন গঙ্গার বক্ষে বসিয়া কি আমরা ঈশ্বরকে ডাকিব না? দেখ আজ গঙ্গার আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। বায়ুর হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার হিল্লোল খেলা করিতেছে। তাহার উপরে পূর্ণিমার শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতেছে। একেত গঙ্গা আপনি মনোহর, তাহার উপরে আবার শরচ্চন্দ্রের সুধারশ্মি। কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। চন্দ্রের সৌন্দর্য্য, সুমন্দ সমীরণের শীতলতা, জলের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য, এ সমুদায় একত্র হইয়া আজ প্রকৃতির প্রিয়-মুখকে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সুন্দর করিয়াছে!!! এই কোজাগর রাত্রিই যথার্থ লক্ষ্মীপূজার সময়। এই জন্যই বুঝি শরৎকালে লক্ষ্মীপূজার বিধি হইয়াছে। বঙ্গদেশে কত সহস্র সহস্র লোক আজ হৃদয়ের আগ্রহের সহিত লক্ষ্মীপূজা করিতেছে। আমরাও আজ আশা করিয়া এই ভাগীরথীর বক্ষে সেই যথার্থ জীবনের লক্ষ্মীপূজা করিতে আসিয়াছি। যে লক্ষ্মীর সমাগমে সমস্ত দেশের উল্লাস হইয়াছে, সেই লক্ষ্মী আমাদিগের ঈশ্বরের শক্তি। তাঁহারই বাৎসল্য চারিদিকে লক্ষ্মী-শ্রী বর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহারই আজ্ঞাতে গঙ্গা হিমালয় বিদীর্ণ করিয়া শত শত ক্রোশ দূর হইতে কত অসংখ্য নর-নারীর শরীর শীতল করিতে করিতে, কত দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে করিতে, পরিশেষে এই বঙ্গদেশে আসিয়া আমাদিগকে প্রচুর ধনধান্য এবং অশেষ প্রকার সৌন্দর্য্য দান করিতেছেন। হিমালয়ের গঙ্গা আমাদিগের গঙ্গা হইলেন। পুরাতন যোগী ঋষি এবং ভক্তদিগের গঙ্গা আমাদিগের গঙ্গা হইলেন। আজ প্রকৃতি আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে শারদীয় উৎসবে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ভাগীরথীর বক্ষে বসিয়া আজ প্রাচীন আর্য্যদিগকে স্মরণ হইতেছে। আজ এই শরৎকালের একটানা বেগবতী ভাগীরথী এবং ঐ সুধাময় শরচ্চন্দ্র উভয়ে একত্র হইয়া ব্রাহ্মদিগকে এই বলিয়া অনুরোধ-

করিতেছেন;—'ব্রাহ্মগণ আজ তোমরা আনন্দমনে আমাদের প্রভুর গুণগান কর, আমরা এই দেশের বড় আদরের ধন, তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদিগের ইষ্টদেবতার পূজা অর্চ্চনা করিতেন।' ঈশ্বরের ঐ চন্দ্র, আমাদিগের জননীর ঐ চন্দ্র, আজ কেমন সুধাময় জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। গঙ্গার বক্ষ কেমন সুন্দর হইয়াছে, আবার শরৎকালের গঙ্গাতে স্নান করিয়া চন্দ্র আরও সুন্দর এবং মনোহর হইয়াছেন। উভয়ে পরস্পরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ, এস এখন বাহিরের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ করি। যিনি এই নদী এবং এই চন্দ্রের স্রষ্টা, এস স্থির হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করি, তাঁহার পূজা করি। প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ধ্যান ভক্তি আমাদিগকে অধিকার করুক। লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে দয়ালচন্দ্র আমাদিগের হৃদয়ে তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করুন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত এবং আমাদের চিত্তাকাশে প্রেমচন্দ্রের উদয় হউক। ব্রাহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের হৃদয়কে গঙ্গার ন্যায় ভক্তিরসে দ্রবময় কর এবং চিত্তকে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রেমোৎফুল্ল কর। আজ কেহই বিষণ্ণ থাকিও না। মধুময় প্রকৃতি ম্লানমুখকে তিরস্কার করিতেছে। বাহিরের গঙ্গা যেমন দ্রুতবেগে সাগরের দিকে চলিয়া যাইতেছে, তেমনি তোমাদিগের অন্তরের ভক্তিনদী প্রেমসিন্ধু ঈশ্বরের দিকে বহিয়া যাউক। বাহিরে চন্দ্র যেমন হাসিতেছে, তোমাদিগের প্রাণ সেইরূপ সহাস্য ভাব ধারণ করুক। আজ পূর্ণিমার রাত্রি; চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে স্বর্গের সহাস্য ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন;—'ভারত, তুমি আর ম্লানমুখে বসিয়া থাকিও না। ব্রাহ্মগণ, আর তোমরা হৃদয়কে নির্জীব রাখিও না। তোমাদিগের চিত্তাকাশে প্রেমচন্দ্রকে উদিত হইতে দাও। মনের অন্ধকার চলিয়া যাউক।' গঙ্গার জলপ্লাবনে উচ্চভূমি সকলও উর্ব্বরা হইয়াছে; তবে আমরা কেন আর মরুভূমি হইয়া থাকি? ভিতরে ক্রমাগত ভক্তিগঙ্গার জলরাশি বৃদ্ধি হইতে থাকুক এবং সেই জলরাশির উপরে ঈশ্বরের প্রেমমুখ প্রতিবিম্বিত হউক। যেন এই সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আমরা ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হইয়া যাই। যখন ভিতরে এই সৌন্দর্য্য দেখিব তখন আর অন্য দিকে নয়ন ফিরাইতে পারিব না। প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হও

পূর্ণিমাভক্ত হও, নদীভক্ত হও। এই গঙ্গানদী হইতে অনেক উচ্চ ভাব শিখিয়াছি, সেই উৎকট রোগের সময় ইহার শীতল জলে সুস্থ হইলাম। কয়েক দিন ইঁহার বক্ষে বাস করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলাম। কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া এক দিন মনে ইচ্ছা হইল, এমন বন্ধুর বক্ষে সবান্ধবে ব্রহ্মপূজা করিব। 'মাতঃ গঙ্গে, তোমাকে ভুলিব না, তোমার কাছে আমি ঋণী। মা গঙ্গে, তুমি কথা কও না বটে . কিন্তু প্রেমিকের সঙ্গে কথা কও। * তুমি প্রাচীনকালের যোগী, ঋষি, ভক্তদিগের আদরের সামগ্রী তুমি আমাদের দেশের জননী হইয়া রহিয়াছ। আমাদিগকে ভক্তিশ্রী দিবার জন্য তুমি হিমালয় হইতে এখানে অবতরণ করিয়াছ। ভাবতে যোগী, বৈরাগী, ভক্ত সকল প্রস্তুত করিবার জন্য তুমি চিরকাল প্রবাহিত হইতেছ। হে গঙ্গে, তোমাকে দেখিয়া আর্য্যগণ কত উচ্চভাব শিক্ষা করিতেন। আমাদিগের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও, তুমি যেমন নৃত্য করিতে করিতে ব্রহ্মপদে খুব জল ঢালিয়া দিতেছ, আমরাও যেন মনের আনন্দে সেই শ্রীপাদপদ্মে প্রেমবারি ঢালিয়া দিই। তোমা হইতে আমরা ভক্তি শিক্ষা করিব, তোমার হিল্লোল দেখিয়া আমাদিগের প্রেমের হিল্লোল উঠিবে। তোমার নিকট সহিষ্ণুতা শিখিব। কোথায় কাণপুর, কোথায় কলিকাতা, তুমি ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছ; দূরত্ব ভাব না এবং তোমার মান অপমান জ্ঞান নাই। তোমাকে দেখিয়া কত সাধু যোগ ভক্তি শিখিতেছেন, অপর কত লোক তোমার গর্ভে জঞ্জাল নিক্ষেপ করিতেছে; কিন্তু তুমি চির সহিষ্ণু হইয়া তোমার বন্ধু শত্রু সকলেরই কল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছ।'

* এই অংশ লইয়া প্রতিবাদকারিগণ অতিমাত্র ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের এ কথাগুলি লইয়া আজ হয়তো কতই না তাঁহারা ব্যঙ্গ করিবেন;—"গুরু হয়ে তিন জায়গায় তুমি প্রকাশিত, পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা, তিন কিন্তু এক। গুরুর মত তিন প্রকারে তিন প্রণালীতে আসিতেছে। ইহাঁরা ঈশ্বরতনয়, ইহাঁদের ভিতর দিয়া যা আসে তা তোমার কথা। চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি, নক্ষত্র, লতা পাতার ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা। আর আমার অন্তরে পবিত্রাত্মার ভিতরে বিবেক কর্ণে যা শুনি, তাহা ব্রহ্মবাণী। তিন দিক্ দিয়া শুনি অথচ গুরু এক। পিতা বেদ, পুত্র বেদ, পবিত্রাত্মা বেদ, ত্রিবেদ।......তিন দিকে কাণ খাড়া করে রাখিতে হইবে। তারে কি খবর এলো বিবেকের ভিতর দিয়া শুনিতে হইবে।" "...যখন পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হই, তখন মাছ কথা কয়, পাখী কথা কয়, ইন্দুর ছুঁচো স্বর্গরাজ্যের সংবাদ আনে।"

"আকাশের চন্দ্র, ভারতের চন্দ্র, তুমি বঙ্গদেশের চন্দ্র, তুমিও আমাদিগের সহায় হও। তোমার মুখের মধ্যে আমাদিগের রাজার মুখ প্রতিবিম্বিত। আমাদিগের পিতা যিনি পরব্রহ্ম তিনি তোমার মধ্য দিয়া আমাদিগের পানে চাহিয়া হাসিতেছেন। তুমি আজ খুব জ্যোৎস্না ঢালিতেছ। তোমার নিকট বৈরাগ্য শিখিব, কারণ তুমি কিছুত চাহ না, অথচ ক্রমাগত অমৃত ঢালিতেছ। চন্দ্র, অবশ্যই তুমি তোমার জননীর কাছেই এই প্রেম বৈরাগ্য শিখিয়াছ। এই পৃথিবীর সুখ দুঃখের মধ্যে আমরাও আমাদিগের মনকে তোমার ন্যায় চির-প্রফুল্ল রাখিতে চাই। এই শারদীয় উৎসব আমাদিগের স্বর্গের সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে শিক্ষা দিক্।"

কুটীরে উপদেশ।

আজ প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে সাধকগণকে যোগ ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া কুটীরে উপদেশ হয়। উপদেশকালে যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধেই উপদেশ হয়; জ্ঞানসম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র উপদেশ হয় না। ইহার কারণ এই যে যোগসম্বন্ধে ভক্তিসম্বন্ধে জ্ঞানই জ্ঞানবিভাগের অন্তর্গত। জ্ঞানের কার্য্য যোগ ভক্তি প্রভৃতির মীমাংসা। এই জন্যই ব্রতোদ্‌যাপনকালে জ্ঞান-পরায়ণকে আচার্য্য বলিয়াছিলেন "যেখানে চারিবেদের মিল্ হইয়াছে, সেই মীমাংসা স্থলে যাইতে হইবে।" এবার ১লা কার্ত্তিক সেবাসম্বন্ধে কুটীরে উপদেশ হয়। কমলসরোবরের উত্তর তটে স্থলপদ্ম-তরু-পরিবেষ্টিত কুটীরে কেশবচন্দ্র এই উপদেশ দেন; ভাই উমানাথ গুপ্ত সেবাশিক্ষার্থিরূপে গৃহীত হন। উপদেশ দুইটিমাত্র হইয়াছিল; ইহাতে সেবার মূলভূমি এমনই ভাবে নির্ণীত হইয়াছে যে, আর উপদেশ না হওয়ায় শিক্ষা অপূর্ণ রহিল এ কথা বলিবার অবকাশ নাই। প্রথম উপদেশটি মুদ্রিত গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, তজ্জন্য ঐটি ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে এ স্থলে সমগ্র প্রদত্ত হইল।

"হে সেবাশিক্ষার্থী, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সেবা-তত্ত্ব শিক্ষা কর। এই তত্ত্ব শিক্ষা করিলে, সাধন করিলে প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিয়া ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান এবং সেবা এই চারি খণ্ডে ঈশ্বরের মুক্তিশাস্ত্র বিভক্ত। চতুর্থ খণ্ড অদ্য আরম্ভ হইল। প্রভু পরমেশ্বরের সেবাতে জীবন নিযুক্ত হইলে মোক্ষধাম, দিব্য ধাম লাভ করিবে; সেবানন্দে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইবে। সেবা মোক্ষধামের পথ, সেবা জীবনের সমস্ত উপায়, সেবা চিরস্থায়ী আমোদ—এই ভাবে সেবা গ্রহণ কর। সেবাতত্ত্বের মূল বিবেকতত্ত্ব। অতএব যাঁহারা সেবাতত্ত্বশিক্ষার্থী তাঁহাদিগের পক্ষে বিবেকের মূলতত্ত্ব শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কে জানে সেবা কি? এই ঘোর অন্ধকারময় পৃথিবীর মধ্যে সত্যপথ কোন্‌টি কে

জানে? জানিয়াও নেতা ভিন্ন কে সেবক হইতে পারে? কিরূপে সেবা করিলে প্রভু তুষ্ট হন কে বলিয়া দিবে? এই কোলাহলময় সংসারে বিবেক একমাত্র সৎপথপ্রদর্শক এবং নেতা। এই জন্য বিবেকতত্ত্ব জানা বিবেকের অনুসরণ করা আবশ্যক। পৃথিবীতে ভয়ানক কোলাহল উঠিতেছে, সেবাশিক্ষার্থী, এখনই শুনিলে পৃথিবীতে নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা নানাপ্রকার গোল করিতেছে। চারিদিকে দুর্ব্বুদ্ধির কুমন্ত্রণা এবং পাপের ভয়ানক আস্ফালন হইতেছে। পাপাচারীদিগের প্রলোভন বাক্য, শত্রুদিগের তর্জ্জন গর্জ্জন সংসারী মনুষ্যদিগের মন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। কে গুরু? কাহার নিকট বিদ্যা লাভ করিব? কোন্ পথে গেলে ঠিক সত্য পাইব? একে পথ চিনি না, তাহাতে চারিদিকে অন্ধকার, আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠিয়াছে। আবার পাপীরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সংসারকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। ভবার্ণবে তুফান ভারী। তরী বুঝি মারা যায়, ভয়ানক পাপের ঢেউ উঠিতেছে; কিন্তু আরোহীর আশা আছে, যদি কেহ হাল ধরে, সব বিপদ অতিক্রম করিয়া শান্তি উপকূলে উপনীত হইতে পারিব। ঘোর বিপদের মধ্যে নিরুপায় ভীত আরোহী কোথায় কর্ণধার বলিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল। 'আমি আছি' ভয়ানক অন্ধকার ভেদ করিয়া এই কথা উঠিল। উচ্চস্বরে এক জন বলিলেন 'আমি আছি'। তব নাম কি? বিবেক। তত্ত্বজিজ্ঞাসু স্থির হইল। ভারী তুফানের সময় ভবনদীর মধ্যে কর্ণধার পাওয়া গেল; নেতা পাওয়া গেল, ভরসা উদিত হইল; ভীত মনে সাহসের সঞ্চার হইল; মৃত মনে আবার বল আসিল। স্বর্গীয় লক্ষণাক্রান্ত এক জন স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া 'আমি আছি' এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া অস্থির জগৎ শান্ত করিলেন। নৌকা টলমল করিতেছিল, এখন সেই আন্দোলনের বক্ষে তরী আন্দোলিত হইল। জীব দিক্ নিরূপণ করিতে লাগিল। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম চিনিতে পারিল। এই দিকে সূর্য্য উঠে, ঐ দিকে সূর্য্য অস্তমিত হয়। গম্যস্থল ঠিক হইল। বিবেকী মনুষ্য ভয়কে অতিক্রম করিল। বিবেক যিনি, তিনি 'আমি আছি' এই কথা বলিলেন। বিবেকের এই প্রথম আত্মপরিচয় চিত্তস্থৈর্য্যের হেতু। বিবেকের আত্ম-পরিচয় সেবার আরম্ভ। বিবেক নিদ্রিত যেখানে, সেখানে সেবা কল্পনা, যেখানে বিবেক অন্ধকারাচ্ছন্ন, অলক্ষিত, সেখানে সেবাসাধন ক্ষণস্থায়ী অনুমানের ব্যাপার। এই

কি বিবেক? ইঁহার বাসস্থান কোথায়? ইনি কে? পৃথিবীর পণ্ডিতেরা বলেন, বিবেক মনের একটী বৃত্তি। দেবলোকে এই কথার প্রতিবাদ হইল। তাহা নহে, তাহা নহে, তাহা নহে। মূর্ত্তি উপাসকেরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বলে, এই ঈশ্বর। দৈববাণী হয় না। তথাপি লোকে মূর্ত্তি পূজা করে, এবং সেই মূর্ত্তিকে দেবতা বলে। মূর্ত্তি ছাড়িয়া যথার্থ নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিতে হইলে অনেক পোষিত অসত্য পাপ ছাড়িতে হয়, এই জন্য সুবিধার অনুরোধে লোকে মূর্ত্তি পূজা করে। তেমনি ঈশ্বরকে বিবেক বলিলে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলিতে হয়, এই জন্য মনুষ্য আপনার মনের বৃত্তিকেই বিবেক বলে। দেবপ্রকৃতিকে নীচ মনুষ্যের বৃত্তি বলা হইল। ঈশ্বরের কথা মনুষ্যের বোধায়ত্ত নহে বলিয়া মনুষ্য বিবেককে আপনার মানসিক বৃত্তি বলিল। কিন্তু বিবেক বৃত্তি নহে; বিবেক স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া আর বিবেক নাই। তিনি নিজেই নিজের আলোক, তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য মনুষ্যের মনে অন্য আলোক নাই। তিনি আপনিই আপনাকে জানান; তাঁহাকে জানিবার জন্য মনুষ্যের মনে তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি নাই। তিনি আপনিই উদ্দেশ্য, আপনি উপায়। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তিনিই উপায়, অন্য সোপান নাই। বিবেক মনের বৃত্তি নহে, বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধিও নহে, বিবেক স্বয়ং ঈশ্বর। আপনার অবয়বের মত হাত-পা-বিশিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেবতাজ্ঞানে তাহার পূজা করা মনুষ্যের অভ্যাস; সেইরূপ ঈশ্বরকে আপনার মনের বৃত্তি কল্পনা করাও মনুষ্যের বিকৃত স্বভাব। কিন্তু ঈশ্বর মূর্ত্তিও হন না, বৃত্তিও হন না। ক্ষুদ্র মনুষ্য তাঁহাকে মূর্ত্তি ও বৃত্তি করিতে যায়; কিন্তু তিনি কিছুই হন না। অতএব যদি মহাপ্রভুর দাসানুদাস হইতে সংকল্প করিয়া থাক তবে সর্ব্ব প্রথমে ঈশ্বরকে দেখ। পৃথিবীর নীতিজ্ঞেরা বলেন, বিবেক নামক মনের একটী বৃত্তি সত্যাসত্য ভাল মন্দ জানাইয়া দেয়; কিন্তু ধার্ম্মিকেরা বলেন ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যকে পাপ পুণ্য বুঝাইয়া দেন এবং তাহার মনে ধর্ম্ম দেন। ধন্য বিবেক!! তোমার মনুষ্যত্ব ঘুচিল, তোমার ঈশ্বরত্ব দেখিতেছি। এই বিবেকতত্ত্ব সাধন কর। সাধন করিয়া অসত্য পরিত্যাগ এবং সত্য গ্রহণ করিয়া স্বর্গধামের উপযুক্ত হও। এই প্রথম উপদেশ।"

কেশবচন্দ্র বিবেক এবং ঈশ্বরকে এক করিলেন। এই বিবেকসম্বন্ধে বহু

মতভেদ। পূর্ব্বসংস্কার হইতে অথবা পূর্ব্বসংস্কারজনিত ভয় হইতে বিবেকের উৎপত্তি অনেক পণ্ডিতের মত। কেশবচন্দ্র এ সমুদায় মত উপেক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে দেখান প্রয়োজন হইয়াছিল যে, তিনি যাঁহাকে বিবেক বলেন, তিনি এমন লক্ষণাক্রান্ত যে উৎপন্ন বা অনুৎপন্ন মানসিক বৃত্তি বলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন ভ্রম জন্মিতে পারে না। ইটি ভাল, ইটি মন্দ, ইটি ইষ্ট, ইটি অনিষ্ট, ইটিতে অনেকের কল্যাণ, ইটি ধর্ম্মসঙ্গত, ইটি ন্যায়, ইটি অন্যায়, এ সকল বুদ্ধির কথা বিবেকের কথা নহে। বুদ্ধির ভিতর দিয়া প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরের প্রেরণা আসিয়া থাকে সত্য, কিন্তু উহা বিবেকের ন্যায় সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী নহে। "বিবেকের কথা আদেশ। ইহা কর, ইহা করিও না, বিবেক এইরূপ আদেশ প্রদান করেন। আদেশ এবং উপদেশ বিভিন্ন। আদেশ করা বিবেকের কার্য্য, উপদেশ দেওয়া বুদ্ধির কার্য্য।" "ভাল কথা বলা, যুক্তি দেওয়া বুদ্ধির কার্য্য।" "ঈশ্বর যখনই কথা কহেন তাহা আদেশ। ইহা ভাল, ইহা মন্দ, ঈশ্বর এরূপ কথা বলেন না। তিনি তাঁহার অজ্ঞান ভৃত্যকে কেবল বলেন, ইহা কর, ইহা করিও না।" এইটি গেল প্রথম লক্ষণ। দ্বিতীয় লক্ষণ অহেতুকত্ব। ঈশ্বর আদেশ করেন, কিন্তু কেন আদেশ করিলেন তাহার কোন হেতু প্রদর্শন করেন না। তাঁহার আদেশ, অতএব তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন এখানে আর কোন যুক্তি নাই। যদি স্পষ্টও দেখিতে পাওয়া যায়, 'ইহাতে নিজের সর্ব্বনাশ এবং অনেকের আপাত অকল্যাণ হইবে, তথাপি ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে হইবে।' ঐ স্থলে যুক্তি বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করিতে যদি উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা বুদ্ধির উপদেশ, বিবেকের আদেশ নহে। 'আদেশ এবং আদেশ অহেতুক—এই দুই লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরের উক্তি জানা যায়।'

সেবার্থীর প্রতি উপদেশকালেই যে কেশবচন্দ্র এই সকল কথা বলিয়াছেন তাহা নহে। তিনি চিরদিন বিবেককে অন্য চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। সাধারণ লোকে যাহাকে বিবেক বলে তাহাকে তিনি বিবেক বলিতেন না। জীব ও ব্রহ্ম উভয়ে একত্র অভিন্নভাবে স্থিত। যখন জীবের রুচি প্রবৃত্তি প্রভৃতির বিরুদ্ধে আর এক জন কথা কন, তখন তিনি যে জীব হইতে স্বতন্ত্র

তাহা বুঝিতে দেন। জীব হইতে ব্রহ্ম পৃথক্, কেবল এই কথার দ্বারাই বুঝা যায়। সুতরাং এই কথার নাম বিবেক প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের কথা একই, সুতরাং কেশবচন্দ্র বিবেক ও ব্রহ্মকে অভিন্ন করিয়াছেন। তিনি জীবনবেদে বিবেকসম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে এই রূপই যে তাঁহার মত, স্পষ্ট প্রতীত হয়। তিনি বলিয়াছেন, "এক জনের ভিতর আর এক জন থাকে, এক জিহ্বার মধ্যে দুইটী জিহ্বা থাকে, ভিন্ন ভিন্ন স্পষ্ট স্বর শ্রবণ দ্বারা আয়ত্ত করা যায়।" "এক জীবাত্মা আর এক পরমাত্মা। দুই স্বতন্ত্র; বিশেষ্য একটী—বিশেষণ দুইটী। আত্মা পদার্থে দুই বিশেষণ মিলিত। এক জীব, আর এক পরম। জীব কথা কয় আত্মার ভিতর; পরম যিনি তিনিও কথা কন আত্মার ভিতর।" "দুইটী পক্ষী সর্ব্বদাই গাছের ডালে বসিয়া আছে। পাখী দুইটীর গায়ের রংও অনেক পরিমাণে এক; গলার স্বরও অনেকাংশে এক। সাদৃশ্যও আছে বিভিন্নতাও আছে।" "যেখানে বিশ্বাস উজ্জ্বল, যেখানে পুরুষদ্বয়ের স্বর স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেই খানেই শুভফল লাভ করা যায়।"..."যাঁহাকে জীবের জিহ্বা বলি, তাহা কাটিলে দুই অংশ দেখিতে পাই। একটী বেদবেদান্ত বলে, আর একটী মরণের কথা বলে। এক স্থূল রসনা অসার কথা বলে, আর এক সূক্ষ্ম রসনা 'হরি' 'হরি' বলে।" "দুই পুরুষ যখন দেখিতেছি, আমি আর ভগবান্, এক জনের কথা অবিদ্যা ও দুর্নীতি, আর এক জনের কথায় শাস্ত্র, তখন দুই জনকে কেন এক জন মনে করিব?" "যখন আমি বলি, আমার কথা আত্মিক ভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়; তেমনই যখন তিনি বলেন, তাঁরও কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়। আত্মার কথা লোহার তার কি পিত্তলের তারের শব্দের ন্যায় নয়, নদীর তর্ তর্ শব্দ কি পাখীর সুস্বরের ন্যায় নয়, অথচ তাহা আশ্চর্য্যকর ও অত্যন্ত সুস্বর।" এই সকল কথা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেশবচন্দ্র জীব ও ব্রহ্মকে কি প্রকারে পৃথক্ করিতেন। তিনি আপনার দ্বৈতবাদিত্ব এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন;—"তুমি কি বলিবে জীবই ব্রহ্ম? দুই আদালত স্পষ্ট রহিয়াছে। এক আদালতের নিষ্পত্তি বার বার অপর আদালতে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তুমি যেখানে ছোট আদালতের কথা বলিতেছ, সেই খানেই বড় আদালতের নিষ্পত্তি তোমার কথাকে চূর্ণ করিতেছে। অতএব

আমি দ্বৈতবাদী; দুই বিচারপতি দেখিতেছি। এক আত্মা আর এক জন আত্মাকে চালাইতেছেন।” প্রাচীন মতে নীতিবিজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত বিবেককে তিনি একদ্বারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা নহে, কেন না তিনি জীবন-বেদের এই অধ্যায়ের অন্তে প্রার্থনায় বলিয়াছেন, “কে আমাকে কুচির পথে যাইতে নিষেধ করিতেছে? বলিলাম ভগবান্, আর কেহ নয়। আমার ঈশ্বর, তুমি গাছের ভিতর, চন্দ্র সূর্য্যের ভিতর দেখা দিলে আবার নীতি-বিজ্ঞানের মধ্যে দেখা দিলে। সে মনোবিজ্ঞান আমি মানি, যাহাতে বলে তুমি জগতের কৌশলে এক জন রহিয়াছ; নীতিবিধির মধ্যে তুমি এক জন থাকিয়া মনুষ্যকে জাগাইয়া রাখিয়াছ।”

বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ রাণীগঞ্জে গমন।

কেশবচন্দ্রের শরীর আজ পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ সুস্থ নহে। বায়ুপরিবর্ত্তন তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন হইল। তিনি এজন্য সপরিবার ৩ নবেম্বর সোমবার রাণীগঞ্জ গমন করিলেন। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সঙ্গে গেলেন। প্রতিবাদকারিগণ তাঁহার প্রচারিত মতসম্বন্ধে কি বলিতেছেন, কি লিখিতেছেন, তাহার তিনি কোন সংবাদ লইতেন না। যদি লইতেন তাহা হইলে মনে হইত যেন তিনি তাঁহাদিগের প্রতিবাদের প্রতিবাদজন্যই ক্রমে হিন্দুভাবের আতিশয্যমধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিতেছেন। হিন্দুগণের দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিকে চিন্ময়ী জননী দুর্গতিহারিণী প্রভৃতি ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া ইহা কিছু আর বিচিত্র ব্যাপার নয়, কেন না এই সকল ভাব স্পষ্টই দুর্গাপ্রতিমামধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু বৈষ্ণবভাবাক্রান্ত হইয়া নির্ব্বিকার নিরাধার অজ শাশ্বত মহান্ ভূমা অনন্ত ঈশ্বরকে পুত্রভাবে বরণ করিয়া তাঁহাকে 'গোপাল' বলা ইহা নিতান্ত উদ্বেগকর। রাণীগঞ্জগমনের পূর্ব্বদিন রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে তিনি ঈশ্বরকে পুত্রভাবে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিলেন। বৈষ্ণবভাবসম্বন্ধে প্রতিবাদকারিগণ লিখিয়াছেন, "এইরূপ" চলিতে চলিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাঁহাদের ভক্তিশাস্ত্র হইতে কতকগুলি শব্দ গ্রহণ আরম্ভ হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গেই সঙ্কীর্ত্তন হরিনাম প্রভৃতির প্রবলতা হইল। বাহিরের অনেকে মনে করিলেন, ব্রাহ্মেরা বুঝি চৈতন্যের শিষ্যদলে মিশিতেছেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ বর্ত্তমান সময়ে যে ঘৃণার স্থলে বাস করিতেছেন, ব্রাহ্মেরাও কিয়ৎ পরিমাণে সেই ঘৃণার অংশী হইলেন। এ দিকে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণবভাবের আবির্ভাবের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পদধূলি লেহন প্রভৃতি নানা প্রকার ব্রাহ্মবিগর্হিত এবং বৈষ্ণবসমাজপ্রচলিত আচারে রত হইলেন। এত দিনের পর আবার দুর্গতিহারিণী প্রভৃতি শব্দের গ্রহণ আরম্ভ হইল।......জিজ্ঞাসা করি

আমাদের পরমেশ্বরের কি আর নাম নাই? তিনি কি জগতের নিকট অপরিচিত? অন্য কোন শব্দে কি তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না।" এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র কেন নূতন নূতন নাম প্রবর্ত্তিত করেন, এবং সে প্রবর্ত্তনা বিশেষ ভাবব্যঞ্জক কি না? তাদৃশ শব্দ ব্যবহৃত না হইলে সে ভাব প্রকাশ অসম্ভব হয় কি না? তৎপ্রদত্ত উপদেশ সকলই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এবারকার এ উপদেশটিও আমরা তজ্জন্য এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"হিন্দুস্থানকে আমার ভালবাসিবার আর একটি হেতু আছে। সেইটি এই;—হিন্দুস্থান গোপাল পূজার স্থান। এই পূজার মহিমা অন্যত্র নাই। গোপাল পূজা কি? ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব কি? হিন্দুদিগের প্রাচীন উপনিষৎ শাস্ত্রে আছে;—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।" "সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম যে এই পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ও আর আর সকল হইতে প্রিয়।" সকল দেশের লোকেরাই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া পূজা করে; কিন্তু ঈশ্বরকে পুত্র বলিয়া বাৎসল্য ভাবে তাঁহার পূজা করা কেবল হিন্দুস্থানেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাধারণ লোকের নিকট ইহা রুচিবিরুদ্ধ, অসঙ্গত এবং ভয়ানক মনে হয়। ঈশ্বর চিরকাল পিতার সিংহাসনে বসিয়া আছেন, মনুষ্য সেই সিংহাসনের নিম্নে বসিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিরূপে ঈশ্বরকে সন্তান হইতেও প্রিয়তর মনে হইবে ইহা কেহ বুঝিতে পারে না। যেমন জল স্বভাবতঃ নীচের দিকে যায়, স্নেহও সেইরূপ নিম্নগামী। স্নেহ কিরূপে উপরে উঠিবে? স্নেহ, বাৎসল্য ভাব কেবল সন্তান প্রভৃতির সম্পর্কেই সম্ভব, গুরুজন-সম্পর্কে কি সে সকল ভাব সম্ভব? ঈশ্বর ভক্তবৎসল, তিনি ভক্তকে স্নেহ করেন, ভক্ত কিরূপে তাঁহাকে বাৎসল্য ভাবে দেখিবে? কিন্তু ভক্তের জীবনে এমন অবস্থা আছে যে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি ঈশ্বরকে একটি ছেলের মত করিয়া প্রাণের পুতুল করিয়া বক্ষে রাখিতে পারেন, তত ক্ষণ কিছুতেই তাঁহার প্রাণ শীতল হয় না। ঈশ্বর আদরের সামগ্রী। ভক্তির আস্পদ, শ্রদ্ধার বস্তু, আদরের জিনিষ। যেমন কোমল শিশু আদরের বস্তু, সেইরূপ সুকোমল ঈশ্বর ভক্তের আদরের ধন। দুইটি হাতে তুলিয়া লইয়া বারংবার শিশুর মুখ চুম্বন করিলে কি সুখ হয়, এবং সেই শিশুর কোমল মুখ দর্শন করিতে করিতে যখন চক্ষু হইতে

বাৎসল্যের অশ্রু পড়ে তখন কি শোভা হয়, পৃথিবীর পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা কর। সেই মুগ্ধ অবস্থায় পিতা পাগল, মাতা পাগলিনী। সেই অবস্থায় পিতা মাতার জ্ঞান বুদ্ধি বিলোপ হইয়া গিয়াছে। ছেলের প্রতি আদরের কথা কি শুন নাই? পিতা মাতা যাহা ইচ্ছা তাহা করেন শিশুকে লইয়া। সেই পাগলের ব্যবহার ভদ্রলোকের কাছে অসঙ্গত; কিন্তু ভক্তের চক্ষে তাহা স্বর্গের সৌন্দর্য্য, কেন না সেই ব্যবহারে আত্ম-বিস্মৃত হওয়া যায়। সেই বাৎসল্যে আর বুদ্ধি বিবেচনা থাকে না। সেই ছেলেটিকে কখনও বুকে, কখনও কাঁধে, কখনও মাথায় করিয়া, মা বাপ কেবলই বাৎসল্য রসে ডুবেন। ছেলে সম্পর্কের ভিতরে যত আধ্যাত্মিক লাবণ্য আছে সেই সমুদয় পিতা মাতা পান করেন। ইহা যদিও লৌকিক, আমার পক্ষে অলৌকিক। যদি ছেলে কাল হয়, নির্গুণ হয়, তথাপি সে সন্তান। সেই ছেলেকে তাহার পিতামাতা বৎস, খোকা, বাবা, যাদু, বাছা ইত্যাদি কত আদরের নাম ধরিয়া ডাকেন, আর তাঁহাদের চক্ষে স্নেহের জল পড়ে। এই ভাবের নাম বাৎসল্য। আমার ইচ্ছা, আমার বিনীত অনুরোধ, ব্রহ্মভক্তেরা এইরূপ বাৎসল্য ভাবে ব্রহ্মপূজা করেন। যে ভাবে পিতা মাতা আপনাদিগের শিশু সন্তানকে দেখেন, ইচ্ছা কি হয় না সেইরূপ বাৎসল্য ভাবে আদর করিয়া ঈশ্বরকে কাছে রাখি? প্রাণের মধ্যে রাখি? ঈশ্বরকে এইরূপ আদর করা কি স্বাভাবিক নহে? গোপাল আসেন পৃথিবীতে খেলা করিতে। আমাদিগের ঈশ্বর খেলা করিতে ভাল বাসেন। ব্রাহ্মসমাজে গাম্ভীর্য্যের প্রয়োজন আছে। জগতের কর্ত্তা গম্ভীরপ্রকৃতি অনন্ত ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া গম্ভীর ভাবে পূজা করিব; কিন্তু যখন সেই অতি পুরাতন পুরুষ মহেশ্বর দুই পাঁচ বৎসরের শিশুর ন্যায় হইয়া আসিবেন তখন কি করিব? সেই সময় যদি উপনিষৎপাঠ অথবা স্তব স্তুতি করি, তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তিনি বলিবেন; 'ভক্ত, আমি আজ তোমার নিকট ঐ সকল চাই না, আমি আজ শিশুপ্রকৃতি লইয়া বাল্যভাবে তোমার সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছি।' বাল্য ভাবে ঈশ্বর কবে আসিবেন আমরা জানি না, তিনি যে কখন কি ভাবে ভক্তকে দেখা দিয়া তাহার প্রাণমন সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন কে জানে? সেই বালক যাঁহার নাম ব্রহ্ম, তিনি আসিবেন--অত্যন্ত গম্ভীর গুরুবেশ ধারণ করিয়া নয়, পিতার আকার ধারণ করিয়া নয়; কিন্তু বালকের

আকার ধারণ করিয়া আসিবেন। সেই রূপ দেখিয়া হৃদয় মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইবে। ভক্ত দেখিবেন স্বর্গের বালক সমাগত দ্বারে। ভক্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহার স্তব স্তুতি আরম্ভ করিবেন; কিন্তু ঈশ্বর বলিলেন, 'না, ঐ নৈবেদ্য আমি গ্রহণ করিব না, আমার ভাব আজ স্বতন্ত্র, আমি চাই অন্য কিছু।' ভক্ত হাতযোড় করিয়া বলিলেন, ঠাকুর, দয়া করিয়া বল কি চাও আমার কাছে। বল হে ঈশ্বর, কি চাও, কি পাইলে তুমি পরিতুষ্ট হও। হরি বলিবেন, 'প্রাণের ভক্ত, আজ আমার সঙ্গে ক্রীড়া কর। আজ চল সাধনকাননে যাই, সেখানে দুই জনে মিলিয়া ধূলা লইয়া খেলা করিব, দৌড়া দৌড়ি করিব।' যাঁহারা কেবল জ্ঞানী, ভাবুক নহেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া হাসিবেন; কিন্তু ভক্ত যিনি, শ্রীগোপালের উপাসক যিনি, তিনি এ সকল সঙ্কেত বুঝিবেন। ভক্তের নিকট হরির সাধন ভজন সমুদায় কেবল ক্রীড়া। ওহে ব্রাহ্ম, এ সকল পরিহাসের বিষয় নহে; কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত কথা। সেই বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ প্রভৃতির অতীত ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে আসেন, ইহা অভ্রান্ত সত্য কথা। পরম ভক্তের স্কন্ধে ব্রহ্ম শিশুর ন্যায় বসিয়া আছেন ইহা যদি না মান, তবে ঈশ্বরকে চন্দ্র সূর্য্যের ঈশ্বর বলিয়া লাভ কি? আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিলেইত হয়। ঐ যে ভক্তেরা স্কন্ধে লইয়া নাচাইতেছেন তিনি কে? ব্রহ্মশিশু। বৃদ্ধ ব্রহ্ম পূজা করিয়াছি, এখন আমি শিশু ব্রহ্মের পূজা করিব। আমার এমন কি সৌভাগ্য যে ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ঈশ্বর আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিবেন। এত বড় যিনি তিনি ছোট ছেলের মত হইয়া আমার কাছে খেলা করিতে আসিয়াছেন। এমন সুমধুর ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রীড়া করিব? ছাদের উপরে গিয়া ছোট গাড়ীর মধ্যে সেই ছোট শিশুকে বসাইয়া সেই গাড়ী টানিব। ব্রাহ্মগণ, লোকভয়ে ভীত হও কেন? এক কর্ম্ম কর, খুব গোপনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মকে লইয়া এরূপ ক্রীড়া কর, অভক্ত মনুষ্যেরা যেন না জানিতে পারে। বাল্যভাবে ব্রহ্মপূজা করা গুরুকথা, আমি লঘুকে গুরু বলিতেছি। বাল্যভাবে উপনিষদের ব্রহ্মকে পূজা করা পরিহাসের কথা নহে। আমি গোপালের শিশুভাব দেখিয়া ভুলিয়া গেলাম। হরির মুখ দেখিয়া হরিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া গেলাম, আর উঠিতে পারিলাম না। দয়াময়ের মুখখানি অত্যন্ত প্রিয় হইল। হরিকে কোথায় রাখিব জানি না। সুকোমল ব্রহ্মকে প্রাণের ভিতরে রাখি,

বুকের মধ্যে রাখি, মস্তকের উপরে রাখি, স্কন্ধে রাখি। জগৎ, তুমি আমাকে গোপনে এই কাজ করিতে দাও। ঈশ্বর পিতা, রাজা, গুরু, মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি আকার ধরিয়া আমার ঘরে অনেক বার আসিয়াছেন, আজ বালক হইয়া আসিয়াছেন, এই সোণার পুতুলকে কোথায় রাখিব? কেমন করিয়া তাঁহাকে এরূপ পরিতুষ্ট করিব যে বার বার তিনি আমার বাড়ীতে আসিতে ভাল বাসিবেন। তিনি বলিলেন যে, 'সে বড় ছেলে মানুষ, আমার সঙ্গ খেলা করিতে ভাল বাসে। সে বুড়র মত বই পড়িতে ভাল বাসে না। ছোট ছোট ঘর বাঁধে, ছোট ছোট বাগান করে, ছোট ছোট হাঁড়ীতে রাঁধে, আমি তার বাড়ীতে যাব।' ঈশ্বর যদি আমার সম্বন্ধে এই রূপ বলেন, আমি কত সুখী হব। বার্দ্ধক্যের পর শিশু হই। চুল পাকিল। মরিব? না, অন্যায় কথা। বার্দ্ধক্যের পর দ্বিতীয় শিশুর অবস্থা। বৃহৎ ব্রহ্মকে শিশুর ন্যায় দেখিব। তবে তিনি আসিবেন, খেলার ঘর বাঁধি। দশজন বিদ্রূপ করিবে। কি করি, পাঁচ দিন উপহাস করিবে; কিন্তু আমি যে অনন্তকালের খেলার সঙ্গী পাইব। ছেলে বেলা ছোট ছোট গাড়ী, ছোট ছোট সাহেব বিবি লইয়া খেলা করিতাম, এখন আবার ছোট গাড়ীর উপরে ঈশ্বরকে চড়াইব, ছোট হাঁড়ীতে রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওইব, ছোট দুধের বাটীতে তাঁহাকে দুধ দিব। পৃথিবী, তোমার কাছে এ সকল ভক্তির নিগূঢ় কথা বলিতে ভয় হয়, তুমি কি বুঝিতে কি বুঝিবে। আদরের ঈশ্বর, সকলের আদরের ধন হউন, জগদ্বাসী সকলের এই আনন্দ হউক। দয়াময় এই ভাবে আসিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।"

কেশবচন্দ্র রাণীগঞ্জে গিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী গৃহে অবস্থিতি করেন। রাণীগঞ্জ স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত হিতকর, ইহা আর কে না স্বীকার করিবেন? কেশবচন্দ্র কেবল শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য যত্নশীল ছিলেন তাহা নহে। তিনি প্রতিদিন পরিজনবর্গকে লইয়া উপাসনা ব্যতীত প্রকাশ্য কার্য্যও করিতেন। সিয়ারসোল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় "মিলন" সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় রাণীগঞ্জের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট, তত্রত্য জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর মালিয়া এবং তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গিবর্গকে অতি যত্নের সহিত এক দিন আহার করান। আহারীয় ব্যঞ্জনাদি সকলই নিরামিষ হইলেও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণপাচকগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল এরূপ সুন্দর প্রণালীতে

পাচিত এবং সুস্বাদু ছিল যে, তাঁহাদের সকলেরই মাংস বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। ইঁহাদের ঈদৃশ যত্নে কেশবচন্দ্র অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি মাসাধিককাল রাণীগঞ্জে থাকিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান বিধানসম্বন্ধে বন্ধুগণের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল গৃহে বসিয়া কথা বলিতেন তাহা নহে। তিনি ৮ই পৌষ রবিবার ব্রহ্মমন্দিরেও সে সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশটি দেখাইয়া দেয় প্রকাশ্যে নববিধানের পতাকা প্রোথিত হইবে, তাহার সময় উপস্থিত; তাই আমরা উপদেশের সেই সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম যে যে অংশে বিশেষ মত ও ভাব প্রকাশ পায়।

"...ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য বিশেষ বিধান প্রেরিত হয়। ভ্রান্ত লোকেরা বলে যাহারা বিধানের আশ্রিত নহে তাহারা নরকে যাইবে, তাহারা মনে করে কেবল বিধানভুক্ত দশ জন লোক বৈকুণ্ঠে যাইবে, এবং পৃথিবীর আর সমস্ত লোক ঈশ্বরের করুণা হইতে বঞ্চিত। ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিদায় করিয়া দিয়া কেবল অল্প লোককে চিহ্নিত করিয়া আপনার ক্রোড়ে স্থান দিলেন, এই ভ্রান্তি ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান পাইতে পারে না। ইহা মিথ্যা কথা যে যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত নহে তাহারা স্বর্গ পাইবে না। সত্য এই যে, কয়েকটি মুক্তিপ্রদ সত্য প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর একটি যন্ত্র লইয়া কার্য্য করেন। সেই যন্ত্রের নাম বিধান। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য সকল সাধিত হয় তত ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই যন্ত্র চলিতে থাকে। বিধানভুক্ত কয় জনের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সকল সুসম্পন্ন হইবে। ইহাতে পরিত্রাণের কথা নাই। পরিত্রাণ কোথায়? বিধান কোথায়? পরিত্রাণ সকলেই পাইবে। সকলের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই সময়ে সময়ে বিশেষ বিধানের আবশ্যক হয়। সকলেই পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু সকলেই বিধানভুক্ত নহে। যাহারা বিধানভুক্ত তাহারা ভয়ানক ঘূর্ণাজলের ন্যায় ঘুরিতে থাকে।...কখনও ঈশ্বরের দয়া দ্রুতবেগে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছে, কখনও পৃথিবী হইতে মনুষ্যের মন স্বর্গের দিকে উঠিতেছে। যেখানে ঘূর্ণা জল সেখানে ভয়ানক ঝড় বহিতেছে।" যে দেশে বিশেষ বিধান আসিল, সেই দেশে ভয়ানক দাবানল প্রজ্বলিত হইল।...যখন সেই চিরস্মরণীয় মহাত্মা এই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম-

বীজ রোপণ করিলেন, তখন হইতে এই পঞ্চাশ বৎসর সত্য ধর্ম্মের আন্দোলনে এই দেশ টলমল করিতেছে। সকল নগর, সকল গ্রাম, সকল দেশ, চারিদিক্ আন্দোলিত। ব্রাহ্মসমাজে এই পঞ্চাশ বৎসর যে সকল কার্য্য হইয়াছে, সাধারণ প্রণালী দ্বারা দুই শত বৎসরেও এ সকল হইতে পারিত না। ক্রমাগত এই বিধি চলিতেছে। যাঁহারা এই বিধির অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছেন তাঁহারা ঈশ্বরের সহকারী কর্ম্মচারী। তাঁহারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য চিহ্নিত। তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষরূপে মনোনীত। তাঁহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও মুক্তি পাইবেন; কিন্তু এই সময়ে এই দেশে কতকগুলি লোক বিশেষরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানে অন্তর্ভূত না হইলে পৃথিবীর পরিত্রাণপথ পরিষ্কার হইবে না। যাঁহারা এই বিধানভুক্ত হইবেন তাঁহারা যে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইবেন তাহা নহে, তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে নিতান্ত দুর্ব্বল এবং হতভাগ্য; কিন্তু এই বিধানসম্পর্কে তাঁহাদিগের যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সেই বিষয়ে তাঁহারা মহাবীর। বিধানসম্পর্কে এক টুকু সামান্য কার্য্য করিলেও পৃথিবীর লোক তাঁহাদিগকে ভয় করিবে। এখানে তাঁহারা রাজা হইতেও বড়, অন্যস্থানে গেলে তাঁহারা জল ছাড়া মৎস্যের ন্যায় নিস্তেজ। বিধানভুক্ত থাকিয়া যখন তাঁহারা বিধানের কথা বলিতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের মুখ হইতে স্বর্গের অগ্নি এবং তেজ নির্গত হইতে থাকে। এখানে থাকিলে তাঁহাদিগের জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবার জন্য যত বলের আবশ্যক সমস্ত তাঁহারা লাভ করেন। অন্যত্র গেলে তাঁহাদিগের আর সে তেজ থাকে না। এখনই পরীক্ষা কর। যত ক্ষণ বিধানে সংযুক্ত তত ক্ষণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আর বিধান ছাড়িয়া দাও, সেই জীবন শীতল হইয়া যাইবে। যত ক্ষণ বিধান স্বীকার করিবে, তত ক্ষণ জাগ্রৎ ভাব, তত-ক্ষণ জাগ্রৎ ঈশ্বর তোমার জীবনের মধ্যে আপনার বাহুবল প্রেরণ করিবেন। যাহাদিগের প্রাণের মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস প্রবেশ করিতেছে, তাহারা অন্যান্য বিষয়ে অন্য লোক অপেক্ষা ক্ষীণ হইয়াও বিপুলবীর্য্যধারী। ......বিধানের বাহিরে ওখানে তাহাকে ফেলিয়া দাও, আর তাহার সে তেজ নাই, সে জীবন্ত ভাব নাই, সেখানে শীতল, প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায়, সেখানে সে আছে কি নাই। তাহাকে এখানে আন, দেখিবে তাহার মৃতপ্রাণে নূতন উদ্যম

এবং নবজীবনের সঞ্চার হইবে। এখানে ভয়ানক আন্দোলন। এখানে এক নগর আর নগরকে ধাক্কা দিতেছে; এক গ্রাম আর এক গ্রামকে ধাক্কা দিতেছে; এক আসিয়া সমস্ত ইউরোপ এবং পৃথিবীর সমুদয় সভ্য দেশকে আন্দোলিত করিতেছে। এখানেও ঈশ্বর কার্য্য করিতেছেন, ওখানেও ঈশ্বর কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু সাধারণ কার্য্যপ্রণালী এবং বিশেষ বিধানে ভিন্নতা আছে। প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ যুগে মঙ্গলময় ঈশ্বর বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়া থাকেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল এই বঙ্গদেশে একটি নূতন বিধানের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমাগত ইহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, কখনও ইহার বিরাম হয় নাই। ইহা সামান্য আন্দোলন নহে। ভয়ানক ঘূর্ণা জলের ন্যায় ইহা ঘুরিতেছে। কত প্রকার পৌত্তলিকতা, অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে যে তাহা ফুরাইতেছে না। এ সকল অসাধ্য সাধন করিতে যে কত বল, এবং কত তেজের প্রয়োজন, তাহা সহজে মনে ধারণ করা যায় না। এই জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তাঁহার বিশেষ বিধানভুক্ত লোকদিগকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন। বিধান এই প্রকার হইবে ইহা অনিবার্য্য।"

বিশেষ বিধানের ভাবের সহিত দল সংযুক্ত। এ সময়ে এ বিষয়ে কেশব চন্দ্র কি প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার প্রার্থনার এই অংশটি (৬ পৌষ, ১৮০০ শক) ব্যক্ত করিবে,—"হে ঈশ্বর, কি জন্য এই ভবে আমাদিগের অবতরণ? আমরা কি যোগী সন্ন্যাসী অথবা প্রমত্ত ভক্ত হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি? সকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কেবল তোমাতে মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য কি আমরা জন্মিয়াছি? প্রভু, আমরা স্বার্থপর বৈরাগী হইতে এ সংসারে আসি নাই, আমরা আসিয়াছি তোমার বিধি পূর্ণ করিবার জন্য। কিন্তু আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা তোমার বিধি অবহেলা করিয়া একাকী ধার্ম্মিক হইতে চাই। আমরা মনে করি অন্যের যাহা হইবার হইবে, আগে আমরা শুদ্ধ হইলেই হইল। তোমার বিধি পালন না করিলে যে তুমি আমাদিগকে খাটী শুদ্ধতা এবং শান্তি দিবে না, ইহা আমাদিগের মনে থাকে না। আমরা ভ্রমবশতঃ তোমার দল ছাড়িয়া পরিত্রাণ পাইতে আশা করি। প্রেমময়, তুমি আমাদের এই ভ্রম দূর কর। তুমি বুঝাইয়া দাও, যে কয়েক জনকে তুমি বিধানভুক্ত করিয়াছ,

ইহাঁরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারিবেন না। মৎস্যের পক্ষে যেমন জল, বিধানের ব্যক্তির পক্ষে তেমনি তোমার এই বিধানভুক্ত দল। ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তোমার বিধান গঠন করিবার সময়ে তুমি কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে—'ইহারা আমার অমুক বিধানভুক্ত লোক' এই কথা বলিয়াছিলে, তাহা জানা কঠিন; কিন্তু তাহা জানিতেই হইবে। দলস্থ প্রতিজনের নিকট তোমার নিয়োগপত্র প্রকাশ কর। তোমার বিধি যত টুকু দেখিব তাহা পালন করিয়া ধন্য হইব, আর যাহা তুমি বলিবে বুদ্ধি দ্বারা তাহা না বুঝিলেও তাহা বিশ্বাস করিয়া ততোধিক ধন্য হইব। বিধানের প্রতি অবিশ্বাস তুমি দয়া করিয়া দূর করিয়াছ, এখন সন্দেহও তুমি দূর কর। তোমার বিধান মস্তকে বহন করিলে জগতের মঙ্গল এবং আমাদিগেরও কল্যাণ হইবে। আমাদিগের জীবন এবং সুখ অপেক্ষা তোমার বিধান বড়। তোমার এই দশ পাঁচ জন সন্তানের পূজা করিতে করিতে তোমার পূজা করিতে শিখিব; তোমার হস্তের সেবকদিগের সেবা করিতে করিতে, পরম প্রভু, তোমার সেবা করিতে শিখিব।"

কতকগুলি বিশেষ কথা।

এই সময়ে ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন লিখিয়া মিরারে প্রকাশ করেন। সেই সকল প্রশ্ন মণ্ডলীসম্বন্ধে নিতান্ত গুরুতর। কেশবচন্দ্র স্বয়ং এই সকল প্রশ্নের উত্তর দান করেন। আমরা যথাক্রমে সেই সকল প্রশ্ন ও উত্তরের অনুবাদ নিম্নে দিতেছি।

(১) দেবনিশ্বসিতের যথার্থ পরীক্ষা কি? যদি কোন ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়া বলেন যে, তিনি দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত, তিনি যে ঠিক বলিতেছেন তাহা পরীক্ষা করিবার সাক্ষাৎ প্রণালী কি?

দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার নির্ব্বিবাদ প্রতিভান (Originality) দ্বারা জানিতে পারা যায়। তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে নব নব বিভাব (Id e as) মত, এবং ভাব প্রাপ্ত হন, অন্ধের ন্যায় অপরের অনুসরণ করেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি অত্যধিক নীতিমত্তার প্রভাবে পরিচিত। যদিও তিনি রাজা নহেন বা সম্রাট্ নহেন, তিনি সহজে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে আত্মপ্রভাবাধীন করেন এবং নিজের বাক্য ও দৃষ্টান্ত দ্বারা পৃথিবীকে জয় করেন। তৃতীয়তঃ তিনি কথা কন না বা কার্য্য করেন না, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাতে এবং তাঁহার মধ্য দিয়া কথা কন এবং কার্য্য করেন। মানুষের হাত দিয়া ভগবান্ কি প্রকার কার্য্য করেন, দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে তাহা দেখা যায়। চতুর্থতঃ তাঁহার পন্থা অদ্ভুত এবং অবোধ্য। তাঁহাতে এমন কিছু অলৌকিক ভাব প্রকাশ পায়, যাহাতে প্রমাণ হয় যে তিনি এ পৃথিবীর লোক নহেন। এই জন্য পৃথিবীর লোকেরা তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া বলে, এ কি প্রকারের মানুষ!

(২) ক খ এবং গ তিন জন উৎসবে যোগ দিলেন। উপাসনায় তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইল, কিন্তু কয়েক দিন পরে ভ্রাতৃভাববিবর্হিত হইয়া বিরোধ বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রশ্ন—ধর্ম্ম কি আমাদিগকে নীতিমান্ করে না?

নিশ্চয়ই করে তাহা নহে। সত্যধর্ম্মের সঙ্গে নীতি থাকে। ফলতঃ এ

দুই এক সমান। ধর্ম্ম এবং নীতি এক এবং একই সামগ্রী। কিন্তু মানবসমাজে এ দুই ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মূলতঃ এক হইলেও মানুষেরা ভিন্ন ভাবে এ দুয়ের কর্ষণ করে। এজন্যই আমরা অনেক সময়ে উচ্চতম সুমিষ্ট ভক্তি মধ্যে সামান্য নীতিগত ধর্ম্ম দেখিতে পাই না এবং যাঁহারা উপাসনার উচ্চতা ও গভীরতা জানেন না তাঁহাদের মধ্যে নীতিঘটিত পবিত্রতা অনল্পপরিমাণ দেখিতে পাই। ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, বিলক্ষণ ভক্তিমান্ ব্যক্তিও অভ্রাতৃত্ব, ঈর্ষা, অভিমান এবং অপরাপর জঘন্য পাপে পতিত হন। তাঁহারা বহুবর্ষ যাবৎ উপাসনা করিতে পারেন, তথাপি তাঁহারা যদি অভ্যস্ত পাপাচারের জন্য প্রার্থনার সমগ্র বল তৎপ্রতিকূলে নিয়োগ না করেন, তাহা হইলে কখন উহা পরাজয় করিতে তাঁহারা পারিবেন না। উপাসনার সময় মানুষের নীতিস্তরের যে অবিশুদ্ধ অংশ গূঢ় ভাবে অবস্থান করে এবং দুষ্ট হৃদয় যাহার অপনয়ন অভিলাষ করে না, ভক্ত্যুচ্ছ্বাসের সাধারণ ভাব তাহাকে স্পর্শ করে না, স্পর্শ করিতে পারেও না। যদি তুমি ভক্তির আনন্দ সম্ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে অপ্রাকৃতিক উত্তেজনাযোগে উহা সিদ্ধ করিয়া লইতে পার, কিন্তু যদি যুগপৎ ধর্ম্ম ও নীতি লাভ করিবার, উপাসনাশীল ও পবিত্র হইবার তোমার সবল অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে উভয়ের সামঞ্জস্যজনিত একতায় তুমি সহজে উহা সিদ্ধ করিবে। প্রত্যেক প্রার্থনা হৃদয়ের গভীরতম স্থান গিয়া স্পর্শ করিবে এবং নিশ্চিত উহাকে শুদ্ধ করিবে।

(৩) ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে মিলিত করিবার কি আশা আছে?

আছে। যদি আমরা যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মে সকলে বিশ্বাস করি, অসাম্প্রদায়িক মূলের উপরে একতা অবশ্যম্ভাবী। যদি আমরা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের অনুগামী হই, তাহা হইলে আমরা পরস্পরে মিলিত হইবই। যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন, সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কখন মিলিত হইবেন না। মিলন কিরূপে কখন হইবে? ক্রোধের ভাব প্রশমিত হউক, ঈর্ষা এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চলিয়া যাউক, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মণ্ডলী যে বিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে সকল বিভাগ মূল মতের জন্য তত নয়, যত উত্তেজিত ভাবের জন্য বিরোধে প্রবৃত্তি। যাই ভাল ভাব ফিরিয়া আসিবে, অমনি বিভক্ত মণ্ডলী আবার একতায় পরিণত হইবে। সকল প্রধান ব্রাহ্মগণকে একত্র করিয়া একটী সভা কর,

হউক এবং তাঁহারা সকলে এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, যত কেন ভিন্নতা থাকুক না তাঁহারা সকলে সর্ব্বদা মিলিত হইয়া সাধারণ কল্যাণ বর্দ্ধিত করিবেন।

(৪) এ কথা কি সত্য যে আচার্য্য তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর কাহাকেও কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন পরামর্শ বা আজ্ঞা দেন না, কেবল সাধারণ মূলতত্ত্ব বলিয়া যান? যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে উপাসকমণ্ডলীমধ্যে বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের একতা কি প্রকারে সম্ভব এবং বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে ঠিক পথে কিরূপে আনা যাইতে পারে?

আচার্য্য কাহাকেও সাক্ষাৎ পরামর্শ দেন না। * তিনি আপনাকে আপনি ব্যবস্থাপক বা বিচারক মনে করেন না, মণ্ডলীও সে ভাবে তাঁহাকে দেখেন না। তিনি আমাদের মধ্যে বিবেক ও প্রকৃতির ব্যাখ্যাতৃমাত্র। সাক্ষাৎ ব্যবস্থাপনা দ্বারা তিনি কতকগুলি লোককে যন্ত্রবৎ পরিচালন করিতে যত্ন করেন না। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, কতকগুলি ব্রাহ্মের মধ্যে তিনি বিধিপ্রস্তুতোপযোগিবৃত্তি উদ্ভাবন করিয়া দেন যে, তাঁহারা জীবনের প্রতিদিনের বিবিধ কর্ত্তব্য বিষয়ে কোন মানবশিক্ষকের উপরে ক্রীত দাসের ন্যায় নির্ভর না করিয়া আপনারাই আপনাদের বিধিপ্রণেতা হন। যখন সকলেই অন্তরস্থ শাস্তা দ্বারা পরিচালিত হন, তখন স্বাধীনাত্মার ন্যায় তাঁহারা স্বভাবতঃ একত্র মিলিত হইবেন। যদি কেহ বিপথে যান, তখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভৎসনা বা সংপরামর্শ দেওয়া হয় না। কারণ এই সকল বিভ্রান্ত ব্যক্তি বিপথে গমন করিতে করিতে পরিশেষে তাঁহারা তাঁহাদের আপনার দোষ ও পাপ বুঝিতে পান, এবং অনতিক্রম্য স্বাভাবিক পুনরাবৃত্তি এবং অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়ায় তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হয়।

(৫) 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না' এই মূলতত্ত্ব প্রচারকগণ যদি যথার্থই অনুসরণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা এবং তাঁহাদের পরিবার কি প্রকারে প্রতিদিনের আহার পান?

---

* এই সকল কথা এবং পরে এতৎসদৃশ যে সকল কথা আছে তদ্দ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন, কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণেতে তিনি কি প্রকার স্বাধীনভাব উদ্দীপন করিয়া ছিলেন। তিনি পরামর্শ দিতেন না, বন্ধুগণও পরামর্শনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতেন। ইহাতে অনেক ক্ষতি হইত, তথাপি কেশবচন্দ্র, তাঁহাদিগের ব্যবস্থাপিকা শক্তি প্রস্ফুট হউক এই অভিপ্রায়ে, সর্ব্ববিধ ক্ষতি সহ্য করিতেন।

এটি প্রাকৃতিক নিয়মের ফল। এই জীবজগতের স্রষ্টা ইহাকে এমনই ভাবে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন যে, আত্মত্যাগী প্রচারকেরা ভরণপোষণবিষয়ে সমুদায় উদ্বেগ যাই পরিত্যাগ করেন, অমনি উহার সমগ্রভার গিয়া অপরের স্কন্ধে নিপতিত হয়। কতকগুলি লোক আপনাদিগকে উৎসর্গিত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হন, আর কতকগুলি লোক তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্য অগ্রসর হন। তাঁহারা তাঁহাদের শোণিত দেন, সমাজ তাঁহাদিগের আহার্য্য দেন। তাঁহারা কিছু চান না এবং চান না বলিয়াই ঈশ্বরের প্রেরণায় অপরে তাঁহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন দেওয়ার জন্য তখনি অগ্রসর হন। ঈশ্বরই তাঁহার ভক্তদিগকে দরিদ্র করেন এবং অপরকে তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে বাধ্য করেন। প্রকৃতি শূন্য ভালবাসেন না। যেখানেই অহং চলিয়া যায়, সেখানেই সাধারণের দানস্রোত আসিয়া চালিতে থাকে।

(৬) অনেকেই এইরূপ বলেন, ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের কোন স্বাধীনতা নাই, তাঁহাদের নেতার তাঁহারা ক্রীতদাসবৎ বাধ্য। ইটি কি বাস্তবিক ঘটনা?"

না। একটি স্থির মূলতত্ত্বের অনুসরণ করিয়া যিনি নেতা তিনি প্রচারকগণমধ্যে স্বাধীনতার উৎসাহ দান করেন এবং ফলে তাঁহারা সকলে পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন। তাঁহারা কোন ব্যক্তি বা কোন সভার নিকটে গণনাদানে আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন না। তাঁহারা কোন কাজ গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহারা বাড়ীতে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন, স্বেচ্ছানুসারে কোন স্থানে প্রচার করিতে যাইতে পারেন। তাঁহারা কোন পুস্তক সমালোচনা বা নিবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারেন এবং শাসনাধীন বা দোষগুণবিচারাধীন না হইয়া তাঁহারা বক্তৃতা দিতে পারেন। তাঁহারা সাধারণের দানে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, অথবা অন্যপ্রণালীতে তদতিরিক্ত সাহায্য অন্বেষণ করিতে পারেন। তাঁহাদের কাজ অথবা জীবনের অভ্যাসগুলিতে কাহাকেও তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে দেন না। যদি তাঁহারা কোন বিভাগের কার্য্যের ভার লন, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চান এবং যদি সামান্য হস্তক্ষেপ হয় তাঁহারা নিশ্চয়ই সে কাজ পরিত্যাগ করিবেন। প্রতিব্যক্তির বিশেষ অভ্যাস, রুচি, ভাব, এবং কার্য্য করিবার প্রণালী আছে;—এগুলি তাঁহারা অপ্রতিহত যত্নে রক্ষা করেন। ক্রীতদাসবৎ

বাধ্যতার অর্থ—ভাববিরহিত একবিধত্ব এবং নীচ অনুকরণ। আমাদের প্রচারকগণের মধ্যে এ দুইয়ের অত্যন্তাভাব সুস্পষ্টতর। ইহা অনেকেই জানেন যে, আচার্য্যের যদি কোন দুর্ব্বলতা থাকে, তবে ইহাই তাঁহার দুর্ব্বলতা যে তিনি নিতান্ত সহনশীল এবং ক্ষমাবান্; কখন হস্তক্ষেপ করেন না, কদাপি দণ্ড দেন।

(৭) ব্রাহ্মগণ মধ্যে যাঁহারা ভক্তিমান্, তাঁহারা ভক্তিতে যেমন সুস্পষ্ট বর্দ্ধিত হইতেছেন, নীতিতে সেই প্রকার বাড়িতেছেন কি না?

কয়েক বৎসর হইল অগ্রগামী ব্রাহ্মগণের মধ্যে ভক্ত্যুৎসাহ, নির্জ্জন চিন্তা, তপশ্চরণ, উপাসনার মধুরতা স্পষ্ট বাড়িয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তদনুরূপ নীতিঘটিত চরিত্রের উৎকর্ষ হয় নাই। কোমল ভাবসমূহের ক্রমোৎকর্ষ মধ্যে মনে হয় সত্য, ন্যায়, ক্ষমা, ঋজুতা, আত্মার্পণ, এই সকল কঠোরগুণ কিছু পরিমাণে অবহেলিত হইয়াছে। দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যাঁহারা বিলক্ষণ ভাল তাঁহাদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা, অহঙ্কার, বৃথাভিমান, স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে।

(৮) ব্রাহ্মসমাজমধ্যে আরও সম্প্রদায় বিভাগ সম্ভবপর কি না? কত দূরই বা সম্ভব?

ব্রাহ্মসমাজে যেমন অপরিমেয় স্বাধীনতা তাহাতে সাম্প্রদায়িক বিভাগ কেবল সম্ভবপর নহে অনিবার্য্য। উন্নতিশীল ব্রাহ্ম বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ সেই অগ্রগামী স্বাধীন ব্রাহ্মগণসম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে সত্য। সময়েতে যত তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ মত এবং রুচি প্রস্ফুট হইবে, ততই তাঁহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবেন। সাম্যবাদী, প্রেতাত্মবাদী, বিষয়ী, রাজনীতির আন্দোলনকারী, সংশয়ী, জড়বাদী এবং এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তির উত্থান আমাদের মধ্যে হইবে। কিন্তু এই সকল দলের বিরোধী সম্প্রদায়ে পরিণত হইবার তখনই সম্ভাবনা, যখন ঈর্ষা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিবাদের মূলে থাকিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, ইহা সম্প্রদায়িকতায় উৎসাহ দিতে পারে না, বা পোষণ করিতে পারে না। অনেক দল, অনেক বিভাগ, বিবিধ প্রকারের মত, ইহার মধ্যে থাকিবে এবং সে সকলকে সহিতেও হইবে, কিন্তু ইহা সাম্প্রদায়িকতাকে পাপ মনে করে। যাহারা ঈর্ষাপরায়ণ এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও

হিংসায় প্রণোদিত, তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে এবং সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক বিভাগ উৎপাদন করিবে, কিন্তু এ সমুদায় তখনই তিরোহিত হইয়া যাইবে, যখন ক্রোধোদ্দীপ্ত ভাবগুলি চলিয়া যাইবে, প্রেম ও সদ্ভাব ফিরিয়া আসিবে। অতএব ব্রাহ্মগণ মধ্যে সেই পরিমাণে সম্প্রদায়বিভাগ সম্ভবপর যে পরিমাণে গভীর ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বিবদমান দলগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইবে।

(৯) সাহজিক সত্য এবং অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, এ দুই কেমন করিয়া প্রভেদ করা যাইতে পারে? কোন কোন পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, সমুদায় নীতিঘটিত সত্য অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। ইহা কি বাস্তবিক সত্য?

সেইগুলি সাহজিক সত্য, যে গুলির অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক ভাবে সমুদায় মানবজাতি বিশ্বাস করে, যে গুলি কোন প্রকার তর্কের প্রণালী অবলম্বন না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যত দিন তাহাতে মনুষ্যস্বভাব আছে, বিশ্বাস করিতেই হয়। বিনা তর্কে আমাদের স্বাভাবিক প্রজ্ঞার গভীর প্রয়োজনানুরোধে একেবারেই আমাদিগকে ঐ সকল বিশ্বাস ও গ্রহণ করিতে হয়। আমরা অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা নিশ্চিত করি, তাহাতে এই অবশ্যগ্রহণীয়তা ও সার্ব্বভৌমিকত্ব নাই। পরিদর্শন, পরিতুলন, চিন্তা ও যুক্তিযোগে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সুতরাং উহা সকল লোকের সমান হয় না। অভিজ্ঞতা আগন্তুক, ঘটনাসম্ভূত, স্থানীয়, সাম্প্রদায়িক এবং প্রমাণসাপেক্ষ। কতকগুলি নীতিঘটিত সত্য আছে যাহা যুক্তিসম্ভূত এবং অভিজ্ঞতাসমুৎপন্ন। কিন্তু নীতির মৌলিকমূলতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আদিম এবং সহজ।

১০। বাহ্য উপকার—যেমন বৃষ্টি বা স্বাস্থ্যলাভ—তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রার্থনা অনুমোদন করেন কি না?

না। বাহ্য উপকারের জন্য প্রার্থনা হইতে পারে না। প্রথম কারণ এই যে, যাহা আমরা উপকার মনে করি তাহা আমাদের জন্য না পৃথিবীর জন্য ভাল না হইতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই যে, ঈশ্বর ঈদৃশ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন কি না? এক ঈশ্বরই জানেন, বৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি, স্বাস্থ্য অথবা রোগ, সম্পন্নতা বা দারিদ্র্য অমরাত্মার পক্ষে কল্যাণ। অনেক সময় সুখ অপেক্ষা দুঃখ উপকারসাধক। ইহা কি সত্য নয়? অধিকন্তু যখন আমরা প্রার্থনা করি,

প্রার্থিত বিষয় আমরা লাভ করিব এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। আমরা বিশ্বাস, পবিত্রতা, এবং প্রেমের জন্য প্রার্থনা করি, এবং এ সকল যে প্রদত্ত হইবে, তৎসম্বন্ধে আমরা আশ্বস্ত। কিন্তু বৃষ্টি আনয়ন বা মৃত্যু বা অনাবৃষ্টি অবরোধ করিবার পক্ষে আমরা নিঃসংশয় নই? সংশয়িত চিত্তে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত নয়।

(১১) যেমন আপনি বলিলেন তাহাতে সকল স্থলে ধর্ম্ম যদি নীতি না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মে কি উপকার? "ভাবস্পৃষ্ট নীতি" ধর্ম্ম মাথিউ আর্নোল্ড সাহেব কোথাও বলিয়াছেন। এ লক্ষণ গ্রহণ না করিয়াও আমরা কি বলিতে পারি না, নীতির উপরে সংস্থাপিত কিছু (যেমন ক) ধর্ম্ম। মানুষ যদি ধার্ম্মিক এবং নীতিহীন হয়, তাহা হইলে সে ধর্ম্মশূন্য না হইলেও কি ধর্ম্মহীন নয়?

ধর্ম্ম নীতির উপরে সংস্থাপিত নয়; নীতিই ধর্ম্মের উপরে সংস্থাপিত। ইহাই বলা ঠিক যে, নীতি—অন্য কথায় নৈতিক পবিত্রতা ধর্ম্মের একটি ফল। ধর্ম্মের যদি উপযুক্ত উন্মেষ হয় এবং একটি দৃঢ় পুষ্ট বৃক্ষ হইয়া উঠে, তাহা হইলে যথা সময়ে অনেক গুলি ফল হয়, তন্মধ্যে চরিত্রের পবিত্রতা একটি। কিন্তু যদি উহা দুর্ব্বল ও অপরিণত হয়, তাহা হইলে ভাব, সংস্কার, সংগ্রাম, যত্ন, প্রার্থনা ও উচ্ছ্বাস, এই সকল আকারে উহা বাহিরে প্রকাশ পায়। এ গুলি ভাল বটে, কিন্তু পাপপরাজয়ের পক্ষে প্রচুর নহে। মানুষের ধার্ম্মিক বা প্রার্থনা-পরায়ণ হইলেই হইল না, তাহার ধর্ম্ম সফল হওয়া চাই। নীতিশূন্য ধর্ম্ম অপূর্ণ, অপরিণত, এবং বিকৃত সামগ্রী। নৈতিক পবিত্রতা, সুমিষ্ট যোগ, সাধুতা এবং ভক্তিমত্তা উহার পূর্ণতা। যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহারা আরও ধার্ম্মিক হইতে যত্ন করুন, তাহা হইলে তাঁহারা নীতিমান্ও হইবেন।

(১২) ব্রাহ্মদিগের অধ্যয়নাভ্যাস কি আপনার পরামর্শসিদ্ধ? সাধারণতঃ আপনি কি কি গ্রন্থ পড়িতে বলেন?

অধ্যয়ন নিশ্চয়ই উপকারী যদি ভাল বিষয়ের অধ্যয়ন হয়। যে সকল গ্রন্থে মন বিপথে যায় বা অপবিত্র হয়, সে গুলি পড়া অপেক্ষা না পড়া ভাল। সকল গ্রন্থ অপেক্ষা আপনার জীবন গ্রন্থ অত্যুৎকৃষ্ট, তৎপর আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত প্রকৃতিগ্রন্থ। এই গ্রন্থ গুলি অধ্যয়নার্থ দেওয়া যাইতে পারে;—বাইবেল, বিশেষতঃ সাম; শুভসংবাদ এবং পলের পত্রিকা; ভাগবত ১১ স্কন্ধ; বিকৃটর

কুজিনের সমন্বয়দর্শন (Eclectic Philosophy); সার ইউলিয়ম হ্যামিল্‌টনের সহজজ্ঞানদর্শন (Philosophy of Common Sense); মোক্ষমূলের ধর্ম্মবিজ্ঞান (Science of Religion) চ্যানিং, থিওডারপার্কার, ডাক্তার মার্টিনো, প্রোফেসার নিউমান্‌ ইহাঁদিগের গ্রন্থ, Ecce Homo (দেখ ঐ মানুষকে) Reason in Religion (ধর্ম্মে যুক্তি)।

(১৩) এক জন ব্রাহ্ম হইয়া কি বিশেষ বিধাতৃত্বের মতে বিশ্বাস না করিতে পারেন? এক জন ব্রাহ্ম হইয়া কি দেবনিশ্বসিত ও মহাজনসম্বন্ধীয় মতে বিশ্বাস না করিতে পারেন?

এই সকল মত ব্রাহ্মসমাজের মূলমতের অন্তর্ভূত নহে, সুতরাং যাঁহারা সমাজে প্রবেশ করেন, তাঁহারা ঐ সকল মত গ্রহণ করিতেও পারেন, নাও পারেন। শত শত লোক অ ছেন যাঁহাদের বিধাতৃত্ব বা দেবনিশ্বসিত বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই, কিন্তু যদি তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমতে বিশ্বাস করেন, তবেই ব্রাহ্ম। যাঁহারা সমাজের আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন অগ্রসর সভ্য, তাঁহারা ধর্ম্মের এই সকল গভীর মত গ্রহণে বাধ্য। তাঁহাদিগের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক মত যেমন প্রধান, বিশেষবিধাতৃত্বও তেমনি প্রধান।* অপিচ যেমন তাঁহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারেন না, তেমনি বিধাতৃত্বও অস্বীকার করিতে পারেন না।

(১৪) ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বর্ত্তমান প্রতিবাদের আন্দোলনা কি স্থায়ী হইবে?

তত দিন স্থায়ী হইবে, যত দিন উহার রক্ষার জন্য বিরুদ্ধ ভাব ও যথেষ্ট টাকা, বৌদ্ধ ও সংসারিক ভাবে যথেষ্ট প্রবৃত্তি থাকিবে।

(১৫) নীতি যদি ধর্ম্মের উপরেই স্থাপিত, তাহা হইলে ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে তদুপযুক্ত নীতির উৎকর্ষ আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে কেন উপস্থিত হয় না? একই সময়ে আমি ধার্ম্মিক ও নীতিমান্‌ কি প্রকারে হইব?

নীতি ধর্ম্মের উপরে স্থাপিত এবং ধর্ম্মবৃদ্ধিতে নীতিবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ধর্ম্মে যদি বিকার উপস্থিত হয়, ইচ্ছাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবুকতা বাড়ান হয়, যদি জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হয় এবং যত্নে অপবিত্রতা পোষণ করা হয়, তাহা হইলে তাহার ফল নীতিহীন ধর্ম্মহীন ধর্ম্ম হইবেই হইবে,

অন্য কথায় ধার্ম্মিকতার পরিচ্ছদের নিম্নে অনীতি ও অধর্ম্ম থাকিবেই থাকিবে। ধর্ম্ম ও নীতি দুইই একত্র থাকে এজন্য উভয়ই একযোগে সাধন করিতে হইবে। বিশেষতঃ ধর্ম্মজনিত ভাবোদ্দীপ্তির সহায়তায় মন্দ আচরণ গুলি উৎপাটন করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের প্রতিদিনের ধ্যানো-পাসনাকে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়োগ করিতে হইবে। গুপ্ত পাপ উন্মূলন এবং প্রিয় বিপুগুলির পরাজয় জন্য নিত্য আমাদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রার্থনাযোগে বিবেক পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে শুদ্ধির কোন আশা নাই।

(১৬) ব্রাহ্ম সমাজ কি বিধান? যদি বিধান হয়, কোন্ অর্থে?

ঈশ্বরের জীবন্ত বিধাতৃত্বে এই মণ্ডলীর অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহার সংস্থাপক এবং নেতৃবর্গকে আমরা মনোনীত ব্যক্তি বলিয়া মানি। ইহার সমুদয় কার্য্যোপায় এবং কার্য্যশৃঙ্খলা ঈশ্বরপ্রবর্ত্তিত। ইহার প্রবর্ত্তনার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহা জীবন্ত ঈশ্বর কর্তৃক রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে এবং ইহার অভীষ্ট বিষয় অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার গতি ও বিপরীত গতি উভয় মধ্যে বিধাতার হস্ত সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, ঈশ্বর জাতীয় মণ্ডলীর অভ্যুদয় সাধন করিতেছেন।

(১৭) আপনি যদি কুচবিহার বিবাহকে বিধাতৃনিয়োজিতভাবে দেখেন, তাহা হইলে বিবাহবিধিকে কি দৃষ্টিতে দেখেন?

আমরা উভয়কেই বিধাতৃনিয়োজিত দৃষ্টিতে দেখি। উভয় মধ্যেই সমান ঈশ্বরের হস্ত প্রকাশিত। অপিচ উভয় মধ্যেই মানবীয় উপায়সম্ভূত দোষও দেখিতে পাই। বিবাহবিধি লিপিবদ্ধ করাইবার জন্য আচার্য্য বিধাতা কর্তৃক পরিচালিত ও প্রণোদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিধি যে সকল হাতের ভিতর দিয়া বিধিবদ্ধ হইল, তাঁহারা "ঈশ্বরের সমক্ষে" এই কথাটী উঠাইয়া দিয়া উহাকে সংসারের বিধি করিয়া ফেলিলেন, এবং অন্যান্য এমন সকল বিষয় উহার ভিতরে সন্নিবিষ্ট করিলেন যাহা যাঁহারা বিধান চাহিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অভি-প্রায়বিরুদ্ধ। এইরূপ বিবাহও বিধাতা কর্তৃক নিয়োজিত ও চালিত এবং তিনি আচার্য্যকে এরূপ ভাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন যে প্রলোভন ও বাধা সত্ত্বেও

তিনি বিশুদ্ধ অনুষ্ঠানপদ্ধতি সিদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন ও নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ পদ্ধতি যাঁহাদের হাত দিয়া কার্য্যে পরিণত হইল তাঁহারা ভগবদ্বিধানের সঙ্গে মানবীয় অপূর্ণতাদোষ মিশাইলেন, এবং সম্পাদনকালে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও অভিপ্রায়ের বিশুদ্ধতার ক্ষতি করিলেন। যাঁহারা বিধাতার নিয়োগাধীনে কার্য্য করেন, তাঁহারা কেবল অভিপ্রায় ও যত্নের জন্য দায়ী।

(১৮) আচার্য্য টাউনহলের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার পরিবার বিধাতাকর্তৃক প্রতিপালিত হন। কেমন করিয়া হন আপনি কি বুঝাইয়া দিবেন?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য প্রচারকের ন্যায় ধনোপার্জ্জন জন্য সাংসারিক কর্ম্ম করিতে তাঁহার অধিকার নাই। প্রচারভাণ্ডারের অধ্যক্ষ প্রচারকগণের প্রতিপালকরূপে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত এবং নিয়োজিত হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার গৃহসম্পর্কীণ সমুদায় বিষয় দেখেন, এবং আচার্য্যের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই নিয়োগ করিয়া তিনি তাঁহাকে এবং পরিবারবর্গকে আহার পান যোগান।

(১৯) আচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রথম উপদেশে বলিলেন, ঈশ্বরের সত্তা-সম্বন্ধে যে কারণবাদ নিয়োগ করা হয়, উহা ভুল। কৌশল হইতে যে যুক্তি উপস্থিত করা হয় প্রকৃতির অধ্যয়নশীলগণের পক্ষে ধর্ম্ম বা নীতিঘটিত উহার কি কোন মূল্য নাই?

কৌশল হইতে যুক্তি নিঃসন্দেহ এক প্রকার প্রমাণ বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সত্তাসম্বন্ধে মূল প্রমাণ নহে। অন্যান্য গৌণ প্রমাণের মত উহা কেবল মূল যুক্তির দৃঢ়তা ও দার্ষ্টান্তিকতাসম্বন্ধে সহায়তা করে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল পত্তনবিষয়ে প্রচুর নহে। স্বানুভূতি হইতে প্রধান যুক্তি সমুপস্থিত হয়। এই অভেদ্য নিরাপদ মূলের উপরে বিশ্বাস যখন সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল, সমুদায় জগতে ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ যে সকল কৌশল চিহ্ন আছে, সে গুলি অধ্যয়ন দ্বারা তখন সমধিক উপকার লাভ হইতে পারে।

(২০) অদ্বৈতবাদখণ্ডনের নিশ্চিত প্রকৃষ্ট উপায় কি?

অদ্বৈতবাদীর স্বানুভবের নিকটে দৃঢ়তাসহকারে নিবেদন করিলেই, আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার ভ্রম তিনি বুঝিতে পারিবেন। ধ্যানের সময়ে

তিনি আপনাকে ঈশ্বরেতে মগ্ন করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু শক্তিতে, জ্ঞানে, বা পবিত্রতায় তিনি আপনি অনন্ত ইহা মনে করিতে পারেন না। সিন্ধুতে বিন্দু মিশিয়াছে আত্মসম্বন্ধে তিনি এরূপ তুলনা করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার স্বানুভূতি বলিয়া দেয় যে, তিনি সমুদ্র নহেন। যে অদ্বৈতবাদী জড়-জগতের সহিত ঈশ্বরকে এক করেন, তাঁহার নিকটে সহজে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, জড় ও চৈতন্য এক নহে, সুতরাং উহা সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের সহিত এক হইতে পারে না।

(২১) যাঁহাদের পত্নী আছে—তাঁহারা মনে করিবেন যেন পত্নী নাই। মনের এ অবস্থা কিরূপে আনয়ন করা যাইতে পারে, আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিবেন ?

সেণ্ট পল বলিয়াছেন, যাঁহাদের পত্নী আছে, তাঁহারা সকল বিষয়ে তাঁহাদের স্ত্রীর সন্তোষসাধন জন্য উদ্বিগ্ন; যাঁহাদের পত্নী নাই, তাঁহারা ঈশ্বরের সন্তোষসাধনে যত্নশীল। যাঁহাদের পত্নী আছে, তাঁহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালনে যত্ন করুন এবং পত্নী অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভাল বাসুন। তাঁহারা গৃহের সমুদায় কর্ত্তব্য সাধন করুন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি উদ্দীপ্ত প্রেমরূপ বেদীসন্নিধানে পূর্ণবৈরাগ্যের ভাবে ইন্দ্রিয়লালসা ও সাংসারিকতা বলি অর্পণ করুন। ঈশ্বরপরায়ণ স্বামী পত্নী কর্তৃক শাসিত হওয়া পাপ মনে করিবেন। পত্নীর নহে, ঈশ্বরের সন্তোষ সাধন করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইবে।

(২২) অনেকের মত এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম অল্পসংখ্যক শিক্ষিতগণ কর্তৃক গৃহীত হইবে, সাধারণ লোকের ধর্ম্ম উহা কখন হইবে না। এমতে কি কোন সত্য আছে ?

উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মধর্ম্ম কখন সাধারণের ধর্ম্ম হইতে পারে না। শিক্ষিত এবং অগ্রসর ব্যক্তিগণই কেবল উহা গ্রহণ করিতে ও উহার মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারেন। ইহাকে সাধারণ লোকের উপযোগী করিবার জন্য চিত্তাকর্ষক বাহ্য অনুষ্ঠান ও বাহ্যাকার দিতে হইবে, কিন্তু এ গুলি পৌত্তলিকতাশূন্য ও নির্দ্দোষ হওয়া চাই। সাধারণ লোক কর্তৃক গৃহীত হইবার জন্য উহার ভাবপ্রধান, কার্য্যপ্রধান, অনুষ্ঠানপ্রধান দিক্ প্রদর্শন করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মে শিশু ও উন্নত আত্মা উভয়েরই আহার্য্য আছে।

(২৩) ব্রাহ্মের কি মাংসাহার হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে?

মাংসাহার হইতে নিবৃত্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান মত নহে। অগ্রসর এবং উপাসনাশীল ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে মাংস খান, অনেকে মাংস খান না। যাঁহারা মাংস খান না, তাঁহারা এটিকে নিরাপদ পন্থা মনে করেন। শরীর ও আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষা পায় এরূপ ভাবে যত দূর সম্ভব তত দূর অঙ্গ ভোগত্যাগেও তাঁহারা প্রস্তুত। তাঁহারা সহজভাব ভাল বাসেন এবং শোণিতমাংসাস্বাদের ভোগপরিহারপূর্ব্বক জীবনরক্ষার্থ যাহা প্রয়োজন তাহাতেই সন্তুষ্ট। তাঁহারা সে সকল কিছুই করিতে চাহেন না, যাহাতে এ দেশে পানভোজন এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইবার উৎসাহ দান হয়। অন্য ভ্রাতার পথে যাহা বিঘ্ন, তাহা পরিহার করিতে আমরা উপদিষ্ট হইয়াছি।

(২৪) খ্রীষ্ট কি কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন?

আমরা যত দূর জানি, শুভসংবাদে এমন একটি প্রবচন নাই যাহাতে তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাঁহাকে পৃথিবী গ্রহণ করিবে ইহাই তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর বলিয়া নহে। খ্রীষ্ট একথা বলেন নাই, আমি পিতা। তাঁহার কথা এই "আমি এবং আমার পিতা এক"।

(২৫) বিশ্বাস কি পাপ বিনাশ করিতে পারে? আমি এক সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করি অথচ আমার হৃদয়ে এখনও পাপ আছে।

বিশ্বাস পাপ বিনাশ করিতে পারে; কিন্তু উহা যথার্থ জীবন্ত বিশ্বাস হওয়া চাই। ঈশ্বরে মৃত বিশ্বাস অকর্ম্মণ্য। পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বরে অনলবৎ প্রদীপ্ত বিশ্বাস অপবিত্রতাবিনাশে অকৃতকৃত্য হইতে পারে না।

(২৬) অদৃষ্ট ও স্বাধীনতা এ দুইয়ের বিরোধ আমি ভঞ্জন করিতে পারি না। আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া দিবেন?

অদৃষ্ট বলিতে যদি একান্ত অপরিহার্য্যত্ব এবং স্বাধীনতার অভাব বুঝায় তাহা হইলে অদৃষ্ট বলিয়া কিছু নাই। অকল্যাণ বিধাতার লিপি, এরূপ ভাবে আমরা অদৃষ্ট স্বীকার করি না। মানুষ পাপী হইবে ইহা অদৃষ্টলিপি নহে। অকল্যাণ আমাদের প্রকৃতির একান্ত অপরিহার্য্যত্ব নয়, হইতেও পারে না। কিন্তু পবিত্র হওয়া মানুষের অদৃষ্টলিপি। পৃথিবী অবশ্যই পবিত্রাণ লাভ করিবে,

কেবল এই অর্থে বিধাতার লিপি সম্ভবপর। এক জন সর্ব্বোপরি শাস্তা বিধাতা কর্ত্তৃক আমরা এমনই শাসিত যে, আমরা যাই কেন করি না অকল্যাণ হইতে কল্যাণ আসিবেই, আমাদের পাপ ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে স্বর্গের পরিত্রাণদ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইবেই। যাহা ভাল তাহা করিতে মনুষ্য স্বাধীন। বিপথে যাইবার জন্য অদৃষ্ট কর্ত্তৃক সে অপরিহার্য্যভাবে বদ্ধ নয়, বরং সে বিধাতা যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার অনুসরণে বদ্ধ। এই রূপে দুইয়ের মিলন হয়।

(২৭) আত্মোৎসর্গ যদি প্রচারকজীবনের আদর্শ হয় তাহা হইলে প্রচারকগণের গৃহ মঙ্গলবাড়ী কেন প্রতিষ্ঠিত হইল? এখন কি তাঁহারা স্বতন্ত্র বাস করেন না? মঙ্গলবাড়ী এবং আশ্রম এ দুই কি একই ভাবের বাহ্য প্রকাশ।

প্রচারকেরা আপনারা যদি গৃহ চাহিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের আত্মোৎসর্গের ভাবের অনুপযোগী কার্য্য হইত। তাঁহারা ঈশ্বর এবং তাঁহার রাজ্য চাহিয়াছেন, কিন্তু বৈরাগ্যের নিয়ম অনুসারে গৃহও তৎসহ সংযুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে একত্র বাস শিক্ষা দেওয়া ও উপযুক্ত করিয়া তোলা আশ্রমের লক্ষ্য। এইরূপে উপযুক্ত হইয়া তাঁহারা গৃহস্থ হইয়া স্বতন্ত্র বাস করিবেন, কিন্তু ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত থাকিবেন। কতক গুলি লোক ও পরিবার একত্র বাস করিলে তাহাকে আশ্রম বলে; এক সাধারণ মণ্ডলী এবং এক মধ্যবিন্দুভূত নিয়ামক কর্ত্তৃত্বের পরিদর্শনে কতক গুলি গৃহ একত্র সংযুক্ত থাকিলে তাহাকে মঙ্গলবাড়ী বলে।

(২৮) কোন কোন ব্যক্তি হরিনাম ব্যবহারে আপত্তি করেন। এ নামের ব্যবহার আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কি সমর্থন করিবেন?

এমন দেশ কাল আছে যেখানে যে সময়ে হরিনাম ব্যবহার করিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম মনে হয় বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে সত্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, এবং সেরূপ সংশয় করিবার কোন কারণ নাই, সে স্থলে ঐ নাম ব্যবহার নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। ইহা ব্যতীত হরিনাম হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থ উপনিষদেও পরব্রহ্মে সংযুক্ত আছে। এই নামের অনুকূলে প্রধান যুক্তি কিন্তু—উহা অল্পাক্ষর ও মিষ্ট ইহাই।

(২৯) যাহা নীতিবিরুদ্ধ তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিবেচনা করা কি কোন ব্যক্তি সমর্থন করিতে পারেন ?

ঈশ্বর কখন আপনাকে আপনি খণ্ডন করিতে পারেন না, করেন না। যাহা নীতিতঃ অন্যায়,—যেমন মিথ্যা কথা, অসতত্ব, হত্যা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা,—তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী, সুতরাং ঈশ্বর কখন তাহা আদেশ করিতে পারেন না। "ঈশ্বরের আদেশ" এবং "নীতিতঃ ঠিক" এই দুই প্রতিশব্দ। যাহা কিছু ভগবান্ আদেশ করেন তাহা ঠিক হইবেই। যাহা কিছু তিনি নিষেধ করেন, তাহাই অকল্যাণ। ঈশ্বর যদি বিবেকের মধ্য দিয়া কথা কন, তাহা হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ কেমন করিয়া তাহা হইতে ভিন্ন অথবা বিরুদ্ধ হইবে ? তিনি সর্ব্বদা একই রূপ। তাঁহার শিক্ষা কখন আপনি আপনার খণ্ডন হইতে পারে না।

(৩০) খ্রীষ্ট ও চৈতন্যকে কি প্রকারে মিলান যাইতে পারে ?

খ্রীষ্টকে ভালবাসা এবং সম্ভ্রম করাও সম্ভব এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যেরও অনুরক্ত শিষ্য হওয়া সম্ভব। খ্রীষ্ট আত্মোৎসর্গ, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সম্পূর্ণ জীবনোৎসর্গ প্রদর্শন করেন। চৈতন্য প্রেমের উৎকট উদ্যম ও কোমলতা, ভাবপ্রদীপ্ততা এবং মধুর ভক্তি প্রদর্শন করেন। প্রকৃত বিশ্বাসী যদি চৈতন্যের ভাবে খ্রীষ্টের নিকটে যান, তাহা হইলে তিনি বিশুদ্ধ ও কোমল হইবেন এবং সুমিষ্টভাব সহ সুদৃঢ় বাধ্যভাব সংযুক্ত করিবেন। সে ব্যক্তি বাধ্য জীবন্ত ইচ্ছা সহকারে ঈশ্বরকে সেবা করিতে এবং সুকোমল উৎকটানুরক্তহৃদয়ে তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারে।

(৩১) দীক্ষানুষ্ঠান কি ব্রাহ্মসমাজে অবশ্যানুষ্ঠেয় ? উহা ছাড়া কি পরিত্রাণ হয় না ?

ঈশ্বরের দৃশ্যমণ্ডলীতে প্রবেশের নিদর্শন এবং ধর্ম্মের সঙ্গিলাভ হস্তগত করার উপায় বিনা এ অনুষ্ঠানের আর কোন মূল্য নাই। এ সকল লাভ ছাড়া অনুষ্ঠানগত কোন মূল্য নাই এবং কোন ব্যক্তির পরিত্রাণের সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ নাই। যিনি দীক্ষিত হইয়াছেন এবং দীক্ষিত হন নাই উভয়েই স্বর্গরাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন। তবু আমরা এই অনুষ্ঠানসকলকে এই জন্য করিতে বলি যে, পরস্পরের উন্নতিসাধন এবং সফলতা সহকারে সত্য

প্রচারের জন্য যথার্থ বিশ্বাসিগণের পক্ষে দৃঢ়তর ভ্রাতৃভাবে দলবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

(৩২) আমাদের আচার্য্যের শেষ টাউনহলের বক্তৃতায় (৯ পৃষ্ঠায়) পশ্চাল্লিখিত এই কথাগুলি দেখিতে পাই;—"বৃত্তাকার স্রোতের অগ্রে পশ্চাতে ঊর্দ্ধে অধোতে তাঁহার (খ্রীষ্টের) আত্মা যখন গতায়াত করিতেছিল, তখন তিনি ভূতকালে, এমন কি সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং ভবিষ্যতে, বিচারাসনের সম্মুখে মৃত্যুর পর সমবেত বিশ্বাসিগণকে পুরস্কার এবং ভৎর্সনা করিতেছেন এই ভাবে আপনাকে দেখিতে পাইলেন।" ইহার সঙ্গে আমি এ কথাও বলিতে পারি যে, সেণ্ট জনের ৫ অধ্যায়ে এই প্রবচনটি পাওয়া যায়;—"কারণ পিতা কোন মানুষের বিচার করেন না, কিন্তু সমুদয়ের বিচার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন যে, সকল মানুষ পুত্রকে সম্মান করিবে, এমন কি যেমন তাহারা পিতাকে সম্মান করে তেমনি সম্মান করিবে।" এসকল প্রবচনের অর্থ কি, আপনি কি অনুগ্রহপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিবেন?

যে নীতির বিধানে মনুষ্যগণের পরস্পরসম্বন্ধে পরিচালিত হওয়া সমুচিত, খ্রীষ্ট আপনাকে তাহারই ঘনীভূত মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করিলেন। খ্রীষ্ট অর্থ—আর কিছু অপেক্ষা তাঁহার জীবনের যদি কোন অর্থ থাকে—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমার ইচ্ছা নহে।" তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিনিধি ছিলেন। সেই ইচ্ছা বা সেই নীতির বিধি, যাহা তাঁহার জীবনে এবং শিক্ষাতে বিশেষতঃ পর্ব্বতোপরি উপদেশে তৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তদনুসারে তাঁহার অনুগামিগণ বিচারিত হইবেন। তাঁহাদের নিকট তিনি কেবল শিক্ষক ও পরিচালক নহেন, কিন্তু তিনি কার্য্যের বিধি, জীবনের ব্যবস্থা। সকল দেশে সকল কালে তাঁহারা সেই ব্যবস্থায় বিচার্য্য, এবং পৃথিবীর প্রলোভনপরীক্ষামধ্যে তৎপালনে তাঁহারা সম্পূর্ণ দায়ী। যে কোন সুবিধার নীতির ব্যবস্থা তাঁহারা নিজ হস্তে করিয়াছেন, সে গুলিকে পরীক্ষাকালে আপনাদের বিধিলঙ্ঘনের হেতুবাদরূপে তাঁহারা উপস্থিত করিতে পারিবেন না। যখন তাঁহারা বিবেকসিংহাসনসন্নিধানে বিচারিত হইবেন, ব্যবস্থার প্রতিনিধি খ্রীষ্ট হয় তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবেন বা দণ্ড দিবেন। খ্রীষ্ট হইতে তাঁহারা সত্য শিক্ষা করেন। তিনি তাঁহাদিগকে আলোকিত করেন। অপরাধীদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এবং ভৎর্সনা করিবার জন্য তিনি ব্যবস্থা-

কারে নিত্যকাল তাঁহাদের হৃদয়ে থাকেন। তিনি তাঁহাদের নিকটে আলোক ও বিচার উভয়ই।

(৩৩) যদি সান্ত হইতে অনন্ত মনে আসে, তাহা হইলে অনন্ত ঈশ্বর মানবভাবাপন্ন কি নন?

ইহা সত্য যে আমাদের প্রেম দিয়া ঈশ্বরের প্রেম, আমাদের শক্তি দিয়া ঈশ্বরের শক্তি আমরা অনুভব করি, কিন্তু আমরা আমাদিগকে তাঁহার স্বরূপ-সমূহের পরিমাপক করি না। যদি আমরা তাহা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানবভাবাপন্নতা হইত। এরূপ করিলে আমরা ঈশ্বরকে কখন কেবল প্রেমে আচ্ছাদিত করিতাম না, প্রেমের সীমা—ক্রোধ, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, পক্ষপাত প্রভৃতিতেও আচ্ছাদিত করিতাম। ঈশ্বরের স্বরূপে যখনই আমরা অনন্তত্ব যোগ করি, তখনই ঈশ্বরে মানবীয় ভাব অসম্ভব হয়।

(৩৪) ব্রাহ্মের মতবিশ্বাসে অমরত্বের মত প্রয়োজনীয় নহে প্রোফেসর নিউম্যান মনে করেন। যদি এই মত কেহ ছাড়িয়া দেন তবে কি আপনি মনে করেন, নীতিসঙ্গত আচরণে মানুষের বিশ্বাস এবং ধার্ম্মিকতা বাধা প্রাপ্ত হয়?

অমরত্বের মত বিনা ব্রাহ্মের মতবিশ্বাস অপূর্ণ। যেমন তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে বাধ্য, তেমনি তিনি অমরত্বে বিশ্বাস করিতেও সমান বাধ্য, যেহেতুক দুইটিই অপরিহার্য্য ও অভেদ্য ভাবে একত্র মিলিত। অর্দ্ধ সত্য সত্য নয়। যদি কোন ব্যক্তি পরলোকসম্পর্কীয় সত্য অগ্রাহ্য করেন, তিনি তত দূর অসত্যানুসরণে দোষী, এবং তাঁহার মতবিশ্বাসের অসত্যত্ব জন্য তিনি দুর্ভোগ ভুগিবেন। তাঁহার চরিত্রেরও ক্ষতি হইবে, কেন না নীতিসম্পর্কীণ শাসনের ভাব তাঁহাতে শিথিল এবং ঝাপসা ঝাপসা হইবে এবং তাঁহার ঈশ্বরের ন্যায় ও পবিত্রতার প্রতি সম্ভ্রম মূলশূন্য কল্পনা প্রমাণিত হইবে। এ মত ব্যতীতও এক ব্যক্তি কতক পরিমাণে নীতি অর্জ্জন করিতে পারে; কিন্তু উহা নীতির ছায়ামাত্র, উহা সে ধর্ম্ম নহে, স্বর্গ যথার্থ পূর্ণাকার যে ধর্ম্ম চান, যে ধর্ম্ম পরকালে ঈশ্বরের নীতির শাসনের পূর্ণতা ও সিদ্ধতাতে বিশ্বাস দ্বারাই কেবল অনুভবগোচর করা যাইতে পারে।

(৩৫) প্রচারকের পত্নীগণকে তাঁহাদের স্বামিগণের সাধনক্লেশ কত দূর

বহন করিতে হইবে? ইহা কি সত্য নহে যে, প্রচারকগণ তাঁহাদের কার্য্যে আহূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পত্নীরা নহে? তবে কেন তাঁহাদের স্বামিদিগের ত্যাগজনিত দুঃখশোকের ভাগী করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করা হইবে?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকগণের পত্নী ও সন্তানদিগকে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ বা আচরণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন না, উহা কেবল প্রচারকগণের প্রতিই খাটে। আমাদের মণ্ডলী মণ্ডলীর কোন সভ্যের উপরে দারিদ্র্য বলপূর্ব্বক চাপাইতে পারেন না। যে সকল ব্যক্তি ধনের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের জন্য দরিদ্র হওয়া মনোনীত করেন, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন। পত্নী যদি বৈরাগ্যবিধি গ্রহণে ইচ্ছা না করেন, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ভরণপোষণ ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাধ্য। যদি তিনি তাহাতে সুখী না হন, হইতে পারে, উহার কারণ প্রচারবিভাগে অর্থের অল্পতা। ইহা স্বাভাবিক যে, স্বামিপরায়ণা পত্নী কতক পরিমাণে প্রচারক স্বামীর উদ্বেগ ও ক্লেশের সমভাগিনী হইবেন। পত্নী যাহাতে তাঁহার পন্থানুসরণ করেন এবং উভয়ে দারিদ্র্যে এক হয়েন, এরূপ প্রভাব পত্নীর উপরে স্বামীর বিস্তার করা অপেক্ষা আর কিছুই ভাল হইতে পারে না। যত দিন পর্য্যন্ত তাহা না হইতেছে, বর্ত্তমান অসামঞ্জস্য থাকিয়া যাইবে এবং সমাজ প্রচারককে বৈরাগ্যোপযোগী সামান্য আহার্য্য দিয়া তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণকে পরিমাণমত মাসিক বৃত্তি দান করিবেন।

(৩৬) বর্ত্তমান কালের দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে অপরিজ্ঞেয় বলেন, উপনিষদ্ তাঁহাকে নির্গুণ বলেন, খ্রীষ্ট বলেন "ঈশ্বরকে কেহ দেখে নাই।" আপনি কোন্ অর্থে ঈশ্বরকে জ্ঞেয় বলেন?

ঈশ্বর অনন্ত, এজন্য যদিও মনুষ্যজ্ঞানের অতীত বলিয়া তিনি অজ্ঞেয়; মানবীয় গুণ বা প্রবৃত্তি নাই বলিয়া যদিও তিনি নির্গুণ; আত্মা বলিয়া যদিও তিনি দর্শনাতীত এবং অদৃশ্য, তথাপি তাঁহার প্রকৃতি আংশিক ভাবে আমাদের বিদিত। তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য কতক পরিমাণে আমরা বুঝি।

(৩৭) আমাদের মণ্ডলীর আচার্য্যের নামে মনুষ্যপূজায় উৎসাহদানের অভিযোগ আবার উপস্থিত হইয়াছে। যদি অসত্য হয়, আপনি কি উহা

পুনরায় অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন? এ সকল মিথ্যা উচ্চারিত হইমাত্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

বিধাতার নিযোগে শিক্ষা ও সাহায্যদানের জন্য নিযুক্ত, ধর্ম্মসম্বন্ধে নেতা ও মূল্যবান্ বন্ধু ব্যতীত অন্য কোন ভাবে তাঁহাকে দেখেন এমন এক ব্যক্তিও, আমরা যত দূর জানি, আচার্য্যের বন্ধু বা অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে নাই। তাঁহাকে পূজা করার ভাবমাত্রও তাঁহাদিগের নিকটে পাপ, এবং অতীব ঘৃণার্হ। প্রাচ্য জাতির অত্যুক্তিপ্রিয়তাবশতঃ তাঁহাকে সম্ভাষণকালে সময়ে সময়ে অত্যুক্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল কেবল তাঁহারই প্রতি প্রযোগ হয় তাহা নহে, অনেক সময়ে অন্যান্য ব্রাহ্মের প্রতিও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আচার্য্য যদি মনুষ্যপূজায় সায় এবং উৎসাহ দিতেন, তাহা হইলে আজ উহা ভীষণ পরিমাণে বাড়িয়া যাইত। এক সময়ে আমাদের প্রধান প্রচারকবর্গকে যে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হইত, কেবল চুপি চুপি ক্রমান্বয়ে নিরুৎসাহ দান করাতে এবং যে ভাবোচ্ছ্বাসে এরূপ হইয়াছিল আস্তে আস্তে তাহা হ্রাস পাইয়া যাওয়াতে, উহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে যে সায় এবং উৎসাহ দেওয়া হয় নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, দুই জন এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এজন্য ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। দুইজন ব্রাহ্ম আস্তে আস্তে বিকৃত ভাবোচ্ছ্বাসের দিকে গিয়াছিলেন; তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে আচার্য্য আপনাকে অদ্ভুতকর্ম্মা ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন। তিনি ইহা করিলেন না, তাঁহারাও শীঘ্র ছাড়িয়া গেলেন এবং কর্ত্তাভজার ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিলেন।

(৩৮) থিয়োডার পার্কার বলেন,—"যদি আগামী কল্যই আমি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে যে ভূমি হইতে আমার আহার্য্য শস্য উৎপন্ন হয়, তাহারই মত আমার নিকট আমার পিতৃপিতামহ হইবেন। প্রবৃত্তি অপেক্ষা উচ্চ বিধি আর আমার জ্ঞানের বিষয় থাকিবে না। নীতি একেবারে অন্তর্হিত হইবে।" এখানে যে যুক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা কি সুদৃঢ়? কোন অপৌরুষেয় গ্রন্থ বা অদ্ভুত ক্রিয়ায় বিশ্বাস করি না ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া পরলোকের অস্তিত্বের সুদৃঢ় প্রমাণ আমরা কোথা হইতে পাই?

পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে নীতি নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এই যুক্তি কেবল অবিশ্বাসের অসৎ ফল প্রদর্শন করে, কিন্তু আমরা অমরত্বের মতের

প্রতিপোষক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আত্মসত্তার এক অভিজ্ঞতা হইতেই প্রকৃষ্ট যুক্তি উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি আত্মাতে এবং ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি অমরত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

(৩৯) মেস্তর বয়সি সম্প্রতি তাঁহার একটি উপদেশে বলিয়াছেন,—"তিনি (কেশবচন্দ্র) বাপ্‌টিষ্ট জনের সঙ্গে, তাঁহার পর ঈশার সঙ্গে, তাঁহার পর প্রেরিত পলের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারের কথা বলেন; এবং এই সকল সাক্ষাৎকারের দৃষ্টিভ্রান্তি বিনা আর কিছু মূল আছে বিশ্বাস করিবার যদিও কোন কারণ নাই, তথাপি ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, এই সকল ব্যক্তির ভাব তিনি গভীর ভাবে পান করিয়াছেন।" এই সকল চাক্ষুষসাক্ষাৎকারের বাস্তবিকতায় আমি কখন বিশ্বাস করি নাই। আমার এরূপ বিশ্বাস করা ঠিক কি না, আপনি কি অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন?

আচার্য্য বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, তাঁহার জীবনে কখন ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বপ্ন দর্শন হয় নাই। যখন তিনি এক জন প্রকৃত ব্রাহ্ম, তখন চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারে তাঁহার বিশ্বাস নাই, এবং সে সকলকে তিনি নিয়ত দৃষ্টিভ্রান্তি মনে করেন। যদি তাঁহার সম্মুখে জন বা ঈশা বা পল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইতেন তাহা হইলে তিনি দৃষ্টিভ্রান্তি এবং ছায়ামূর্ত্তিমাত্র জ্ঞানে তৎপ্রতি উপহাস করিতেন। তিনিতো স্পষ্টই বলিয়াছেন, কখন তাঁহার চাক্ষুষ দর্শন হয় নাই। তাঁহার এরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, যখন তিনি শুভসংবাদ পড়িতে-ছিলেন, তন্মধ্যে যে তিন জনের জীবন্ত চরিত্র লেখা আছে তৎসহ তিনি অধ্যাত্ম-ভাবে কথোপকথন করিয়াছিলেন। মৃত অক্ষর নয়, কিন্তু গ্রন্থের জীবন্ত ভাব তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অগ্নিময় জীবন্ত কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল এবং সে কথা তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। স্বর্গগত ঋষিগণের আত্মা সহ যোগসম্বন্ধে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিকারশূন্য যে মত সেই মত তিনি প্রচার করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবনে প্রতিদিন এ প্রকার যোগ সম্ভব।

(৪০) আচার্য্য যখন ভবিষ্যবেত্তা মহাজনগণকে পবিত্রচরিত্র বলেন, তখন কি এই অর্থে উহা বলেন যে, তাঁহারা পাপশূন্য?

পূর্ণ পবিত্রতা কেবল ঈশ্বরেরই। ভবিষ্যবেত্তা মহাজনগণের সম্বন্ধে আচার্য্যকে এইরূপ অনেকবার বলিতে শুনা হইয়াছে যে, তাঁহাদের গুণাগুণসম্বন্ধে মত

প্রকাশে আচার্য্যের ক্ষমতা নাই এবং অধিকার নাই। তাঁহার ভাব এই যে, তিনি বিচার করিবেন না, কেবল সসম্ভ্রম প্রণত হইবেন। তাঁহাদের নীতি-ঘটিত চরিত্রসম্বন্ধে বিচার করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই; কেবল ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তা মহাজন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ভাল বাসিবেন এবং সম্ভ্রম করিবেন।

উপরে যে সকল প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রদত্ত হইল, তাহা ছাড়া আরও সাতটি প্রশ্ন উত্তরপ্রদানার্থ মিররে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর পত্রিকায় নিবদ্ধ নাই। মনে হয়, সময়াভাববশতঃ এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই, অন্যথা এ সকল প্রশ্নের ভিতরে এমন কোন গুরুতর কথা ছিল না, যাহার উত্তর দেওয়া কেশবচন্দ্র সদ্‌যুক্তি মনে করেন নাই। এই সকল প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন আছে, যাহার উত্তর চত্বারিংশত্তম প্রশ্নের উত্তরেই আছে, আবার কেন ঈদৃশ প্রশ্ন করা হইল আমরা বুঝিতে পারি না। প্রশ্নটি এই—"আচার্য্য আপনার সম্বন্ধে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন;—'এক জন অপুণ্যাত্মা ভবিষ্যদ্বক্তা মহাজন নীতিসঙ্গত যুক্তিতে অসম্ভব।' কৃষ্ণ তবে কি?" যখন আচার্য্য বলিতেছেন—"তাঁহাদের (মহাজনদের) নীতিঘটিত চরিত্রসম্বন্ধে বিচার করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই" তখন আর এ প্রশ্ন কেন? সাধারণ লোকে যে কুৎসিতচরিত্রতা শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করে, কেশবচন্দ্র তাহা অণুমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, ইহা আমরা তাঁহার মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিতেন তাঁহার আপনার লিপি ও উপদেশে প্রকাশিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমধর্ম্মের আদিপ্রবর্ত্তয়িতা শ্রীচৈতন্য সেই ধর্ম্মের সংস্কারক, ইহাই কেশবচন্দ্রের বিশেষ মত।

উনপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক।

ধর্ম্মতত্ত্ব এই উৎসবের বৃত্তান্ত এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন;—"একবর্ষ কাল দুঃখকর ঘোর পরীক্ষার পর আমাদিগের সাংবৎসরিক উৎসব সমুদায় পরিতপ্তকে শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে আকর্ষণ করিলেন। প্রবল গ্রীষ্মের উত্তাপে ঘন মেঘের সঞ্চার হয় এবং উহার দৃশ্যই সকলের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে। উৎসব প্রারম্ভের কতিপয় দিন পূর্ব্বে প্রার্থনা উপাসনায় যে ঘন মেঘের সঞ্চার হয়, উহা উৎসবের দিনে প্রচুর পরিমাণে শান্তবারি বর্ষণ করিয়া সকলের তাপিত আত্মাকে চির সুশীতল করিয়াছে। যিনি এবারকার উৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনি কি আর কখন ঈশ্বরের অনুপম অলৌকিক করুণায় নিরাশ হইতে পারেন? উৎসবানন্দবিধাতা পরমেশ্বরের সম্মুখে কৈ নিরাশার ঘন অন্ধকার তো ক্ষণ-কালের জন্যও তিষ্ঠিতে পারিল না? তিনি আপনি গম্ভীরস্বরে নিরাশকে আশা দিলেন, নিরুৎসাহীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন, অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস খণ্ডন করিলেন, সন্তপ্ত হৃদয়ে অমৃতবারি বর্ষণ করিলেন। আমাদিগের সংশয়, ভয়, ও অল্পবিশ্বাস নিমেষের মধ্যে আকাশে বিলীন হইল। জীবন্ত ঈশ্বর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কোন ঘটনাকে আপনার মঙ্গলকর অভিপ্রায়ে পরিণত না করিয়া নিরস্ত হয়েন না। এবারকার সমুদায় পরীক্ষা ও বিপদ আশা উৎসাহ এবং শান্তিতে পরিণত হইল। আমরা কিরূপ কথায় করুণাময় পরমপুরুষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার অনুপম করুণা দেখিয়া আমাদিগকে একান্ত অবাক্ এবং নিস্তব্ধ হইতে হইয়াছে। আর কি বলিব? সহস্র পরীক্ষা বিপদ দেখিয়াও যেন আমাদিগের মন আর কখন অবসন্ন না হয়। যে পরিমাণে পরীক্ষাবিপদ সেই পরিমাণে শান্তিবারি বর্ষণ, উৎসাহানন্দবর্দ্ধন, ইহাতে যেন আমাদিগের চিরদিনের জন্য স্থিরতর বিশ্বাস অবস্থান করে।"

৭ মাঘ (১৮০০ শক) রবিবার প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন

হইয়া উৎসবের আরম্ভ হয়। সায়ংকালে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন তাহাতে রসনার আশ্চর্য্যক্ষমতা সকলের মনে বিশেষ ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। "রসনার সঙ্গে অমৃতধাম, পরলোকের কি সম্বন্ধ ? রসনাদ্বারা মিষ্টরস আস্বাদন করা যায়, মিষ্টকথা বলা যায়, এই কথাই সকলে জানে; কিন্তু ইহাতে যে পারমার্থিক রহস্য নিহিত আছে তাহা কে জানে ? আমি বলি রসনার মধ্যে স্বর্গের চাবি রহিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখ, যত ক্ষণ না রসনা বলিতে পারে আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, তত ক্ষণ স্বর্গরাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন; আর যখন রসনা বলিল, ঈশ্বর দর্শন হইল, তখনই স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। মানুষ সরল হইয়া জিহ্বা দ্বারা যেরূপ বলে সেইরূপ হইতে পারে। মানুষ জিহ্বা দ্বারা বলুক আমি বৈরাগী হইব, সে নিশ্চয় বৈরাগী হইবে। মানুষ কেবল জিহ্বা-দ্বারা বলুক আমি ভবসাগর পার হইব, সে ভবসাগর পার হইয়া যাইবে।" এরূপ হয় কেন ?"...কথাই ব্রহ্ম। যে কথা বলিতে পারিল না, যে শব্দ করিল না, সে ব্রহ্মের বল পাইল না।" "রসনার বাণী আর ব্রহ্মবাণী একই। ব্রহ্ম-বাণী রসনার শব্দ সামান্য বস্তু নহে।" কেশবচন্দ্র এরূপ বলিলেন কেন? রসনা হৃদয়ের দাস, হৃদয় যাহার যদ্রূপ, রসনার কথাও তাহার তদ্রূপ। কপটা-চরণে রসনাকে অনৃতবচনোচ্চারণে লোকে নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্তু রসনা একটু অবকাশ পাইলেই এমন কথা কহিয়া ফেলে যাহাতে সকল কপটাচরণের আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়।

৮ই মাঘ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার "আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেন পরিত্যাগ করি নাই" এই বিষয়ে ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। তিনি বক্তৃতার চরমে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আজও হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়। "তুষাররাশি পর্ব্বতশিখর পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, বৃক্ষ তাহার উৎপত্তিভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়া জীবিত থাকিতে পারে না, মৎস্য তাহার নিবাস জলরাশি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবনের আহ্লাদ রক্ষা করিতে পারে না, তবে আমি যেখানে জীবন এবং উন্নতি লাভ করিয়াছি, সেই বায়ুমণ্ডলী হইতে আমার আত্মাকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিব ? ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, আমার আত্মা উন্নতি লাভ করিয়াছে, আমার হৃদয় উহারই ভূমিতে মূলবদ্ধ

করিয়াছে, উহারই উচ্চ শিখরে আমার ক্ষত বিক্ষত পাপ আত্মা বহুকাল শান্তিতে এবং লাভে অধিবাস করিয়াছে; এখন এত বয়সে সেই মাতৃসমাজের বক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিবাদ বিদ্বেষের কঠোর শৈলে আহত হইয়া কি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে পারি? এই আমার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ না করার যুক্তি। ঈশ্বর তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আমা হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন।" ৯ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতে কেশবচন্দ্রের গৃহের দৈনিক নিয়মিত উপাসনার পর সমবেত বন্ধুমণ্ডলী একত্র সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তথা হইতে বহির্গত হইয়া নূতন নির্ম্মিত প্রচারকগণের বাসগৃহে উপনীত হন। তথায় প্রার্থনান্তনর গৃহপ্রতিষ্ঠা এবং মঙ্গলবাড়ী নামকরণ হয়। কেশবচন্দ্র যখন কলুটোলার পৈতৃক বাটী হইতে বহির্গত হইয়া অপার সার্কুলার রোডস্থ গৃহ আপনার বাসস্থান নির্ণয় করেন, সেই হইতে প্রচারকগণের গৃহ নির্ম্মাণ হয় এজন্ম কেশবচন্দ্র ব্যস্ত হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আপনার ভূমিখণ্ড হইতে অনুমান সাতশত টাকা মূল্যের ভূমি প্রচারবিভাগে দান করেন। এই ভূমিখণ্ডের উপরে গৃহ নির্ম্মাণ হয়। এই গৃহ মঙ্গলবাড়ীনামে আখ্যাত। এক দিন ভক্তিভাজনপ্রধানাচার্য্য মহাশয় কেশবচন্দ্রের সহিতসাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি কমলকুটীরের তদানীন্তন গাড়ীবারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া মঙ্গলবাড়ী ও তৎ-সংলগ্ন গৃহগুলি দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন, এ সমুদায় যোগপ্রভাবে হইয়াছে। মঙ্গলবাড়ীর জন্য যে দান সংগ্রহ হয়, তাহাতে ভূমির মূল্য ধরিয়া ১,৬০৬ টাকা আইসে, এ টাকা ব্যয় হইয়া আরও কিছু টাকার প্রয়োজন থাকে।

এই দিন অপরাহ্নে আলবার্ট হলে ব্রাহ্মগণের সাধারণ সভা হয়। সভায় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রচারবিভাগের আয় ব্যয় পাঠ করেন। এই ঘোর আন্দোলনের সময়ে প্রচারকগণের উপজীবিকাবিষয়ে তাঁহাকে কি প্রকার পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছিল এবং সেই পরীক্ষা তাঁহার বিশ্বাস বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তাৎকালিক ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত এই কয়েকটী কথায় উহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইবে;—"প্রচারকগণের উপজীবিকাসম্বন্ধে এ বৎসর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষ পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছিল। সন্তান সন্ততি লইয়া প্রতিদিন প্রায় বাইট জন ব্যক্তিকে তাঁহার আহার যোগাইতে হয়।

আহার বা অন্য কোন বিষয়ে ঋণ পাইলেও ঋণ করিবার বিধি না থাকাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধাতার উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এমন দিন গিয়াছে, যে দিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কার্য্যালয়ে অর্থাগমের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া যেখান যেখান হইতে অর্থ আসিবার সম্ভাবনা ছিল তাহাতে তিনি নিরাশ হইয়াছেন। কল্য কি হইবে তৎসম্বন্ধে যেমন নিরাশ হইলেন, অমনি যে স্থান হইতে কিছু আসিবার সম্ভাবনা ছিল না সেই স্থান হইতে অর্থাগম হইয়া তাঁহার চিন্তা অপনয়ন করিল। এইরূপে এবার লোর অভাব এবং দুর্ম্মূল্যের মধ্যে যেরূপে একটি সুবৃহৎ পরিবার নিত্য আহার লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইয়াছে, এ পরিবার বিধাতার স্বহস্তে প্রতিপালিত এবং তিনিই ইহাদিগকে চিরদিন রক্ষা করিবেন। ঈদৃশ গুরুভার তিনি নিজে বহন করিতে একান্ত অসমর্থ। যদি তিনি এ সম্বন্ধে আপনার উপরে নির্ভর করিতে যান, তাঁহাকে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। এবারকার ঘটনায় তাঁহার বিশ্বাস সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং বিধাতার অপার করুণার জন্য তিনি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন।" ব্রাহ্মসমাজে এবার যে বিদ্বেষভাব প্রকাশ পাইয়াছে তজ্জন্য সভাঁর পক্ষ হইয়া সভাপতি দুঃখ ও উহা মঙ্গলে পরিণত হইবার আশা প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন তাহা পূর্ব্বে (৯৯৫ পৃষ্ঠায়) লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১০ মাঘ অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় টাউন হলে "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন" বিষয়ে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দেন। প্রায় দুই সহস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। রেবারেণ্ড ডাক্তার থোবরণ, রেবারেণ্ড কে, এস, ম্যাকডোনাল্ড, রেবারেণ্ড মেস্তর আষ্টিন, রেবারেণ্ড সি এইচ এ ডল্, জেনারেল লিচ ফিল্ড, মেস্তর এবং মিস্রেস জে বি নাইট, মিস ষ্ট্রেঞ্জ, ডাক্তার ডি বি স্মিথ, মেস্তর ইউল, মেস্তর ওয়াষ্টালস, মেস্তর রিডল্, মেস্তর সি টি ডেবিস, অনরেবল সৈয়দ আহম্মদ সি এস আই প্রভৃতি শ্রোতৃবর্গমধ্যে ছিলেন। "হলটি লোকে পূর্ণ হইয়াছিল এবং সকলে অতি উৎসুক অন্তঃকরণে স্থির শান্তভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন। বক্তৃতার ওজস্বিতা তেজ এবং বলে সকলে অভিভূত হইয়াছিলেন, একটি নিশ্বাসও তদ্বিরুদ্ধে নিপতিত হয় নাই।" তখন হয় নাই বটে, কিন্তু কয়েকদিন মধ্যে এই বক্তৃতা লইয়া প্রতিবাদকারিগণমধ্যে মহাহুলস্থুল পড়িয়া

যায়। এই বক্তৃতার মধ্যে এই কয়েকটি অংশ প্রতিবাদকারিগণের লক্ষ্য স্থলে নিপতিত হইয়াছিল ;—(১) কেশবচন্দ্রের বিশেষ ভাব—"অবশ্য আমার নিজের বিশেষ ভাব আছে এবং অন্যের মত আমি নহি। বিশেষ ভাব থাকাতে এই দণ্ড (তাঁহাকে বুঝিতে না পারা) আমাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে।" এই বিশেষ ভাব—অল্পবয়সে বৈরাগ্য ; কল্যকার জন্য চিন্তাত্যাগ ; বিবাহিত হইয়াও যেন পত্নী নাই ঈদৃশ ভাব ; অনুতাপ ; ঈশ্বরকেই একমাত্র সর্ব্বস্ব করা শাস্ত্র করা ; স্বদেশ ধর্ম্মসমাজ ও ঈশ্বরের কৃপার নিকট আত্মবিক্রয় ; স্বয়ং অজ্ঞানী প্রার্থনাযোগে জ্ঞানলাভ ; প্রকাণ্ড অট্টালিকা মধ্যে কুটীরে বাস ; ভাবের উত্তেজনা হইলে জ্বলন্তবাক্য উচ্চারণ ; ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণ ; স্বয়ং ঈশ্বর প্রমাণিত করিলে সত্য গ্রহণ ; বিবিধ পাপের সম্ভাবনা হৃদয়ে বিদ্যমান ; অথচ পাপী জানিয়াও হৃদয়কুটীরে ঈশ্বরের আগমন ; বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্ব, বিজ্ঞানবিরোধী মত দূরে পরিহার। (২) সত্যপ্রচারসম্বন্ধে স্বাধীনতা ও দায়িত্বের অভাব ; ঈশ্বরের আদেশে কৃত কার্য্যের জন্য তিনি দোষী নহেন, যদি দোষ থাকে তাহা ঈশ্বরের। (৩) তিনি যে সত্যপ্রচারের জন্য নিযুক্ত বিরোধীও সে সত্য গ্রহণ করিতেছেন, নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন। (৪) ভারতকে কেহ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না।

প্রতিবাদিকারিগণ এই বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া আপনার কি বলিয়াছেন একবার তৎপ্রতি শ্রবণপাত করা যাউক। তাঁহারা বলিতেছেন, "যে এক ব্যক্তির হস্তে তাঁহারা (ব্রাহ্মেরা) ব্রাহ্মধর্ম্মের কল্যাণের ভার দিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন তিনি এখন কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। যে পবিত্র দিনে রাম মোহন রায় একমাত্র অভ্রান্ত অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র দিবসে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন এই নগরের প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, 'ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তিনি যাহা করেন, যাহা বলেন তাহা ঈশ্বরের কার্য্য, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। যদি তাঁহার কার্য্যের কোন দোষ হইয়া থাকে, সে দোষ তাঁহার নহে তাহা ঈশ্বরের দোষ।' ইহার পর আর কি বলিবার অবশিষ্ট আছে? ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে অধিনায়ক আদি সমাজের ট্রষ্টীদিগের সামান্য বৈষয়িক কর্তৃত্ব অসহনীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, অদ্য তিনি আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব

সংস্থাপন করিতেছেন—তিনি ঈশ্বরের সহিত একত্ব কল্পনা করিতেছেন? এক মুখে তিনি বলিতেছেন, আমি পাপী ও জগতের পথপ্রদর্শক হইতে পারি না; অন্য মুখে আবার তিনিই বলিতেছেন, আমার কার্য্যের কোন দোষ থাকিতে পারে না, ঈশ্বরের মুখে আদেশ না শুনিয়া আমি কোন কথা বলি না ও কোন কার্য্য করি না। সামান্য সংসারিক বিষয়ে যিনি নিজের পাপ স্বীকার করিতেছেন, গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিতেছেন। একই আত্মার অবস্থাদ্বয় কি প্রকারে এরূপ পরস্পর অসংলগ্ন হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করা যায় না। যে আত্মা অহঙ্কার, হিংসা, ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা, প্রতিহিংসা, অনৃতপরায়ণতা প্রভৃতি পাপের অধীন, সে আত্মা কি প্রকারে অভ্রান্ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই সকল পাপ থাকিলে এক ব্যক্তি জড়-বিজ্ঞানশাস্ত্রবিষয়ে অভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে অভ্রান্ত হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের 'বর্ণমালা' চিত্তশুদ্ধি। যাহার চিত্তই শুদ্ধ নহে, সে আবার অভ্রান্ত কি? কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে এক ব্যক্তির হৃদয়ে কোন বিশেষ সত্য প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার সকল ভাবই ঈশ্বরের অনুগত হইতে পারে না এবং তাহার কার্য্যের জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন।" "কেশববাবু স্বীয় অভ্রান্ততা পোষকতার জন্য বলিয়াছেন, 'আমি আমিত্ব জানি না ঐ ব্যক্তিত্ব কোথায়? উহার অস্তিত্ব নাই। 'আমি' নামক ক্ষুদ্র বিহঙ্গটী অনেক দিন হইল এই আবাস ত্যাগ করিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে; আর ফিরিয়া আসিবে না। আমার ঈশ্বর বহুদিন আমার ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিয়াছেন।' ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা। ঈশ্বর আমাদের কার্য্যের ফলাফলের জন্য দায়ী নহেন, আমাদিগকে তিনি স্বতন্ত্র করিয়াছেন।......আমরা প্রকৃতিগত একত্ব স্বীকার করি না, কিন্তু ইচ্ছাগত একত্ব স্বীকার করি। ঈশ্বর ও আত্মা পরস্পর স্বতন্ত্র, তাঁহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; কিন্তু যখন আত্মা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়, তখন পরস্পরের যোগ হয়। এই পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত। কিন্তু সেই একতা কখন সম্ভব? "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়:" তখন কিয়ৎ পরিমাণে একতা ও কিয়ৎ পরিমাণে স্বতন্ত্রতা অসম্ভব। যাহার মোহ পাশ ছেদন হয় নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব বিনাশ হয় নাই। সংসারে যাহার ব্যক্তিত্ব আছে, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তাহার

ব্যক্তিত্ব আছে। কে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করিতে পারে?"

এই সকল কথার মধ্যে, "ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই," এই কথাটী সর্ব্বপ্রথমে বিবেচ্য। কেশবচন্দ্রের সমগ্র বক্তৃতা পাঠ করিয়া এই ঘোর অদ্বৈতবাদের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। সমুদায় বস্তুতে সমুদায় বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা—অদ্বৈতবাদের এই সারতত্ত্ব তিনি অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র ও ঈশ্বর যে অভিন্ন একই বস্তু ইহা তিনি তো একবারও বলেন নাই। তবে প্রতিবাদকারিগণের মনে এ কথা উঠিল কোথা হইতে? এই সকল কথা হইতে কি নয়? "আমার সত্য সকল, এ কথায় আমি সেই সকল সত্য মনে করি, যে সকল আমার জীবনের মূল সত্য, যে গুলি ঈশ্বর আমাকে বলিয়াছেন এবং আমার দেশীয় লোকদিগের নিকট প্রচার করিতে আমি নিযুক্ত। এই সকল সত্যকে আমার সত্য বলি। নিশ্চয়ই সাধারণ লোকে যে ভাবে 'আমার' সত্য বলিতে বোঝে সেরূপ হইতে পারে না। 'আমার' আমি জানি না। 'আমার' কোথায়, সে আমিত্ব কোথায়? ইহার অস্তিত্ব নাই। 'আমি' ক্ষুদ্র বিহঙ্গ অনেক দিন হইতে উড়িয়া কোথায় গিয়াছে আমি জানি না, আর কখন ফিরিয়া আসিবে না। আমার 'আমিত্ব' আমার ঈশ্বর কর্তৃক অনেক দিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে। আমার কিছুই নাই যাহা আমার।" প্রতিবাদকারিগণ Self এই শব্দের 'ব্যক্তিত্ব' অনুবাদ করিয়া ঘোর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। 'ব্যক্তিত্ব' ও 'আমিত্ব' এ দুই প্রতিশব্দ নহে, এ দুইয়ের অর্থ নিতান্ত পৃথক্। এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র স্বয়ং ঐ বক্তৃতায় পরক্ষণে যাহা বলিয়াছেন তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই সহজে ভ্রান্তি নিবারণ হইতে পারে। "যদি তোমরা বল এই সকল সত্য আমার, ঈশ্বরের নহে, তোমরা তাঁহার অবমাননা কর। আমার উচ্চ আমি ও নীচ আমি আছে, এবং এ দুইয়ের মধ্যে আমি পরিষ্কার প্রভেদক রেখা দেখিয়া থাকি। তোমরা আমার পাপসকলকে ঘৃণা করিতে পার, কিন্তু ঈশ্বর আমাতে যে উচ্চ আমি স্থাপন করিয়াছেন, যে আমি তাঁহাতে এবং তাঁহার ভিতর দিয়া চলে বলে কাজ করে, তাহাকে তোমরা প্রতিরোধ করিতে পার না। আমার জীবনের কাজ কেউ প্রতিরোধ করিতে পারে না,

কারণ তাহা ঈশ্বরের। তোমরা গিয়া পৃথিবীতে বিদ্যালয় স্থাপন কর, মন্দির স্থাপন কর, দীনগণকে ভিক্ষা দান কর। যেমন তোমাদের বিশেষ বিশেষ ভাব ও কার্য্য আছে আমারও সেই প্রকার বিশেষ ভাব ও কার্য্য আছে। যদি তোমরা আমার ভাব সকল গ্রহণ কর, তাহা হইলেই তোমরা আমায় তোমাদের হৃদয়ে স্থান দিলে। তখনই আমি তোমাদের হৃদয়গত হইয়াছি, সেখানে স্থান পাইয়াছি, তোমরা আমায় তাড়াইতে পার না। কুড়ি বৎসর আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, এখন আর তোমরা আমায় বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পার না। তোমাদের দেহের শিরা স্নায়ু, তোমাদের হৃদয়ের সংস্কার ও সহানুভূতিসমূহ আমি অধিকার করিয়া বসিয়াছি। দেখ! সত্য ও করুণার ঈশ্বর সহ আমি তোমাদের ভিতরে।' তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং মুক্ত করিবেন।" এ সকল কথাগুলি পাঠ করিলে কি আর অস্তিত্ববিলোপ বুঝায়, না অস্তিত্বের নিত্যস্থায়িত্ব বুঝায়? মানুষের নীচ আমি পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল, উচ্চ আমি দেবত্ববিশিষ্ট, নিত্যকালস্থায়ী, ঈশ্বরে চির উন্নতিশীল। জড় হইতে পশু, পশু হইতে মানব, মানব হইতে দেবতার উত্থান কেশবচন্দ্র পূর্ব্ব হইতে মানিতেন, সুতরাং ইহা আর কিছু তাঁহার নূতন মত নয়। 'সে আমিত্ব কোথায়, তাহার অস্তিত্ব নাই।' 'আমার আমিত্ব আমার ঈশ্বর কর্তৃক অনেক দিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে।' এ সকল কথা নীচ আমিত্বসম্বন্ধে। এ নীচ আমিত্ব সত্যসম্বন্ধে জীবনের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্বন্ধে বিলুপ্ত। 'তিনি যাহা করেন, যাহা বলেন তাহা ঈশ্বরের কার্য্য, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন,' এ সকল কথার ভাব বোঝা কি আর এখন কঠিন রহিল? উপরে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই কি অন্তর্গত ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই? তিনি বলিয়াছেন, "আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি এক জন পাপী, তথাপি আমি কতকগুলি সত্য প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত। আমার দেশকে এই সত্যগুলি দেওয়া আমার জীবনের বিশেষ কার্য্য। যত দিন আমি জীবিত থাকিব, তত দিন আমি এ কার্য্য অবশ্য করিব। আমি কি আমার জীবনের কার্য্য অস্বীকার এবং আমি আমাকে মিথ্যাবাদী করিতে পারি? এরূপ করা আমার জীবন ও ঈশ্বরের সত্য উভয়কেই বলি অর্পণ করা। এ কার্য্য করিতে গিয়া, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমি কিছু অন্যায় করি নাই। আমার

ইচ্ছা নয় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতে আমি যত্ন করিয়াছি। আমার সহিত আমার সঙ্গতিরক্ষা আমি চিরদিন প্রমাণিত করিয়াছি, এবং আমার নিয়তির অখণ্ডভাব রক্ষা করিয়াছি। স্বয়ং ঈশ্বর আমার উপরে যে কার্য্য ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহা পূর্ণ করা আমার যত দূর সাধ্য, ঈশ্বর জানেন, আমি বিনম্রভাবে করিয়াছি। আমার চারি দিকের লোকেরা তাঁহাদের ভাব ও অধিকার কেমন স্বাধীন ভাবে রক্ষা করিয়া চলেন! আমার ধর্ম্মসম্পর্কীণ কোন স্বাধীনতা নাই। যে সকল সত্য প্রচার করিতে আমি পাইয়াছি সে সকলের জন্য আমি দায়ী নহি। আমি ইহা নির্ভয়ে এই বৃহৎ সভার সম্মুখে বলিতেছি। ঈশ্বরের আজ্ঞায় আমি যাহা করিয়াছি তজ্জন্য আমি নিশ্চয়ই দোষী নহি। যদি কাহাকেও দোষ দিতে হয়, তাহা হইলে স্বর্গের অধীশ্বরকেই উত্তর দিতে হইবে, কেন না তিনিই শিখাইয়াছেন এবং আমার দেশের মঙ্গলের জন্য লোকের অপ্রিয় কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন।" এখানে কেশবচন্দ্রের এরূপ সাহসের কথা প্রতিবাদকারিগণের নিকটে নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস করিবেন, কেশবচন্দ্র সত্যপ্রচার ও তদনুষ্ঠানে সর্ব্বথা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত ছিলেন, তাঁহাদের নিকটে আর উহা অণুমাত্র সাহসিকতা মনে হইবে না। "যখন আত্মা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়, তখন পরস্পরের যোগ হয়। এই পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত।" প্রতিবাদকারিগণের এই মত যদি কেশবচন্দ্রে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কি আর তিনি কিছু অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন তাঁহারা বলিতে পারেন? তবে তাঁহারা বলিবেন, কেশবচন্দ্র যখন আপনাতে অহঙ্কার হিংসাদি পাপ স্বীকার করিয়াছেন, তখন ইচ্ছাতে তিনি ঈশ্বর সহ অভিন্ন, ইহা স্বীকার করা যাইবে কি প্রকারে? পাপসত্ত্বে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ অসম্ভবই বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ মত কি, বিচার করিলে এ অসঙ্গতিও কিছুই নহে স্পষ্ট সকলে দেখিতে পাইবেন।

কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, "আমি পৃথিবীর পাপীদিগের মধ্যে এক জন, সাধুগণের মধ্যে নহি। আমি মুক্ত হই নাই; কে আমাকে ইহা বলিয়া দেয়? আমার বিবেক, আমার অন্তর্গত আত্মচেতনা।......হয়তো আমায় বলা হইবে— আপনি এত বিনীত বিনম্র; আপনি কেবল আপনার অনুপযুক্ততা স্বীকারের

প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমি ভাবুক নই। আমি খেয়াল বা কল্পনার অধীন নই। আমার জীবনে কখন ধর্ম্মসম্পর্কে স্বপ্নদর্শন ঘটে নাই। আমার জীবন ঠিক যাহা তাহাই। আমি আমার নিজ চক্ষে আমার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার পাপের মূল দেখিতে পাই। তাহাদের সম্বন্ধে আমি সচেতন। তাহারা কাল্পনিক পাপ নয়, বাস্তবিক পাপ। তাহাদের কি নাম করিব? তাহারা অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, হিংসা; কাম, অকৃতজ্ঞতা, ক্রোধ, দ্বেষ। আরও অধিক কি বলিব? মিথ্যা, অনৃতবাদ, জাল, কেবল এই নয়, নরহত্যা * পর্য্যন্ত। আপনাদিগকে আমি যেমন দেখিতেছি, তেমনি আমার মধ্যে এই সকল পাপের মূল আমি স্পষ্ট দেখিতেছি। যখনি আমি আমার ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে যাই, তখনি আমি আমার ভিতরে এমন কিছু ভীষণ জঞ্জাল দেখিতে পাই, যাহা পরিষ্কৃত করা প্রয়োজন। এই সকল পাপ আমি কার্য্যে না করিয়া থাকিতে পারি। তাহাতে কি? পাপী কখন কৃত পাপকার্য্যের জন্য বিচারিত হয় না, পাপপ্রবৃত্তি দ্বারা বিচারিত হয়। ঈশ্বর বাহ্য কার্য্য লইয়া বিচার করেন না, বিচার করেন সামর্থ্য ও সম্ভাবনা লইয়া।" কেশবচন্দ্র তবে আপনাকে পাপী জানিতেন কেন? হৃদয়ে পাপের মূল ও সম্ভাবনা দেখিয়া। এই হৃদয়ই তবে তাঁহার নীচ আমি? এই হৃদয় ও উচ্চ আমিএ দুইয়ের মধ্যে তবে পার্থক্য কি? পার্থক্য—একটি শারীরিক, আর একটি আত্মিক জড়, পশু, মানব ও দেবতা এই চারিটি স্তরে কেশবচন্দ্র মানবজীবন বিভাগ করিয়াছেন। জড়ের গুণ—আলস্য, ঔদাসীন্য, দৌর্ব্বল্য; পশুর গুণ—হিংসা, দ্বেষ, প্রবৃত্তির অধীনতা, মানবগুণ—প্রজ্ঞা, দেবগুণ—শুদ্ধতা, পবিত্রতা, পুণ্য। "শরীর যখন আছে, কামক্রোধাদির মূলও আছে," "শারীরিক প্রবৃত্তি যখন আছে, তখন পাপের মূল সেইখানে" কেশবচন্দ্রের এ কথায় দেখাইয়া দেয় পাপের মূল বা সম্ভাবনা কোথায় অবস্থিত, তিনি বিশ্বাস করিতেন। পাপের মূল শরীর হইলেও উহা প্রবল হইয়া যখন আত্মাকে তদধীন করিয়া

* নরহত্যা পাপ তাঁহাতে কি প্রকারে সম্ভবে, এই বক্তৃতার পরেই আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি কখন তাঁহার মনে এরূপ ইচ্ছা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আমার সম্মুখে না আসুক, তখনই নরহত্যা পাপ হইল।

ফেলে, তখন সেই আত্মা 'নীচ আমি' আখ্যা লাভ করিয়া থাকে। যখন দেব-প্রভাবে নীচ আমি হতসামর্থ্য হয়, তখন দেবাধীন আত্মা উচ্চ আমি' আখ্যায় আখ্যাত হয়। কেশবচন্দ্র বিবেকালোকে পাপের মূল সকল দেখিয়া আপনি নিতান্ত অকিঞ্চন ও দীন হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করিতেন, কখন আমি সাধু নির্ম্মলচরিত্র এই অভিমানে স্ফীত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করেন নাই। এই অকিঞ্চনতা দীনতাই তাঁহাতে ঈশ্বর সহ অভিন্ন যোগের মূল। "পাপ—পাপ করিবার সম্ভাবনা" "আমি......পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখিয়াছি," কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলি দেখাইয়া দেয় তিনি জীবনে পাপাচরণ না করিয়াও কেন সর্ব্বদা আপনাকে পাপী বলিয়া ঘোষণা করিতেন। "উহা (বিশ্বাস) কেবল যে সকল কার্য্য করা হয় নাই, যে যে ত্রুটি হইয়াছে তাহার এবং অসাধু কার্য্য ও আলস্যের হিসাব রাখে," কেশবচন্দ্রের জীবনের ইহাই মূল-সূত্র। ঈশা যখন বলিলেন, "আমাকে ভাল বলিও না, ভাল কেবল স্বর্গস্থ পিতা, তখন তিনিও আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন এবং সেই অক্ষমতা জন্যই তাঁহাতে ইচ্ছাযোগ সম্ভবপর হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রসম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। সত্য, সত্যানুষ্ঠান, সত্যপ্রচার, এই তিন স্থলে তিনি আপনাকে নিয়ত ঈশ্বর সহ অভিন্ন দেখিতেন।

চতুর্দ্দশবর্ষবয়সে আমিষভোজন ত্যাগ এবং বিবাহান্তে বৈরাগ্যাচরণ এই দুইটির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া প্রতিবাদিগণ লিখিয়াছেন, "চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করা কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমরা এরূপ অনেক ব্যক্তির কথা জানি, যাঁহারা অক্ষয়কুমার দত্তের ''বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' নামক পুস্তক পাঠ করিয়া তদপেক্ষায় অল্পবয়সে আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এ কার্য্যটি এরূপ বিস্ময়কর নয় যে, ইহাকে একটি অলোকসামান্য ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার বিবাহের সময় তিনি (পলের) উপদেশ অনুসারে বৈরাগ্যাচরণ করিয়াছিলেন ; একথাটীও কোন ক্রমেই বলা রুচিসঙ্গত হয় নাই ;......এরূপ সময়ে বঙ্গদেশের অনেক যুবক বৈরাগ্যাচরণ করিয়া থাকে। ইহাতেই বা অত্যন্ত বিস্ময়জনক ব্যাপার কি? কেশববাবুর মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এগুলির উল্লেখ না করিলেও চলিত।" কেশবচন্দ্র যে ভাবে বক্তৃতায় এগুলির উল্লেখ করিয়াছেন প্রতিবাদিকারিগণ

যদি তৎপ্রতি মনোভিনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ব্যঙ্গোক্তি করিবার আর তাঁহাদের অবসর থাকিত না। চতুর্দ্দশ বর্ষবয়সে আমিষ ত্যাগের উল্লেখ করিয়া তিনি আপনি বলিয়াছেন, "বিষয়টি বিবেচনা করিলে উহা বহুসামান্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাব সঙ্গে সঙ্গে যাহা পরে আসিল তৎসহ বিবেচনা করিলে ইহা মহৎ পরিবর্ত্তন। বৈরাগ্য, ভোগত্যাগ, জীবন ও বিশ্বাসের সহজভাব, আমার জীবনের নিয়তি ছিল। পৃথিবীর যাহা কিছু ভোগৈশ্বর্য্য তাহা হইতে আমায় বঞ্চিত হইতে হইবে। ঐ ঘটনা অন্ততঃ দেখাইয়া দিতেছিল, বায়ু কোন্ দিকে বহিতেছিল।" এই কথা গুলি পাঠ করিয়া কি এখন প্রতিবাদকারিগণ বলিবেন, আমিষভোজনত্যাগকেই কেশবচন্দ্র তাঁহার মহত্ত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? বিবাহান্তে বৈরাগ্যাচরণসম্বন্ধেও প্রতিবাদকারিগণের উপহাসোক্তি অস্থানে নিয়োজিত হইয়াছে। "তিনি (পল) আমায় বলিলেন, 'যাহাদের পত্নী আছে যেন পত্নী নাই এইরূপ তাহারা হউক;' এবং আমার জীবনের অতি সঙ্কট সময়ে এই কথা গুলি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় আমায় স্পর্শ করিল। তখন হয়তো আমার বিবাহ হইবে, অথবা এই মাত্র বিবাহ হইয়াছে। তখন আমার মনে এই দৃঢ়সংস্কার হইয়াছিল যে বিবাহ সাংসারিকতার দ্বারস্বরূপ এবং আমার আহ্লাদ হইল যে, পলের পত্রিকায় আমি সংস্কারানুরূপ উত্তর পাইলাম।" 'বিবাহ সাংসারিকতার দ্বারস্বরূপ' এই কয়েকটী কথা ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে ইহার মধ্যে যে তাদৃশ উপহাসের কোন কথা নাই, প্রতিবাদকারিগণের বুদ্ধিতে তাহা সহজে প্রবেশ করিবে। পলের কথায় তিনি বুঝিলেন যে, সংসারে থাকিয়া তিনি অসংসারীর জীবন যাপন করিবেন এবং সেই হইতে তিনি তদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন্ যুবক আর এই ভাবে কয়দিনের জন্ম ভোগ ত্যাগ করিয়া থাকেন? কেশবচন্দ্র সমগ্রজীবন কি ভাবে যাপন করিয়াছিলেন তাহা কি আমরা জানি না? "যাঁহাদের পত্নী আছে তাঁহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালনে যত্ন করুন এবং পত্নী অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভাল বাসুন। তাঁহারা গৃহের সমুদায় কর্ত্তব্য সাধন করুন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি উদ্দীপ্ত প্রেমরূপ বেদীসন্নিধানে পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাবে ইন্দ্রিয়লালসা ও সাংসারিকতা বলি অর্পণ করুন। ঈশ্বর-পরায়ণ স্বামী পত্নী কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া পাপ মনে করিবেন। পত্নীর নহে,

ঈশ্বরের সন্তোষ সাধন করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইবে।" এ কথাগুলি কেশবচন্দ্র আপনার জীবনের আচরণ হইতে বলিয়াছেন।*

প্রতিবাদকারিগণের অনুচিত যুক্তি নিরসন করিতে গিয়া আমরা মূল বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। এবার নগর সঙ্কীর্ত্তনে "সচ্চিদানন্দ" অঙ্কিত একটী অতিরিক্ত পতাকা নিবিষ্ট হয়। এ নিবেশ যদি ভাবের নূতন পরিবর্ত্তন প্রদর্শন না করিত, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ছিল। সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে এই পদবিন্যাসগুলি এই নূতন ভাব প্রদর্শন করে,—"হৃদয়নিকুঞ্জবনে, প্রাণবঁধুয়া

---

* এই বক্তৃতাসম্বন্ধে বয়সি সাহেব যে মত ব্যক্ত করেন, আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতে পারি। কেশবচন্দ্রের চরিত্রের শুদ্ধতা, বিবিধ সুন্দর মনোহর গুণ, সত্যপরায়ণত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ইনি নিঃসংশয়। সুতরাং তিনি আপনার চরিত্র মধ্যে অহঙ্কার, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতির বাস্তবিক স্থিতি যে উল্লেখ করিয়াছেন, উহা স্নায়ুবিকারজনিত- বিষাদসমুত্থিত ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, বয়সি সাহেব এইরূপ মনে করেন। কেশবচন্দ্র আপনার অসাধারণতাবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে অসাধারণতা আছে তাহা ইনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে তিনি জন, ঈশা, পলের সহিত সাক্ষাৎকারের কথা যে বলিয়াছেন, উহা ইঁহার মতে ভ্রান্তিসমুদ্ভূত। জনের অনুসরণ করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন, ঈশার অনুসরণে কল্যকার জন্য চিন্তাত্যাগ, পলের উপদেশানুসারে পত্নী থাকিতেও পত্নী না থাকার ন্যায় জীবন যাপন, এইগুলি ইঁহার নিতান্ত অননুমোদিত। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ভোগ পরিত্যাগ না করিয়া জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সুচারুভাবে সম্পাদন করিবেন এরূপ অভিলাষ ইনি প্রকাশ করেন। 'কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরের সহিত মধুর সম্বন্ধের ইনি অতিমাত্র প্রশংসা করেন, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত তাঁহার নিকট সম্বন্ধ ও তৎপরিচালন জন্য তিনি অপরের হৃদয়ের উপরে অধিকার স্থাপন করিতে যে চান, ইহা ইঁহার মতে অতিশোচনীয়। তিনি আপনার জীবনের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না তৎসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলেরই হৃদয়ে জাগরূক রাখা সমুচিত, ইহা বয়সি সাহেবের মত। কি আশ্চর্য্য, বয়সি সাহেব যে জন্য কেশবচন্দ্রকে রোগিগ্রস্ত মনে করিয়া বলিয়াছেন 'নিউইয়র্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' তজ্জন্যই তাঁহার প্রশংসা করেন। ঐ পত্রিকা এই বলিয়া মন্তব্য শেষ করিয়াছেন "খ্রীষ্টানধর্ম্ম যাহার নাম, তদপেক্ষা ইঁহার ধর্ম্ম সমধিক ধার্ম্মিকতাপূর্ণ, কারণ ইহাতে গভীর পাপবোধ আছে এবং সাক্ষাৎ ক্ষমাশীল ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব করে।'

সনে, করিব বিহার সবে। প্রেমবিলাসরসে" "বাহু পসারিয়ে, ব্যাকুল হইয়ে ধরিব সবার শ্রীচরণ; হিয়ার ভিতরে অনুরাগ ভরে, দিব গাঢ় প্রেম আলিঙ্গন। (আবেশে বিভোর হয়ে)" "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ আনন্দঘন; (মন মজিলরে রূপ নেহারিয়ে) এরূপ প্রেমিকের নয়নাঞ্জন।" ইত্যাদি। ১৪ মাঘ রবিবার সমুদায় দিনব্যাপী উৎসব। এই দিন প্রাতে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহাতে নবভাবের প্রবেশ অতি সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে। এত দিন ব্রাহ্মসমাজে পুরুষভাবেরই প্রাধান্য ছিল, নারীভাব প্রস্ফুটাকারে প্রকাশ পায় নাই। নারীভাব প্রস্ফুটিত না হইলে স্বর্গে ঈশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ কবিবার অধিকার লাভ করিতে পারা যায় না, এজন্য পুরুষের ভিতর হইতে নারী উৎপন্ন হয়। ধ্যান, যোগ এবং জ্ঞানকাণ্ড সাধনের জন্য পুরুষপ্রকৃতির সৃষ্টি। ঋষি প্রকৃতি পুরুষের প্রকৃতি। ব্রহ্মের তেজ হইতে, দক্ষিণ বাহু হইতে পুরুষের উৎপত্তি, অতএব সেখানে আলস্য ঔদাসীন্য, নির্জীব নিস্তেজ জঘন্য ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। পুরুষ এক হুঙ্কারে পাপপাশ ছেদন করেন। একবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সাংসারিক ভোগ বিলাস দূরে পরিহার করিয়া পুরুষ আর দ্বিতীয় বার সে সমুদায় পরিগ্রহ করিতে পারেন না। এই নরপ্রকৃতি হইতে নারীপ্রকৃতি বাহির হইল। পুরুষ হইয়া ব্রহ্মসন্নিধানে উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম বলিলেন, "এখানে তোমার প্রবেশাধিকার নাই। নারীজাতিতে গিয়া তুমি নব জন্মগ্রহণ কর।" পুরুষের এই নারীজাতিতে জন্মগ্রহণ করাই স্বর্গরাজ্যে পুনর্জন্ম। পুরুষপ্রকৃতি হইতে যে নারীর জন্ম হইল তাঁহার বিবাহ হইল ধর্ম্মের সঙ্গে। "মূল কথা, বিবাহের মূল মন্ত্র পতিব্রত হওয়া। যেখানে ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রহ্মকন্যার বিবাহ হয় সেই দেশে পাপ ব্যভিচার আসিতে পারে না। এই শ্রদ্ধেয়া পতিব্রতা ব্রহ্মকন্যা কেবল পতি পতি, পতি বলিয়া ডাকিতেছেন, পতি ভিন্ন তিনি আর কাহাকেও জানেন না, পতি ভিন্ন তিনি আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। ব্রহ্মকন্যা ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। পতিব্রতা অন্যের পানে তাকান না, অন্যের বাড়ী যান না। তাঁহার দৃষ্টি পতির দিকে সর্ব্বদা স্থির রহিয়াছে। সতীত্ব তাঁহার চক্ষুর অঞ্জন। সতী বলেন ধর্ম্ম ভিন্ন আমার জন্ম বৃথা, ধর্ম্ম ভিন্ন আমি বাঁচিতে পারি না।" কেশবচন্দ্র উপদেশ এই সকল কথায় শেষ করিয়াছেন;—

"ভাই, পুরুষপ্রকৃতি সাধন করিয়া নীতিজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে এখন নারী হও। পুরুষ নারী হইবে ইহা উপহাসের কথা। পৃথিবীর লোক বলিবে পুরুষ কি কখন নারী হয়? না হইলে এই কথা হইল কেন? ব্রহ্মপুত্র, তুমি ব্রহ্মকন্যা হইবে কবে? পতিধন পুরুষ কিরূপে বুঝিবে নারী না হইলে? নারী না হইলে সতীত্বধর্ম্ম কিরূপে জানিবে? সতী যেমন আপনার স্বামীকে ভালবাসে, কবে সেইরূপ অবিভক্ত প্রেমের সহিত হরিকে আমরা ভাল বাসিব? স্বর্গের নারীপ্রকৃতি এবং হরিভক্ত অভিন্ন। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে, প্রেমরাজ্যে, ভক্তিরাজ্যে একটিও পুরুষ নাই, যাই সেখানে পুরুষ প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোক হইয়া গেল। কবে স্ত্রীজাতির সঙ্গে, হরিকন্যাদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া আমরা হরিপাদপদ্ম পূজা করিব? স্বর্গের ভক্তগণ, হরিকন্যাগণ, তোমরা প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরিনামগুণ গান কর। ব্রহ্মকন্যা, তুমি তোমার অবিভক্ত প্রেম এবং অচলা ভক্তির আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে ভক্ত এবং সুখী কর। এখন হরিকন্যার ধর্ম্মগ্রহণ না করিলে কেহই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধার্ম্মিক হইতে পারিবে না। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভক্তির ধর্ম্ম না হইলে এই জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? স্বর্গরাজ্যের অন্তঃপুর, তোমার দ্বার খুলিয়া দাও। হে হরি, হে জননী, তুমি আমাদিগকে তোমার ভিতর লুকাইয়া রাখ। হে শ্রীহরি, তুমি আমার এই বন্ধুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া তোমার অন্তঃপুরে রাখ। এই উৎসবে এই সার কথা। নারীপ্রকৃতি পাইয়া যিনি নারীর নারী প্রধানা নারী জগজ্জননী, তাঁহার অন্তঃপুরে বাস করিয়া কেবলই সুখে বাস করিব। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু আমাদিগের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

সায়ংকালে প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তনের পর কেশবচন্দ্র যে কথাগুলি বলেন, তাহাতে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হয়। বিস্তারভয়ে আমরা তাঁহার কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। ১৪ মাঘের মধ্যাহ্নকালীন ধ্যানের উদ্বোধন এবং ১৫ মাঘ ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসবের উপদেশ অতিহৃদয়হারী এবং নবভাবের ব্যঞ্জক হইলেও এ দুইটি পরিত্যাগ করিয়া সায়ঙ্কালে সাধারণ লোকদিগকে আখ্যায়িকাচ্ছলে কেশবচন্দ্র যে উপদেশটি দেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। অতি গভীর ভাব সাধারণের হৃদয়ে তিনি কেমন অতি সরল সহজ ভাবে মুদ্রিত করিতে পারিতেন, এই আখ্যায়িকা তাহা প্রদর্শন করে :—

"দেশীয় ভ্রাতৃগণ, মেদিনীপুরে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। এক জনের নাম হরিদাস, আর এক জনের নাম কড়ীদাস। হরিদাস কনিষ্ঠ। এক দিন কড়ীদাস নিদ্রায় অচেতন হইয়া একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটি এই;—তিনি যেন আরাধনা করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, তুমি কি বর চাও? কি পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও? কড়ীদাস বলিলেন, ঠাকুর আমাকে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য দাও, আমাকে ভৃত্য দাও। ভগবান্ কড়ীদাসের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, তুমি পাইবে। কড়ীদাস বুঝিলেন, ভগবান্ তাঁহার সহায় হইয়াছেন তাঁহার আর দুঃখ থাকিবে না। কড়ীদাসের অনেক ধন ঐশ্বর্য্য হইল, তোষামোদ করিবার জন্য অনেক লোক আসিল, কিন্তু তার পর শুন কি হইল? কড়ীদাস বাণিজ্যব্যবসায় করিয়া হাজার পাঁচ ছয় টাকা অর্জ্জন করিলেন। সেই টাকাগুলি বাকসে রাখিয়া কড়ীদাস নিদ্রায় অচেতন হইলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া দেখেন সমস্ত টাকাগুলি উড়িয়া গিয়াছে, কেবল একটীমাত্র কড়ী রহিয়াছে। তিনি ভাবিলেন কেবল ধনকড়ী উপার্জ্জন করিলে হইবে না, কিন্তু ধন রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে। পরে তিনি যেমন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহার সঙ্গে গাড়ী ঘোড়া কাপড় এবং শাল প্রভৃতি কিনিলেন। কিন্তু গাড়ী রাখিয়াও অনেক সময় তাঁহাকে হাঁটিতে হইল, শালগুলি পোকাতে কাটিল। বিবাহ করিলেন, কতকগুলি সন্তান হইল, সন্তানগুলি দুষ্ট হইল, কেহ মদ্যপায়ী, কেহ ব্যভিচারী হইল। তিনি দেখিলেন সন্তান হওয়া অপেক্ষা না হওয়া ভাল ছিল। অনেক টাকা খরচ করিয়া বাড়ী করিলেন, বাড়ীতে সুখভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন এইরূপ বাড়ী না হওয়া ভাল ছিল। অনেক চাকর চাকরাণী রাখিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে নিজ হস্তে অনেক কার্য্য করিতে হইল, তিনি দেখিলেন এ সকল দাস দাসী থাকা অপেক্ষা না থাকা ভাল। তিনি অনেক অর্জ্জন করেন, কিন্তু যখনই বাকস খুলিয়া দেখেন তখনি কেবল একটী কড়ী দেখিতে পান। ভগবানের আরাধনা করিয়া তিনি কড়ীর উপরে আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার অদৃষ্টে কেবল কড়ী লেখা। এত বড় ধনী যিনি তিনি গরিব দুঃখী। নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে কিছুতেই সুখ পান না, আপনার চাকরদিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। খুব

বড় মানুষ হইলেন, সকলে বড় লোক বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেই সম্ভ্রম করিত, কিন্তু তিনি মনে করিলেন ইহারা আমাকে উপহাস করিতেছে। কড়ীদাস মনে করিতেন তাঁহার মত দুঃখী আর কেহ নাই। তাঁহার মুখে হাসি নাই, মুখ জিহ্বা বিকৃত, পোলাও হইলেও তাঁহার সুখ হয় না।

"সেই যে কনিষ্ঠ হরিদাস, তিনিও ভগবানের আরাধনা করিলেন। তিনি দেখিলেন ভগবান্ আশুতোষ তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বর চাও? হরিদাস বলিলেন, আমি কেবল হরিকে চাই, আর কিছু চাই না। প্রাতঃকালে তিনি জাগিয়া দেখিলেন তাঁহার মনে হরিভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি বারংবার ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর হইল, তিনি এক বার মনে ভাবিলেন আমিত হরিকে চাহিলাম, কিন্তু সংসার চলিবে কি প্রকারে? তিনি শাকান্ন সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু সেই শাকান্ন ভোজন করিয়া তিনি এত হাসিতে লাগিলেন যে, তাঁহার দাদা কড়ীদাস পোলাও খাইয়াও সে সুখ কল্পনা করিতে পারেন না। হরিদাসের চাকর-বাকর নাই, নিজেই বাসন মাজিতে লাগিলেন; তিনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হরিকে বাসন মাজিতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ঘরখানি ভাঙ্গা; কিন্তু তাহার ভিতরে চাঁদের আলোক আসিত। চাঁদের আলো ধরিয়া তাঁহার আনন্দ ধরিত না। তাঁহার কাছে কেহই আসে না; কিন্তু তিনি মনের আনন্দে মনে করেন সকলেইত আমার। পাড়ার লোক সকলে দেখিবামাত্র হরিদাসকে প্রণাম করে, কড়ীদাসের কেহ নামও করে না। হরিদাস গাছতলায় থাকেন, আকাশের তারা দেখিয়া বলেন ভগবান্ আমার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার একখানি কাপড় চুরী গেল, তাঁহার মনে মনে এই আহ্লাদ হইল দুই খানি কাপড়ত চুরী করিল না। কতক গুলি লোক তাঁহার অপমান করিল, তিনি এই বলিয়া আহ্লাদ করিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানত হইল না। হরিদাস গরিব, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বাহু তুলিয়া বগল বাজাইতেছেন। বাস্তবিক পাগলামি নহে ভক্তির উন্মত্ততা। হরিদাসের পতিব্রতা সতী স্ত্রী ধর্ম্মে যোগ দিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন করেন, হরিদাস বলিলেন আমার টাকা কড়ী নাই, কিন্তু আমার অনেক ধন রত্ন আছে। আমার চারিটি সন্তান, হীরা, মাণিক,

মণি, মুক্তা। কড়ীদাসের কি হইল? কড়ীও পাইল না, হরিকেও পাইল না, হরিদাসের দুইই হইল।"

১৬ মাঘ প্রত্যূষে সকলে সাধনকাননে গমন করেন। "সেখানে বৃক্ষনিচয় পরিবেষ্টিত উপাসনাস্থানেতে সকলে উপাসনার্থি মিলিত হন, স্থানের গাম্ভীর্য্য, নিস্তব্ধতার মধ্যে পক্ষিগণের মধুর ধ্বনি, প্রাচীরে অপরিবেষ্টিত উর্দ্ধস্থ আকাশ, সকলই সে সময়ে সেই পূর্ব্বকালের মহর্ষিগণের তপোভূমি স্মরণ করিয়া দিতেছিল। যেমন স্থান তেমনি মধুর উপাসনা।" আমরা উপদেশটি উদ্ধৃত না করিয়া প্রার্থনাংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

"হে দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ আর অপ্রকাশ, অত লুকাইয়া রাখ কেন? অত অপ্রকাশ করিয়া রাখ কেন? যদি হীরার বাক্সের ভিতরে একটি তৃণ রাখিয়া দিতে, সেই তৃণকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কত মানিতাম, আর যদি এই অশ্বথ ও বট বৃক্ষ গুলি সোণা দিয়া মোড়া হইত, ইহাদিগকে কত মূল্যবান্ জ্ঞান করিতাম। আর যদি তোমার পাখীগুলি জরির সাটিনের জামা পরিয়া এবং মুক্তার মালা গলায় দিয়া উড়িত এবং তানপুরা হাতে নিয়ে গান করিত, তাহা হইলে প্রাণের পাখী বলিয়া পৃথিবীর লোক গুলি ঘরে ঘরে কত আদর করিয়া লইয়া যাইত। রাস্তার তৃণগুলিকে কেহ গ্রাহ্য করে না, যাওয়ার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করে না তুমি কেমন আছ? আমাদিগের গায়ে দিলে শাল, আর যার শাল আছে তাহাকে শাল দিলে না। আমাদিগকে গানের অধ্যাপক করিলে, কিন্তু যে পাখী কত গান করে তাহাকে কেহ অধ্যাপক নাম দিল না। চণ্ডালেরা ব্রাহ্মণের আকার ধরে বড় জাঁক করছে। ব্রাহ্মণ তরু, ব্রাহ্মণ পাখী, কেন না তাহারা ব্রহ্মের জাতের। আমি যে শত অপরাধে অপরাধী. তৃণের এবং পাখীর গৌরব করিলাম না, আমার দ্বারা তোমার উদ্যানের অমর্য্যাদা হইল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণহত্যার দোষে দোষী হইয়া পাতকীর বেশে তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি। ব্রহ্মবাস করেন যে সকল বস্তুতে তাহাদের অনাদর করিলাম। তোমার বাগানের পুষ্পগুলি সুন্দরী স্ত্রী, তাঁহারা কেমন করিয়া মার পূজা করিতে হয় শিখাইয়া দেন। স্বাভাবিক বৈরাগ্যমন্ত্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কর। আড়ম্বর ছাড়িয়া দিই, আর বিকৃত স্থানে দুর্গন্ধে যেন মলিন না হই? বীজমন্ত্র তোমার সরল বৈরাগ্য, যাহাতে

ইন্দ্রিয় দোষ থাকে না বিকার থাকে না। তোমার বাগানের বৃক্ষলতা পুষ্পগুলি যোগী ঋষি হইয়া আমাদের মন ভুলাতে আসিয়াছেন। এই শুভ স্থানে এই শুভ ক্ষণে যে বেঁচে থাকে থাক্, এই শুভস্থানে এই শুভক্ষণে যে মুক্তি পাবে সে পাক্। মা, জননী, মনোহর বন্ধু, মঙ্গলময় হরি, প্রকৃতিগঙ্গায় আমাদিগকে স্নান করাইয়া তুমি এই অবাধ্য সংসারপরায়ণদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী করিয়া লও।"

মাঘের উৎসবে ব্রাহ্মসমাজের নতন বর্ষের আরম্ভ। পুরাতন বর্ষে কি কি বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়াছি, একটী ঘটনার উল্লেখ হয় নাই, সেটী বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক লিওনার্ড সাহেবলিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত। ইতিহাসলেখকের যাদৃশ নিরপেক্ষপাত সহকারে সমুদায় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন লিওনার্ড সাহেব তাহা করিতে পারেন নাই। উপযুক্তরূপ বৃত্তান্ত সংগ্রহ না করিয়া মতামত প্রকাশ যে নিতান্ত দূষণীয় হইবে এবং ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি অবিচার ঘটিবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। বলিতে গেলে এই ইতিবৃত্তখানিতে কেশবচন্দ্রের প্রতি সবিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। কোথায় কোথায় তিনি কিরূপ অবিচার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ ও তাহার নিরসন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। অনেক স্থলেই আমরা এ সকল কার্য্য ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকগণের হস্তে রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

এবার ২৯ জানুয়ারী (১৮৭৯) বুধবার আলবার্ট হলে ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে প্রায় তিন শত যুবক উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় কেশবচন্দ্রের অতি আদরের সামগ্রী। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়েই তাঁহার জীবনের প্রথম কার্য্যারম্ভ। এখানেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক মত ও বিশ্বাস ব্যাখ্যাত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম দার্শনিক ভূমিতে স্থাপিত ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতেই হইয়াছে। অধিকসঙ্খ্যক প্রচারক এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। যে বিদ্যালয় হইতে এতগুলি উপকার ব্রাহ্মসমাজ লাভ করিয়াছে, সে বিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবশ্য আনন্দ ও আশাবর্দ্ধক। শাস্ত্র, মত, খণ্ডন ও অধ্যাত্মতত্ত্ব, এই চারিভাগে বক্তব্যবিষয়ের বিভাগ হয়। কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠাদিনে "ঈশ্বরের অস্তিত্ব" বিষয়ে বলেন। আমাদিগের সমগ্র ধর্ম্মজীবন, প্রতিজনের মুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বানুভবের উপরে যখন নির্ভর করে, তখন এইটি সর্ব্বপ্রথম দিনের বক্তব্য বিষয় হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। তিনি যাহা বলেন তাহার সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে;—ঈশ্বর আছেন, ইহা কি আমরা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি? কল্পনাপ্রসূত দেবতার পূজা করিয়া কি মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আছে? পূর্ব্ববৎ বা শেষবৎ যে কোন প্রকারের ন্যায়দর্শনঘটিত প্রমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ নিতান্ত দুর্ব্বল। জগতের রচনাকৌশল হইতে এক জন পরমকৌশলী নিষ্পন্ন করা নিতান্ত বাহিরের বিষয়। জন্মান্ধের পক্ষে এ প্রমাণ প্রমাণই নহে। অনন্তত্বজ্ঞান, কারণজ্ঞান, সহজজ্ঞান, এ সকল পূর্ণ প্রমাণমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। আপনাকে আপনি ভাল করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে জানা হয়। সক্রেটিস্ আত্মজ্ঞান প্রচার করিলেন। আপনাকে জানিলেই সকল জানা হয়, ইহাই তাঁহার মত ছিল। কবি সেক্স্পিয়রও বলিয়াছেন—"আপনার প্রতি আপনি সত্যভাবাপন্ন হও, রাত্রির পর যেমন দিবা আইসে তেমনি তাহা হইতে এইটি নিষ্পন্ন হইবে যে

কোন মানুষের প্রতি তুমি অসত্যভাবাপন্ন হইতে পারিবে না।" কবি ও দার্শিনক উভয়েরই এখানে এক কথা। আপনাকে অনাবৃত কর, তুমি ঈশ্বর ও অমরত্ব অনাবৃত করিলে এবং বুঝিলে। আপনি কি? অশক্তি, অজ্ঞান, অপ্রেম, অপুণ্য। আপনি আপনাপন্নি থাকিতে পারে না; উহার অস্তিত্ব অপরের উপরে নির্ভর করে। সর্ব্বদাই উহার শক্তি পরিমিত। আপনাকে যখনই বুঝিতে যাই, তখনই উহাকে পরাধীন বলিয়া বুঝি। মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি বলিতেছে,—এই পর্য্যন্ত যাও আর নহে। আমার বাহু অপর একজনের বাহু আশ্রয় করিয়া আছে। আমার থাকা আর একজনের থাকার উপরে নির্ভর করে। এইরূপে মানুষ যখন অপর একটী মহতী শক্তি অনুভব করে, তখন তাহার নাস্তিক হওয়া কঠিন হয়। মানুষের দেহমনের মধ্যে ঈশ্বর নিগূঢ় ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তাহার রসনা যখন অবিশ্বাসের কথা বলিতে যায়, তখন রসনাই বলিয়া দেয়—রসনা অবিশ্বাসী হইতে পারে না। যে ঈশ্বরেতে আমরা বিশ্বাস করি, সে ঈশ্বর আমাদিগের অন্তরে, আমাদিগের ঊর্দ্ধে, আমাদিগের অধোতে, আমাদিগের চারিদিকে, সর্ব্বতঃ তিনি আমাদিগকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। আমরা অন্ধ হইতে পারি, আমরা বধির হইতে পারি, আমরা তাঁহাকে বাহ্যজগতে না দেখিতে পারি, আমরা তাঁহার কথা না শুনিতে পারি, কিন্তু আমরা অন্তরে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি। অন্তরে একটী বিদ্যমানতা, অন্তরে একটী শক্তির সর্ব্বতঃ দৃঢ় আলিঙ্গন, অন্তরে শরীরমনের উপরে একটি জীবনসঞ্চারক প্রভাব আমরা অনুভব করি। এ বিদ্যমানতা কি, আমি না জানিতে পারি; যে কোন নামে ইহা অভিহিত হয় হউক, বিদ্যমানতা ঠিক। আত্মা অশক্ত, এই বিদ্যমানতা শক্তিপ্রভাব; আত্মা সান্ত, এই বিদ্যমানতা অনন্তের গাঢ় আলিঙ্গন, দেববিদ্যমানতায় মানববিদ্যমানতা বেষ্টিত। আত্মা আত্মাকে স্পর্শ করিতেছেন, এ স্পর্শ আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। এ দুইকে কোন প্রকারে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ঈশ্বর আছেন কিরূপে জানিলে? তাহার উত্তর, আমি আছি, তাই ঈশ্বর আছেন। এইরূপে আত্মজ্ঞানই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, অন্যত্র প্রমাণান্বেষণে প্রয়োজন নাই।

৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার সহিত আমাদের

সম্বন্ধ' বিষয়ে উপদেশ হয়। এই উপদেশটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য একটি চেন, একটী ঘড়ী, একখানি বস্ত্র, একটি ফুলের টব, এই চারিবস্তু টেবিলের উপর রাখা হয়। প্রথম দুইটি ভ্রান্তি এবং দ্বিতীয় দুইটি ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ দেখায়। বোর্ডের উপরে একটি বৃত্তও অঙ্কিত হয়। তিনি আজ যাহা বলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই;—কারণপরম্পরাবাদ ভ্রান্ত। কারণের কারণ, কারণের কারণ, এই রূপ কারণশৃঙ্খল বলিয়া সৃষ্টিতে কিছুই নাই। কিছুরই সাহায্য না লইয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমুদায় সৃজন করিয়াছেন। ক যদি খকে সৃষ্টি করে, খ যদি গকে সৃষ্টি করে, গ যদি ঘকে সৃষ্টি করে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে ককে সৃষ্টি করিল কে? নাস্তিকেরা এই জন্যই জিজ্ঞাসা করে, ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিল কে? যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু মঙ্গল, যাহা কিছু মহৎ বা সুন্দর, সকলই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন: যদি সকল পদার্থের আদিম সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ঈশ্বরকে স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। শেষ সৃষ্ট বস্তু হইতে ঈশ্বর অতি দূরে অবস্থিত, ইহা মনে করা ভ্রম। শেষ ও প্রথম, এ দুইই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্যবিন্দু ঈশ্বরের সহিত সকলেরই সাক্ষাৎ যোগ। এই বিশ্ব ঘড়ীর মতও নয়। তিনি বিশ্ব সৃজন করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন ইহা ভ্রান্তি। তিনি যেমন সৃজন করিয়াছেন, তেমনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঈশ্বর এবং মানব এ উভয়ের সম্বন্ধ বস্ত্রের ওত-প্রোত-সম্বন্ধের ন্যায়। ঈশ্বরশক্তি ও মানবশক্তি ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ। ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র করিলে আর মানবত্ব থাকে না। বৃক্ষের মূল যেমন অদৃশ্য, তাহার পত্র পুষ্পাদি চক্ষুর্গোচর, ঈশ্বরও সেইরূপ। পত্র পুষ্পাদির সৌন্দর্য্য সকলই চলিয়া যায়, এমন কি জীবনী শক্তি অন্তর্হিত হইলে তাহাদের কিছুই থাকে না, থাকে কেবল অদৃশ্য জীবনী শক্তি। আমাদের ইন্দ্রিয়াদি যে মূল শক্তি হইতে বলবীর্য্যাদি লাভ করিতেছে, সেই মূল শক্তি ঈশ্বর। এই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ উপনিষৎ যাহা বলিয়াছেন তাহাই। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি আমাদের জীবনের জীবন।

২২ ফেব্রুয়ারী 'বিবেক' সম্বন্ধে উপদেশ হয়। বিবেকের মূলতত্ত্ব কুটীরের উপদেশে যাহা বিবৃত হইয়াছে তদনুরূপ। পূর্ব্বদিনের উপদেশে সমুদায় পদার্থের

সহিত ঈশ্বরের যে সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, তাহারই নিয়োগ এস্থলে বিশেষরূপে করা হইয়াছে। ২৯ মার্চ্চ শনিবার 'ব্রাহ্মধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ এবং বহুদেববাদ' সম্বন্ধে উপদেশ হয়। উপদেশের মর্ম্ম এই ;—এক দিকে অদ্বৈতবাদ আর এক দিকে বহুদেববাদ, ইহারই মধ্য দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের গতি। ব্রাহ্মধর্ম্মে এ দুইয়ের সংস্পর্শ না হয়, ইহাই দেখিতে হইবে। এ দুইয়ের মূলে যে সত্য আছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী নহে। ঈশ্বর আছেন, তিনি দূরস্থ নহেন, সকলের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিনি সম্বদ্ধ, এ দুই সত্য এ দুই বাদমধ্যে অবস্থিত। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, এই তিন রাজ্যশাসনপ্রণালীর সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম, বহুদেববাদ এবং অদ্বৈতবাদের সাদৃশ্য আছে। অদ্বৈতবাদ ঈশ্বরের সর্ব্বগতত্ব প্রদর্শন করে, ইহাতে সকল বস্তুই ঈশ্বর ইহা প্রতিপাদিত হয় না। তবে এই মতের বিকারে অনেকের চরিত্রের পবিত্রতা বিনষ্ট, এবং যে কোন পাপাচরণ করিয়া উহা ঈশ্বরকৃত সুতরাং পাপ নয়—এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। বহুদেববাদে সকলেই দেবতা নহে। যাহা কিছু উপকারক, তাহাকেই দেবতা বলিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে। এ দুই বাদের মধ্যে ভ্রান্তিবিমিশ্র সত্য আছে বলিয়া সত্যগ্রহণে ভারতীয় যুবকগণের ভীত হওয়া সমুচিত নহে। ভূতকালে এ উভয়ের দ্বারা অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে ঈশ্বর দর্শন হইতে বিরত হইলে নিতান্ত শুষ্ক বুদ্ধির ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইবে। এ উভয়বাদের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উভয়ের সত্য সকল গ্রহণ করা সমুচিত। ৫ এপ্রেল 'বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছা' সম্বন্ধে উপদেশ হয়। কারণপরম্পরায় সৃষ্টি কল্পনা করা যে প্রকার ভুল, অভিপ্রায় পরম্পরা অবস্থাপরম্পরার ফল মানুষের জীবন, ইহাও সেই প্রকার ভুল। অবস্থাপরম্পরা অভিপ্রায়পরম্পরার মধ্যবিন্দু আমাদের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা দ্বারা সে সমুদায় নিয়মিত। কোন একটি বিষয় ইচ্ছার সম্মুখে উপস্থিত হইলে অভিপ্রায়সমূহ সেই বিষয়টির পক্ষদ্বয়ের সমর্থনে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা পক্ষ সমর্থন করিল বটে, কিন্তু কোন্ পক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইবে, তাহা প্রাড়্বিবাক ইচ্ছার হস্তে। ইচ্ছা বা আমি অবস্থাধীন নহি স্বাধীন, স্বাধীন ভাবে আমি শাস্তা বিবেকের প্রতি বিশ্বস্ত হইতে পারি।

১৯ এপ্রেল শনিবার, 'অনন্ত অথচ জ্ঞেয় ঈশ্বর' এই বিষয়ে উপদেশ হয়। জড়বাদিগণ অনন্তকে অজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এ কথা সত্য, অনন্ত অভাবাত্মক শব্দ, আমরা উহাকে কখন চিন্তার বিষয় করিতে পারি না; চিন্তা করিতে গেলেই কোন পরিমিত বিষয় ভিন্ন চিন্তা অগ্রসর হইতে পারে না। অনন্ত চিন্তার অবিষয় হইলেও উহাকে আমরা চিন্তা হইতে দূর করিয়া দিতে পারি না, কেন না সান্তের সঙ্গে অনন্ত চিরগ্রথিত। সান্ত ভাবিতে গিয়া যখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত আসে, তখন এই সান্তেতে যে সকল স্বরূপ লক্ষিত হয় সেই সকল আবার ঈশ্বরের উচ্চতম স্বরূপের দিকে লইয়া যায়। এই চারিদিকের পরিবর্ত্তনমধ্যে এই সান্ত অহম্ নিত্য একই রূপে অবস্থিত। সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল বিষয়সমূহমধ্যে সান্ত অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু উহা স্বয়ং স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, ইহার মূলে অনন্ত সারভূত পদার্থের প্রয়োজন। এই অনন্ত পদার্থকে অন্তরিত করিয়া সমগ্র জগৎ অপদার্থ হইয়া উড়িয়া যায়। সান্ত আত্মা শক্তিমান্, শক্তিহীন আত্মা কখন চিন্তার বিষয় নহে। চিন্তা আরম্ভ করিতে গিয়াই শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে। এই অল্পশক্তি আবার অনন্ত শক্তি দেখাইয়া দেয়। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আমাদের ব্যক্তিত্ব; উহাও অনন্ত ইচ্ছা বা মহত্তম ব্যক্তি প্রদর্শন করে। সান্ত আত্মাতে যে জ্ঞান অনুভূত হয়, তাহা হইতে অনন্ত জ্ঞান, সান্তে অনুভূত প্রেম হইতে অনন্ত প্রেম, বিবেকের নির্দেশ হইতে পুণ্যসম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হয়, এই পুণ্য হইতেই অনন্ত পুণ্য আমরা উপলব্ধি করি। কাল ও দেশ হইতে অনন্তকাল ও অনন্তদেশ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়; উহা হইতে আবার নিত্য সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদিগেতে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সমুদায় স্বরূপগুলিতে অনন্তত্ব সংযুক্ত হইয়া আমাদের পরিত্রাণদাতা পূজনীয় জীবন্ত ঈশ্বর আমরা লাভ করি।

২৬ এপ্রেল শনিবার, 'ঈশ্বরের বাণী' বিষয়ে উপদেশ হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব ইহার সংক্ষিপ্ত সার এইরূপ দিয়াছেন;—"মনুষ্যের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, স্মরণশক্তি, কল্পনা, প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি আছে, তাহারা কেহই মনুষ্যকে শাসন করিতে পারে না। তাহারা মনুষ্যের; মনুষ্যের হইয়া মনুষ্যকে শাসন করিবে কি প্রকারে? স্মরণশক্তি স্বনিয়মে বস্তু সকল স্মৃতিপথে উদিত করে, কল্পনা-

শক্তি সুন্দর স্বর্গীয় বস্তুতে পরিবেষ্টিত হইয়াও তন্মধ্যে নরকের ব্যাপার আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে; কিন্তু স্ব স্ব শক্তিতে তাহা বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। বুদ্ধি প্রজ্ঞা শান্তভাবে একটি সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে বল নিয়োগ করিতে পারে না। যাহার অধিক বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানবত্তা আছে তদ্দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত বিপর্য্যস্ত হইবে। এইরূপ উত্তরোত্তর সিদ্ধান্ত হইতে সিদ্ধান্তান্তরে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এই সমুদায় বৃত্তিকে নিয়মিত করিবার জন্য সর্ব্বোপরি বিবেক অবস্থিতি করিতেছে। বিবেক নিয়ামক, সুতরাং উহাকে মনোবৃত্তি বলিলে চলে না। উহা ঈশ্বরের প্রতিনিধি ঈশ্বরের বাণী। উহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। কি আহার পান, ( ), বিষয় কর্ম্ম, সকলের উপরে বিবেকের কর্তৃত্ব। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া আহারের দিকে চিত্তকে লইয়া গেলে অন্নগ্রহণ কর্ত্তব্য হইল। ইহা কাহার জন্য? বিবেকের জন্য। ক্ষুধার মধ্য দিয়া যে আদেশ প্রচারিত হইল উহা অমান্য কর, দণ্ডভোগ করিতে হইবে। তুমি পাঠশালায় পড়িতে যাও। পাঠে তোমাকে কে নিয়োগ করে? পিতা নয়, শিক্ষক নয়, আর কেহ নয় বিবেক— ঈশ্বরের বাণী। যদি এ আদেশ অমান্য কর, উহার ফল ভোগ করিতে হইবে। বিবেক শিক্ষকের ন্যায় উপদেশ দেন, আবার বিচারক হইয়া বিচার করেন, দণ্ড দেন। বিবেককে অমান্য করিলে তিনি নিস্তব্ধ হন এবং যথাসময়ে উদ্যতবজ্র হইয়া পাপীকে উদ্বুদ্ধ করেন।"

৩ মে শনিবার, 'জ্ঞান ও বিশ্বাস' বিষয়ে উপদেশ হয়। উহার মর্ম্ম ধর্ম্মতত্ত্বে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—"আমরা দেশ ও কালকে কিছুতেই সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারি না। যতই কেন দেশকালের পরিধি আমরা বিস্তৃত করি না, আমরা কিছুতেই উহার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না; উহা আমাদিগের নিকট অনন্তরূপে অনুভূত হয়। যাঁহারা অনন্ত আমাদের জ্ঞানের বিষয় নয় বলেন অথবা অনন্ত কিছু নয় বলেন, অনন্তকে চিন্তা হইতে দূর করিবার অক্ষমতা তাঁহাদিগের কথা খণ্ডন করে। আমরা জ্ঞানে এই অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করি। তিনি দেশে অনন্ত, ইহাতে তিনি সর্ব্বত্র আছেন পাই, তিনি কালে অনন্ত ইহাতে তিনি সকল সময়ে আছেন এই জ্ঞান লাভ করি। বিশ্বাস জ্ঞানমূলক, যে বিশ্বাসের মূলে জ্ঞান নাই, যুক্তিযুক্ততা নাই, তাহা কখন বিশ্বাস

নহে। জ্ঞান প্রাণসমন্বিত নয়, উহা মানুষকে জীবিত করিতে পারে না। বিশ্বাস আত্মার চক্ষু, জ্ঞান যে সত্য প্রকাশ করে উহা তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করে। ঈশ্বর সর্ব্বত্র সকল সময়ে আছেন, বিশ্বাস জ্ঞানের এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয়। উহা তাঁহাকে সর্ব্বত্র সকল সময়ে দেখিতে চায় এবং তাঁহাকে সেইরূপে দেখিয়া কৃতার্থ হয়। জ্ঞান সত্য কি বলিয়া দেয়, বিশ্বাস তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে, জ্ঞান ও বিশ্বাসে এই প্রভেদ।" ১০ মে শনিবার প্রদত্ত 'পাপের স্বভাব ও প্রকৃতি' বিষয়ে উপদেশের সার এই ;—"সাধারণ লোকে মনে করে, পাপ একটি বস্তু, এক দুই তিন করিয়া উহার সংখ্যা হইতে পারে। যদি কেহ বর্ত্তমানে পাপ পরিত্যাগ করে, ভূতকালে সে যে পাপ করিয়াছে তাহার জন্য কোন একটি বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিতে সকলে উপদেশ করে। সাধারণের ঈদৃশ বিশ্বাস পাপ কি পদার্থ না জানিয়া উপস্থিত হয়। যেন বিচারালয়ে যে পাপের জন্য লোক ধৃত হয় তাহাই পাপ, আর তাহার মনে যে পাপের বীজ আছে তাহা পাপ নহে। তুমি জন্মে একটি পাপ কার্য্য না করিতে পার, অথচ নরহত্যা প্রভৃতি সমুদায় পাপে তুমি পাপী। ক্রোধ হইতে নরহত্যা উপস্থিত হয়, সেই ক্রোধ যদি তোমাতে থাকে, সময়ে উহা নরহত্যার আকারে প্রকাশ পাইবে না কে বলিবে? যে হস্ত মনুষ্যকে হত্যা করিল, যে ছুরিকাদ্বারা হতব্যক্তির কণ্ঠনালী ছিন্ন হইল, সে হস্ত বা ছুরিকাতে কি অবিশুদ্ধতা স্পর্শ করিল? কখনই নহে। যে ব্যক্তি হত্যা করিল, তাহার হৃদয় অপরাধী। পাপ কি? দুর্ব্বলতা। শরীরের যেমন রোগ, পাপ তেমনি মনের রোগ। রক্ত প্রভৃতি ধাতুর দোষ যেমন রোগের নিদান, মনুষ্যের ইচ্ছার দৌর্ব্বল্য তেমনি আত্মার পাপের মূল। রক্তাদিধাতু প্রকৃতিস্থ হইলে যেমন রোগ বিদূরিত হয়, ইচ্ছার দৌর্ব্বল্য দূর হইলে মনুষ্যের তেমনি পাপ নিবৃত্তি হয়।"

২৪ শে শনিবার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক বিতর্ক সভায় "বিবেক ঈশ্বরের বাণী কিনা?" এতৎ সম্বন্ধে বিতর্ক হয়। এই বিতর্কের এইরূপ নির্দ্ধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—"বিবেক নিজের বিচারশক্তি অথবা ইহা অপরের বাণী এইরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে যে, বিবেক যাহা নির্দ্ধারণ করে তাহা 'তুমি কর' বা 'করিও না' এই আকারে সমাগত হয়, অথবা আমার এইরূপ করা উচিত অতএব এইরূপ করিব, এই আকারে নির্দ্ধারিত

হয়। 'মিথ্যা বলিও না' 'অকৃতজ্ঞ হইও না' ইত্যাদি মূল নীতি সকলের মনেই উত্থিত হয় এবং মনুষ্যকে এতৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে। মানুষ প্রথমাবস্থায় নীতির বিরোধে গমন না করিলে বিবেকের নির্দেশ বুঝিতে পারে না, কিন্তু যখনি বিরোধে গমন করে তখনি প্রতিঘাত দ্বারা বিবেকের কার্য্য বুঝিতে পারে। বিবেক যে বুদ্ধি বিচারের সিদ্ধান্ত নয় তাহা তখন বুঝা যায়, যখন বহু বিচার বিবেচনা বিতর্কের পরে যাহা নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় এবং মনুষ্য বিনা বিতর্কে বিনা বিবেচনায় বিবেকের কথা অনুসরণ করে।" যখন বিবেকের সহিত প্রতিঘাত উপস্থিত হয় না, তখন মনুষ্য বিবেকের কর্তৃত্ব বুঝিতে পারে না; যেমন মদোন্মত্ত ব্যক্তি মত্ততার অবস্থায় সে যে পোলীস কর্তৃক নীত হইতেছে বুঝিতে পারে না যত ক্ষণ না সে স্বীয় গতি প্রতিরোধ করিয়া পোলীস কর্তৃক তাড়িত হয়। ফলতঃ ফুস্ফুস ও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য যেমন ঈশ্বর মনুষ্যের ইচ্ছার উপরে রাখেন নাই, কেন না তাহা হইলে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা, সেইরূপ যে সকল নীতি "মনুষ্যসমাজরক্ষার্থ একান্ত আবশ্যক, সেই গুলি মনুষ্যের ইচ্ছার অধীন করিয়া তিনি রাখেন নাই, সে সকল দ্বারা মানুষকে পরিচালিত হইতেই হইবে। এই সকল নীতি 'তুমি কর' বা 'করিও না' এইরূপে আদেশের আকারে মনুষ্যহৃদয়ে নিয়ত সমাগত হয়। আদেশের ব্যাপ্তি কত দূর ভবিষ্যতের বিচার্য্য বিষয় রহিল।"

গ্রীষ্মাবকাশের পর ৫ জুলাই শনিবার কেশবচন্দ্র "অপৌরুষেয় বাক্যাভিব্যক্তির দর্শন" বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে;—ঈশ্বর আছেন এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া কিছু হয় না। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কহিলেন, সত্য প্রকাশ না করিলেন, তিনি যদি আমাদের গুরু না হইলেন, তাহা হইলে আমরা পরিত্রাণ লাভ করিব কি প্রকারে? কোন গ্রন্থ আমাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্যাভিব্যক্তি হইতে পারে না; কেন না তিনি কখন লেখেন না তিনি বলেন। ইহা সম্ভব যে পূর্ব্বকালে ঋষি মহাজনগণ যাহা ঈশ্বরের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন, তাহা, তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেই সকল গ্রন্থাকারে বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের

কি লাভ, যদি ঈশ্বর আপনি তাঁহার বাক্য আমাদের নিকট অভিব্যক্ত না করিলেন। অভিব্যক্তির (Revelation) অর্থ যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা প্রকাশ পাওয়া। আমাদের পরিত্রাণসম্পর্কীয় সত্য গুলি যদি আমাদের নিকটে অভিব্যক্ত না হইল তাহা হইলে আর তাহা অভিব্যক্তি বলিব কি প্রকারে? আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আলোক চাই। গ্রন্থ কি সে কার্য্য সাধন করিতে পারে? উহাতে যাহা আছে তাহাতো আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন, উহার অভিব্যক্তির জন্য আলোকের প্রয়োজন। গ্রন্থে যাহা আছে তাহা আমাদের বোধের বিষয় না হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় না হইলে উহাতে আমাদের কিছুই হইবে না। এক জন মানুষ যাহা অপর এক জন মানুষকে বলে তাহাও ঈশ্বরের বাক্যাভিব্যক্তির মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না, কেন না সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর অভিব্যক্ত না করিলে, তাহা আমাদের নিকটে, ঈশ্বরের বাক্যাভিব্যক্তি হইবে কি প্রকারে? ঈশ্বর যেমন লেখেন না, তেমনি আত্মিক ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা কন না, সংস্কৃত হিব্রু বা অন্য ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি কথা কন ঈশ্বরসম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইউরোপীয় বা আসিয়াটিক সকলকেই তিনি সমাদরে নিকটে আহ্বান করেন, সুতরাং সকলকেই তাঁহার দ্বারে গিয়া আঘাত করা কর্ত্তব্য।

২০ সেপটেম্বর কেশবচন্দ্র "চরিত্র" বিষয়ে উপদেশ দেন। চরিত্রের বিষয় বলিতে গিয়া তিনি ঈশ্বরের বাণীকেই চরিত্রের মূল করেন। ঈশ্বরের বাণী-শ্রবণের চারিটি বিভাগ, শারীর, মানস, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। যে সকল নিয়মে আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, সেগুলির ভিতরে আমরা ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করি। ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন "স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালন কর।" তাঁহার এই কথা প্রত্যেক শিরায় প্রত্যেক স্নায়ুতে লিখিত। এই বাণীই স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি। ক্ষুধার ভিতর দিয়া তিনি বলিতেছেন—"খাও খাও।" যখন ক্ষুধা নাই তখন তিনি বলেন "খাইও না"; তখন আমরা ভোজন হইতে নিবৃত্ত থাকি। শরীরের যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, মনেরও তেমনি ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। সত্য অন্বেষণ, সত্য সম্ভোগ, জ্ঞানার্জ্জন এজন্য কুতূহল বা তৃষ্ণা সেই ঈশ্বরের বাণী, যে বাণী বলিতেছেন,—"যাও জ্ঞানী হও।" নৈতিকবিভাগে যে ঈশ্ব-

ক দেখিয়া কাহাকে না আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেই মনঃসম্বন্ধে বিশে- ান যে সমুদায় শাস্ত্র পাঠ করিলে হয়, তাহা প্রচলিত শিক্ষা হইতে বিদায় রিয়া দিয়া উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। মন আপনি আপনাকে যাহাতে জানিতে পারে, উহার বিশেষ বিশেষ ভাব সকল যাহাতে উন্নত হয়, তাহা না করিলে উহার শিক্ষা কিছুই হইল না। এত শিক্ষালাভ করিয়া যদি শিক্ষিতগণ পিতামাতা গুরুজনকে ভক্তি, স্ত্রী পরিবারকে প্রীতি, সন্তানগণকে স্নেহ করিতে না পারিলেন তবে কি হইল? প্রচলিত শিক্ষায় যদি তাঁহারা হৃদয়শূন্য হন, দেশের হিতকল্পে শরীরের একবিন্দু শোণিত অর্পণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন কি ছিল? প্রচলিত শিক্ষায় স্মৃতি-শক্তির চালনা হয়। স্মৃতিকে তুচ্ছ করা যাইতে পারে না, কিন্তু স্মৃতিব্যতি-রেকে অন্যান্য বৃত্তি আছে, যে সকল উন্নত না হইলে মনুষ্যত্বই হয় না। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিলে উন্নত করিলেও কল্পনাশক্তিকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। ফলতঃ মনের কোন বিভাগকেই আমরা অবহেলা করিতে পারি না। কিন্তু এই শিক্ষার বিষয়ে একটি কঠিন সমস্যা আছে। শিক্ষার বিষয় অনেক। আমি কখন কোন্ প্রকারের শিক্ষা গ্রহণ করিব, ইহা নির্ণয় করা সহজ নহে। একটি বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলে, এত পুস্তকের মধ্যে কোন্ পুস্তকখানি পাঠ করিব, ইহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইতে হয়। এখানে হৃদয়ের গতিতে ঈশ্বরের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ, তাঁহার আজ্ঞা দেখিয়া যদি তাদৃশ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব শিক্ষা লাভ হয়।" শিক্ষা কেন করিতে হইবে? 'তোমরা আপনাকে শিক্ষিত কর' ঈশ্বরের এই আদেশের জন্য। শিক্ষা বাহিরের কতকগুলি বিষয় জানা নহে, মনের ভিতর যাহা আছে তাহা বাহির করিয়া আনা। ভাব, ইচ্ছা, বৃত্তি, এ সমুদয় নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। এই গুলিকে শিক্ষার দ্বারা জাগ্রৎ করিয়া তোলা হয়। আপনার মনে যাহা আসিল সেইরূপে শিক্ষা করিলাম, ইহাতে শিক্ষা হয় না। ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অনুসারে শিক্ষা করিলে ভাল শিক্ষা হয়'।

রের বাণী তাহাই আমাদের চরিত্রসম্বন্ধে সৎ শাস্ত্র। ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্ না করিয়া আমরা কখন চরিত্র গঠন করিতে পারি না। বিবেক বা ঈশ্বরে বাণী আমাদের চরিত্রগঠনে সাহায্য করে। কেবল চরিত্রগঠনে সাহায্য করে তাহা নহে, ইহারই জন্য চরিত্রগঠন কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। আমরা সৎ হইব কেন? কৌশলের জন্য? না, ঈশ্বর সৎ হইতে বলেন এই জন্য। ঈশ্বরের নিকটে গেলেই তিনি বলেন, "সত্য বল" "ভারতের জন্য জীবন অর্পণ কর।" ঈশ্বর বলেন বলিয়াই পরহিতার্থে জীবন দেই। "যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দাও," ঈশ্বর এ কথা বলেন বলিয়া ইহা কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য। আমাদের নীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করির এই ভাবে আমরা গঠিত। যাঁহারা মনে করেন বিচার শেষ দিনে হইবে, তাঁহাদের উহা ভুল। আমরা প্রতিমুহূর্ত্ত ঈশ্বরকর্তৃক বিচারিত হইতেছি। শারীর, মানস, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন বিভাগে আমরা তাঁহার কথা উল্লঙ্ঘন করিলে আমরা দণ্ডিত হই। তাঁহার কথা উল্লঙ্ঘন করিয়া এমন অন্তর্জ্জালা উপস্থিত হয় যে, সে জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হয় না। এই জ্বালা নিবারণের জন্য মানুষ মোহমদিরা পান করিতে পারে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে শান্তিহারা হয়। সে যদি একেবারে পশু না হইয়া যায়, তাহা হইলে "এইটি কর" "এইটি করিও না" এরূপ কথা সে শুনিবেই। যাঁহারা এই বাণী শুনিয়া চলেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেন না, তাঁহাদের জীবনে বীরত্ব প্রকাশ পায়। দেবনিশ্বসিত ঈশ্বরবাণীর উচ্চতম উন্মেষ।

২ আগষ্ট শনিবার কেশবচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দেন। বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়। তৎকালে ধর্ম্মতত্ত্বে উহার যে সার প্রদত্ত হয় আমরা তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। "গতবারে স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে শরীর রক্ষার প্রয়োজন। শরীরের পর মন আমাদের চিন্তার বিষয়। শরীর অল্পদিন স্থায়ী, মন অনন্তকালের সঙ্গী। সুতরাং শরীরাপেক্ষা মন যে আমাদিগের সমধিক যত্নের বিষয় তাহা আর বলিতে হয় না। বিজ্ঞান শিল্প বিষয় সন্দেহ নাই, আমরা উহাকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না, কিন্তু মন সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। মন আকাশের বিদ্যুৎকে ধরিয়া আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে। তাহার অসাধারণ

নূতন আন্দোলন।

'নূতন আন্দোলন' এ কথা শুনিবামাত্রেই পাঠকের মনে হইবে, আবার বুঝি কেশবচন্দ্র এমন একটা কোন কাজ করিয়াছেন, যাহাতে পুনরায় সকলে তাঁহার বিরোধে এবার দণ্ডায়মান হইয়াছেন। পাঠকের এরূপ মনে করিবার অধিকার আছে। যিনি বলেন, "যেখানে দেখা গেল সকল লোকেই এই কার্য্যের সুখ্যাতি করে,এই কার্য্য যদি করা যায়, সকল লোকেই সুখ্যাতি করিবে; সাধক অমনই বুঝিলেন, "একার্য্য মন্দ কার্য্য; ইহাতে সর্ব্বনাশ হইবে। বিদ্বানেরা প্রশংসা করিবে, পণ্ডিতেরা মানিবে, সাধারণ লোকে যশ কীর্ত্তন করিবে, অতএব এ কার্য্য করা হইবে না। মন বলিল, এই কার্য্য কর, আকাশের দিকে তাকাইয়া বোঝা-গেল এ একটু ভাল কার্য্য; ভাল লোকে, ধনাঢ্য লোকে, পণ্ডিত লোকে পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে; স্থির হইল ইহা করিতেই হইবে। এ কার্য্য করিলে সবাই নিন্দা করিবে, ভয়ানক অপমান হইবে, যে প্রদেশে বক্তৃতা করিতে যাইব কেহই শুনিতে আসিবে না; খুব বন্ধু আপনার লোক,যারা তাঁহারাও ছাড়িয়া যাইবে; শরীর ক্ষীণ, মন ক্ষীণ, বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া অবসন্ন হইবে, যাই এরূপ দেখিলাম মন বলিল ঠিক হইয়াছে, কেউ সায় দেয় না, অতএব এই কার্য্য করা উচিত। কেন না পৃথিবীর যাহাতে শত্রুতা হয়, ঈশ্বরের তাতেই মিত্রতা হয়। পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বর তাহাতে অনুকূল।"—যিনি এরূপ বলেন, তিনি অন্ততঃ সময়ে সময়ে এমন কিছু করিবেন, যাহাতে বিদ্বান্ জ্ঞানী বন্ধুগণ বিমুখ হইবেন, কত নিন্দাই না করিবেন। এবার তিনি এমন কিছু করিলেন, যাহাতে সেইরূপই হইল। কোন্ উপলক্ষে তিনি কি করিলেন আমরা তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

রেবেরেণ্ড লিউক রিভিংটন এম এ দেশ হইতে এ সময়ে (মার্চ্চ ১৮৭৯) কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি শিক্ষিত যুবকগণের জন্য অ্যালবার্ট হলে কয়েকটী বক্তৃতা দিবেন স্থির হয়। প্রথম বিষয়টি "মনুষ্য তাহার আদি এবং

নিয়তি।" দ্বিতীয় বিষয়টি "মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম (মনুষ্যের নিয়ম।

এ দুই বক্তৃতা সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"ফাদার রিভিংটন এম এ বিগত দুই মঙ্গলবার আলবার্ট হলে 'মনুষ্য তাহার আদি ও নিয়তি' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন; আগামী মঙ্গলবার 'মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম' বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। ফাদার রিভিংটনের বক্তৃতা মধুর, যুক্তিপূর্ণ, খ্রীষ্টীয় গন্ধশূন্য। তিনি স্বীয় ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাসী, অথচ সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল বক্তৃতা করেন তাহাতে বিজ্ঞান দর্শন নীতি এবং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম স্পর্শ করিয়া বলেন, সাম্প্রদায়িক মত অণুমাত্র স্পর্শ করেন না। আধুনিক বিজ্ঞানাদিতে ইঁহার গভীর দৃষ্টি আছে এবং যাহা কিছু বলেন তাহা অত্যন্ত উদার। এ দেশের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। ঈদৃশ উদারচেতা খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুযায়িগণই এ সময়ে মঙ্গল করিতে সক্ষম।" "আমরা গতবারে লিখিয়াছিলাম ফাদার রিভিংটন আগামী মঙ্গলবার 'মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম' বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে এবং শেষ বক্তৃতায় আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তিনি একটী আখ্যায়িকা দ্বারা বিবেকের একাধিপত্য অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঘোর প্রাণান্তিক বিপদ্ উপস্থিত হইলেও বিবেক যাহা বলিবে তাহাই শুনিতে হইবে এবং বিবেকের কথা শুনিয়া চলিলে পরিশেষে কোন বিপদ্ থাকে না, বিবেকই একমাত্র আমাদিগের বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক, বিবেকের অনুসরণ করিলে পরিশেষে মনুষ্য স্বর্গধামে গিয়া উপস্থিত হয় এ সকল কথা তিনি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ বক্তৃতাতেও তিনি খ্রীষ্টের স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, কেবল আখ্যায়িকার মধ্যে তিনি এই বলিয়াছিলেন যে, স্বর্গ হইতে এক জন দূত আসিয়া দিগ্দর্শন যন্ত্র দিলেন, এই দিগ্দর্শন যন্ত্র বিবেক। পথে চাকচিক্যময় অসার পদার্থ গ্রহণ করাতে দিগ্দর্শন বিপরীত পথ প্রদর্শন করিল। কিন্তু সেই স্বর্গীয় দূত পুনরায় আসিয়া বলিলেন, যদিও দিগ্দর্শনশলাকা বিপরীত পথ প্রদর্শন করে এবং ইহার প্রদর্শনমতে চলিলে বহু বিপদে পড়িতে হয়, তথাপি ইহার অনুসরণ করিতে হইবে। কেন না চরমে স্বর্গধামলাভ উহার অনুসরণ ভিন্ন আর কিছুতেই হইবে না।"

ফাদার রিভিংটনের প্রতি কেশবচন্দ্রের অকৃত্রিম অনুরাগ খ্রীষ্টের প্রতি গভীর

অনুরাগ হইতে সমুত্থিত, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। তিনি কেশবচন্দ্রের গৃহে কমলকুটীরে (২ এপ্রেল বুধবার) ব্রাহ্মগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এখানে খ্রীষ্টধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসম্বন্ধে আলাপ হয়। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর আবার আলাপ আরম্ভ হইয়া ৮॥ হইতে ১২॥ টা পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টা কথোপকথন চলে। উভয় পক্ষই আলাপে আনন্দিত হন। এই আলাপ হইতে "ভারত জিজ্ঞাসা করিতেছে—ঈশা কে?" এই বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া কেশবচন্দ্র প্রয়োজন মনে করেন। টাউনহলে এই বক্তৃতা উপলক্ষে প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি উপস্থিত হন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ, আর্চডিকন বেলি, ফাদার রিভিংটন প্রভৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার সার আমরা নিজে সংগ্রহ না করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে তৎকালে যে সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই দিতেছি;—"বাহ্যে দেখিতে ইংলণ্ডীয়গণ ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, কিন্তু ফলে ভারতবর্ষীয়গণের হৃদয় রাজপুরুষগণকর্ত্তৃক শাসিত নহে, খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। খ্রীষ্ট বিদেশীয় বা বিজাতীয় নহেন, তিনি আসিয়ার লোক এবং ধর্ম্মে তিনি ভারতের আর্য্যমহর্ষিশ্রেষ্ঠ। খ্রীষ্ট ঈশ্বর নহেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বথা আত্মোচ্ছেদ সাধন করিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিত, তাঁহার কার্য্য তাঁহার কথা তাঁহার নহে ঈশ্বরের। তিনি ঈশ্বরাবতার নহেন; ঈশ্বরের সন্তানাবতার। তিনি পরম যোগী, আহার, পান, ভোজন, গমন, আলাপ প্রভৃতি সমুদায় ব্যবহারিক সময়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একান্ত সংযুক্ত। এই যোগে তিনি প্রাচীন ঋষিগণের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তিনি আপনাকে সর্ব্বথা অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু সকলি ঈশ্বরে আরোপ করিতেন। তিনি ভূতকালে বর্ত্তমানের ন্যায় ঈশ্বরের বক্ষে ছিলেন বিশ্বাস করিতেন। কেন না তিনি সুস্পষ্ট চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন যে, স্রষ্টার মনে যেমন সমুদায় সৃষ্টি তেমনি তাঁহার মঙ্গলভাবে পবিত্রাণের বিধান এবং সেই বিধানের লোক তাঁহারই বক্ষে অনাদিকাল হইতে নিদ্রিত ছিল। খ্রীষ্ট তাঁহার শোণিত ও মাংস ভোজন করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিয়া যান। তাহার অর্থ এই যে, তিনি আপনাকে আর কিছু মনে করিতেন না, সেই পুত্রভাব, সেই পুত্রভাবে তিনি অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরের বক্ষে অবস্থিত ছিলেন।

তাঁহাকে পান ভোজন করা এবং তাঁহার নিত্যভাবে অবস্থিতি করা তিনি এক মনে করিতেন।"

এই বক্তৃতায় নূতন আন্দোলন সংসৃষ্ট হইল; অবশ্য এ আন্দোলন খ্রীষ্টকে লইয়া। প্রতিবাদকারিগণ কোথায় কি এ বক্তৃতাসম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা অনুকূল ছিলেন, তাঁহারা প্রতিকূল হইলেন কি না, ইহাই সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইতেছে। কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতাদানের পরে কয়েকটি প্রাচীন বন্ধুকে হারাইলেন। তন্মধ্যে তাঁহারই বিচ্ছেদ বিশেষ ক্লেশকর যিনি নরপূজার অপবাদের সময়ে 'ভক্তবিরোধিদিগের আপত্তিখণ্ডন' লিখিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এত দিন তাঁহারা জানিতে পান নাই। এখন তাঁহারা দেখিলেন যে, খ্রীষ্টবাদিগণ সহ খ্রীষ্টসম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের অনেকটা মিল। এমন কি বিজাতীয়ভাবে তিনি খ্রীষ্টের একান্ত পক্ষপাতী কৃষ্ণাদির প্রতি উপেক্ষাশীল, ইহাই তাঁহাদের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে ছাড়িলেন এবং ছাড়িয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের দিক্ অধিক পরিমাণে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আর কিছু না হউক, তাঁহাদের ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান হইল। এ দিকে খ্রীষ্টানগণ কেশবচন্দ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, কেশবচন্দ্রের এ বক্তৃতাদান অসময়ে হইয়াছে। কেন না এখনও খ্রীষ্টসম্পর্কীয় সমুদায় ভাব তাঁহাতে পরিস্ফুট হয় নাই। এখন তিনি মধ্যপথে আছেন, এখানেই তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন না। হয় তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে, নয় পশ্চাদ্গমন করিতে হইবে। তিনি আপনাকে খ্রীষ্টান বলেন না, অথচ খ্রীষ্টকেও ত্যাগ করিতে পারেন না; তিনি আপনাকে হিন্দু বলেন না, অথচ ভক্তি ও যোগ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। ডেলিনিউসের মত এই, ভাবের অপরিপক্কাবস্থায় কেশবচন্দ্র এ বক্তৃতা দিয়া ভাল করেন নাই; হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলকেই এতদ্দ্বারা তিনি অসন্তুষ্ট করিলেন মাত্র। কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিলেন "ঈশা কে?" এ আর একটা নূতন প্রশ্ন কি? স্বয়ং খ্রীষ্টই যে শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'মানবতনয়কে লোকে কি বলে?' যখন পিটার বলিলেন, তুমি জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, কেবল সন্তুষ্ট হইলেন তাহা নহে, তাঁহাকেই শৈল করিয়া তদুপরি মণ্ডলী স্থাপনে অঙ্গীকার করিলেন।

এই বক্তৃতার পর আর্চডিকন বেলি সেণ্টজনের চার্চে 'খ্রীষ্ট কে ?' এই বিষয়ে উপদেশ দেন এবং এই উপদেশে কেশবচন্দ্রের মতের সঙ্গে কোথায় ঐক্য কোথায় প্রভেদ প্রদর্শন করেন। কেশবচন্দ্রের মতে খ্রীষ্ট ঈশ্বরেতে ভাবরূপে বিদ্যমান ছিলেন; পৃথিবীতে ঈশ্বরের সহিত যোগে একীভূত হইয়াছিলেন, মৃত্যু অন্তেও সেই যোগেই অবস্থান করিতেছেন। ইঁহার মতে, তিনি ব্যক্তিরূপে ছিলেন; ঈশ্বরেতে যখন ব্যক্তিরূপে ছিলেন তখন ঈশ্বর ছিলেন, মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবভাব স্বীকার করিলেন; মৃত্যুর অন্তে এখন তিনি দেব ও মানব উভয় স্বভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্যে, প্রেমে, জ্ঞানে এবং পুণ্যে খ্রীষ্টের সহিত একীভূত হওয়া খ্রীষ্টের রক্তমাংস পান ভোজন এবং তদনুসারে জনসমাজে তাঁহার স্থিতি কেশবচন্দ্রের মত; আর্চডিকনের মতে, খ্রীষ্টের শোণিতেই মুক্তি এবং খ্রীষ্ট যেমন পলের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে আজও তেমনি তিনি আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন; এখন তিনি স্বর্গে থাকিয়া তাঁহার মণ্ডলীর জন্য সকলই করিতেছেন। খ্রীষ্টের ঈশ্বরেতে নিমগ্নভাবে স্থিতিকে আর্চডিকন বেলি হিন্দুগণের লয় ব্রাহ্মদের সহিত এক মনে করিয়াছেন এবং মৃত্যু অন্তে খ্রীষ্টের আর অস্তিত্ব নাই কেশবচন্দ্র এই মত প্রচার করিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ ভ্রম যে কেবল তাঁহারই হইয়াছিল তাহা নহে, অপর কাহারও কাহারও তাদৃশ ভ্রম জন্মিয়াছিল। এক জন মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক প্রকাশ্য পত্রিকায় লেখেন, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার ভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই তিনি উহা শুনিতে যান নাই। কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্য খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে প্রাচ্য খ্রীষ্ট ভারতবর্ষের জন্য আকাঙ্ক্ষা করাতে কোন কোন খ্রীষ্টবাদী এই বলিয়া প্রতিবাদ করেন যে, খ্রীষ্ট প্রাচ্যও নহেন প্রতীচ্যও নহেন, তিনি সকল দেশ ও সকল কালের জন্য। এ সম্বন্ধে বিরেলির খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক স্কট সাহেব বিশেষ আন্দোলন করেন। এই আন্দোলনায় পাশ্চাত্য খ্রীষ্টই বা কি, প্রাচ্য খ্রীষ্টই বা কি ইহা বিশেষ ভাবে নিরূপ প্রদর্শন করেন। এ সমুদায় আন্দোলন সামান্য বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু কেশবচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ইংলণ্ডের বয়সি সাহেব যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহা নিতান্ত ক্লেশকর। খ্রীষ্টের প্রতি কেশবচন্দ্রের অনুরক্তি অনেক দিনের বন্ধু বয়সি সাহেবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল,

ইহা কেনই বা হৃদয়বিদারক হইবে না? এই আক্রমণ কেশবচন্দ্রের পক্ষে কি প্রকার মর্ম্মচ্ছেদী ছিল, মিরারের এই লেখাতেই বিশেষ প্রমাণিত হইবে।

"ব্রাহ্মগণের নেতা দুর্ভাগ্য চন্দ্র সেনের প্রতি আর একটি বাণ লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার আর বিরাম নাই, তাঁহার ক্ষত আরাম হইবে আশা করা যাইতে পারে না। গত দশবৎসর তাঁহার নগ্ন পৃষ্ঠে দ্রুত গতিতে একটির পর একটি করিয়া অনেক গুলি বাণ পড়িয়াছে, সম্ভবতঃ আরও অনেক গুলি পড়িবে। এত অনেক প্রকারের বিরোধী ভাব দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি তিনি কেন বৎসরে বৎসরে যথেচ্ছ নিষ্ঠুর ভাবে আক্রান্ত, নিন্দিত, ভৎর্সিত, ও নির্য্যাতিত হন। আমাদের আশ্চর্য্য না হওয়াই চাই। কতক লোক ঘৃণা বহন করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেন। লোকের অপ্রিয় হওয়া তাঁহাদের নিয়তি। তাঁহারা ভালমন্দ যাহা বলুন তাহাতেই তাঁহাদের নিন্দা ও ভৎর্সনার অধীন হইতে হইবে। যদি তাঁহারা শুধরাইতে যান, তাহাতে কেবল আরও মন্দ হয়। ঐ সময়ে অতিরিক্ত গ্লানিভাজন ব্যক্তির উপরে এই সকল পুনঃ পুনঃ আক্রমণ আমরা সমর্থনও করি না দূষিও না, আমরা কেবল এ গুলিকে অপরিহার্য্য মনে করি। আচার্য্যও এ সকলেতে অবসন্ন হইবার নহেন। তিনি অনেক বড় বড় পরীক্ষায় বাঁচিয়া আছেন, সম্ভবতঃ আরও যে সকল পরীক্ষা আসিবে তাহাতেও বাঁচিয়া থাকিবেন। এবার বয়সি সাহেবের পালা। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই যে তিনি নিতান্ত প্রবল ভাবে এবং অতিরিক্ত উৎসাহ সহকারে খ্রীষ্টের উপরে আচার্য্যের বক্তৃতা আক্রমণ করিয়াছেন। স্পষ্টই তিনি প্রবল ভাবাধীন হইয়াছেন বলিয়াই অতি তেজের সহিত যেন রুদ্রভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশের প্রবন্ধ রুদ্রভাব উদ্দীপন করে না। প্রথম কারণ এই, তিনি কোন ব্যক্তিগত অসদ্ভাব হইতে লেখেন নাই। দ্বিতীয় কারণ আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহা তিনি বোঝেন নাই, না বুঝিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আচার্য্যের অবধারণ স্পৃষ্টও হয় নাই।

বয়সি সাহেব না বুঝিয়া আক্রমণ করিয়াছেন কিনা এখন দেখা যাউক। "আমি এবং আমার পিতা এক" খ্রীষ্টের এই উক্তিকে উচ্চতম আত্মত্যাগ বলিয়া কেশবচন্দ্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে বয়সি সাহেব বলেন, "এই সকল

কথার আমরা যে অর্থ করি এ অর্থ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছে। আত্মাভিমানপ্রকাশের উচ্চতম প্রকার ভিন্ন আমাদের নিকট এ কথাতো আর কিছুই বুঝায় না। ঈশ্বরের সহিত কেবল সমতুল্যত্ব নয়, তিনি যাহা আপনিও তাহা এরূপ অধিকার স্থাপন নিরতিশয় অহঙ্কৃত ভীষণ আত্মাভিমানের কার্য্য। এরূপ অধিকারস্থাপনে যত্ন উন্মত্তালয়ের প্রাচীরের বাহিরে কখন করা হয় না।" কেশবচন্দ্র অর্থব্যাখ্যানস্থলে যাহা বলিয়াছেন বয়সি সাহেব তাহার সমগ্র অংশ উদ্ধৃত করেন নাই। যদি করিতেন তাহা হইলে আত্মাভিমান নহে ঈশার অতিমাত্র বিনয়ই প্রকাশ পাইত। আমি চিন্তা করি, আমি ধর্ম্ম প্রচার করি, আমি ঠিক খাটি লোক ইত্যাদি আমির প্রাধান্য সর্ব্বত্র; খ্রীষ্ট সেই আমিকে উড়াইয়া দিয়া ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ণ হইয়াছিলেন, এবং আমি কিছু করি না, আমার ভিতর দিয়া প্রভু সমুদায় করেন, ইহাই নিয়ত বলিতেন। ইহা কখন আত্মাভিমান নহে সর্ব্বোচ্চ অভিমানত্যাগ। "এব্রাহিম ছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে আমি আছি" এই কথাসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যানাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কতকটা উদ্ধৃত করিয়া বয়সি সাহেব বলিয়াছেন, "যাহারা পাদরি হইবার প্রার্থী বিশপগণ তাঁহাদের নিকট এ অপেক্ষা আর কি বেশি চান, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি আমি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ঠিক বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে প্রধানতঃ খ্রীষ্টের এই সকল ভীষণ অভিমানাত্মক মতপরিগ্রহের কারণেই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি ইহার কতকটা অবহেলা।" বয়সি সাহেব কি ভাবে কি অর্থে কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টের অনাদিকালস্থিতি স্বীকার করিয়াছেন, তৎপ্রতি কেন যে দৃষ্টি করেন নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। মনে হয়, এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাঁহার মন এমনই আলোড়িত হইয়া গিয়াছিল যে, ব্যাখ্যানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেশবচন্দ্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, "তখন তিনি কিরূপে স্বর্গে ছিলেন? ভাবরূপে, জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে, যে বিধান হইবে তাহার পূর্ব্বভাবরূপে, জীবনের বিশুদ্ধতারূপে, স্থূল নয় সূক্ষ্মাকারে, অনাবিষ্কৃত আলোকাকারে। এই আকারে খ্রীষ্ট অনাদিকাল হইতে পিতার বক্ষে ছিলেন। এই ভাবে আপনাকে দেখিয়া খ্রীষ্ট অনাদিকাল হইতে আপনার স্থিতি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার পার্থিব জীবনের আরম্ভ ছিল, কিন্তু তাঁহার দেবভাবাপন্ন জীবনের আরম্ভ থাকিতেই পারে না।

ভক্তভার নিশ্চয়ই আরম্ভ নাই, জ্ঞানের আরম্ভ নাই, প্রেমের আরম্ভ থাকিতে পারে না, সত্যের স্থিতির কখনই আরম্ভ হইতে পারে না। এ সকল অনাদি কাল হইতে ঈশ্বরে অবস্থিত। যাহা কিছু ভাল ও সত্য তাহা ঈশ্বরের সহিত সমকালিক। যদিও মানবখ্রীষ্ট জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার ভিতরে যাহা কিছু দেবভাব ছিল তাহা অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরেতে ছিল। ফলতঃ খ্রীষ্ট আর কিছুই নহেন, ঈশ্বরেতে পূর্ব্ব হইতে যে ভাব ও অনুভাব ছিল পৃথিবীতে তাহারই প্রকাশ।" পিতা ও তাঁহার সন্তানগণের সঙ্গে বিশুদ্ধতার যে স্বরূপাংশের সম্বন্ধ সেইটিকে ঈশ্বর মানবাকার দান করিলেন, অবতারবাদের এই অংশ উপলক্ষ করিয়া বয়সি সাহেব বলিয়াছেন, "এক সময়ে যিনি সত্য ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন তিনি এখন পৌত্তলিকগণের দলে ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া বলিতেছেন, খ্রীষ্ট (ঈশ্বর নন) 'পৃথিবীর সত্যালোক'।" এ কথার প্রতিবাদে নিষ্প্রয়োজন, কেন না বয়সি সাহেব কেশবচন্দ্রের এ বক্তৃতা বা অন্য বক্তৃতা হইতে এমন কোন কথা উদ্ধৃত করিতে পারিবেন না। বয়সি সাহেব বলিতেছেন "তিন দিন সমাহিত থাকিয়া শরীর লইয়া উত্থান, খ্রীষ্টের শোণিতমাংসপানভোজনরূপ সাধুশোণিতমাংসপানভোজন মত, স্বর্গে আরোহণ, জীবিত ও মৃতগণের বিচারের জন্য খ্রীষ্টের পুনরাগমন, তিনি কিরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সময় থাকিলে উদ্ধৃত কথা দ্বারা দেখাইতে পারিতাম।" কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, "দুই সহস্র বর্ষ হইল প্রস্তরের নিম্ন হইতে মৃত খ্রীষ্টকে বাহির করিবার জন্য লোকে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পরমাত্মা অলৌকিক ভাবে প্রস্তর সরাইয়া দিয়াছেন, এবং খ্রীষ্ট সেখানে নাই। প্রস্তরের নিম্নে সমাহিত মৃত খ্রীষ্টের ন্যায় পৃথিবীতে তিন দিন থাকিতেও খ্রীষ্ট সম্মত হন নাই, তাই ঈশ্বর খ্রীষ্টকে আপনার নিকটে লইয়াছেন এবং পৃথিবীতে যাহারা মৃত খ্রীষ্ট অন্বেষণ করিয়াছে তাহাদিগকে চিরকালই নিরাশ ও পরাভূত করিয়াছেন। এখন খ্রীষ্ট তবে কোথায়? খ্রীষ্টীয় জীবনে এবং আমাদের চারিদিকে যে সকল খ্রীষ্টীয় প্রভাব বিদ্যমান তাহাতে তিনি স্থিতি করিতেছেন।" এই অংশ পাঠ করিয়া কি কেহ সিদ্ধান্ত করিবেন যে, কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, তিন দিন সমাহিত থাকিয়া শরীর লইয়া খ্রীষ্ট উত্থান করিয়াছেন? শোণিতমাংসপানভোজনের ব্যাপার যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাহা কি ঐ বক্তৃতায়

স্পষ্ট উল্লিখিত নাই? এ অংশের অর্থ কি?—"খ্রীষ্টকে আহার খ্রীষ্টের শোণিত-পান লোকে কি প্রকারে করিবে? এক ভাবে কেবল উহা সম্ভবপর। পূর্ব্বেই ভাবতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক অভেদভাবে। যাঁহারা সম্যক্ বিশ্বস্ততা সহকারে ঈশাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সত্যেতে, প্রেমেতে জ্ঞানেতে এবং পবিত্রতাতে ঈশার সহিত অভিন্ন হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বরের সহিত এক ছিলেন, অপরেও তাঁহার ও ঈশ্বরের সহিত তেমনি এক হইবেন। তিনি চাহিতেন যে, এইরূপে নিত্যকাল সকলে পুণ্য পবিত্রতার জীবনও ঈশ্বরেতে আনন্দ সম্ভোগপূর্ব্বক স্বর্গের গৌরবে একত্র বাস করিতে পারেন।" বিচার-সম্বন্ধে বয়সি সাহেব যে শ্লেষোক্তি করিয়াছেন উহা 'কতকগুলি বিশেষ কথা' এই শীর্ষক অধ্যায়ের ৩২ সংখ্যক নিবন্ধবিভাগ (১০৮৫ পৃ) পাঠ করিলেই সহজে নিরসন হইবে। খ্রীষ্টানগণ যে সকল মত প্রচার করিয়াছিলেন, সে সব মতের নূতন ব্যাখ্যা দিতে গিয়া কেশবচন্দ্র যদি মস্তিষ্কবিকারগ্রস্ত হই এই অপবাদ তাঁহারই ইংলণ্ডবাসী বন্ধুহস্তে লাভ করিয়া থাকেন তাহ আক্ষেপ করিবার বিষয় কি আছে? খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত সম্প্রতি বি যিনি বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং সে ধর্ম্মের প্রাচীন সংস্ক' মস্তিষ্ক হইতে আজও সম্যক্ অন্তর্হিত হয় নাই, তিনি নূতন ব্যাখ ব্যাখ্যার সহিত এক করিয়া ফেলিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? এক দিন চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের পাদরি, ওয়েস্‌লিয়ন মেথডিষ্ট, অ... ...গণ কার্ডিনাল হইতে দেখিবেন বলিয়া তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইবার কথা নয় বলিয়াই পূর্ণ হয় নাই। ভাক্তা বয়সি যে অস্থানে রুদ্র-ভাবের আবিষ্কার করিয়াছিলেন আজ তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা কে জানে? খ্রীষ্টের প্রতি তাঁহার ভাব আজও যখন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তখন সে রুদ্রভাবের প্রশমন হইয়াছে, কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে। খ্রীষ্টকে লইয়া আন্দোলন কেশবচন্দ্রকে পশ্চাদ্দিকে লইয়া যাইতে পারে নাই, নবভাবে নবসত্যে তাঁহাকে অগ্রসরই করিয়া দিয়াছে, খ্রীষ্টসম্বন্ধে পরসময়ে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ফাদার রিভিংটন সহ আলাপের পর এই বক্তৃতা হইয়াছে আমরা পূ... ...লিয়াছি; এস্থলে একথাও বলা সমুচিত যে কেশবচন্দ্রের খ্রীষ্টের প্রতি

সমাদর তাঁহার অনুযায়িগণের প্রতিও সেইরূপ হৃদয়ের অনুরাগ। তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে সকল বিষয়ে মতে মিলিতে পারিতেন না সত্য, কিন্তু মতভেদসত্ত্বেও খ্রীষ্টের নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকটে অতিপ্রিয় ছিলেন। ফাদার রিভিংটনকে বিনাভিনন্দনে তিনি কি করিয়া বিদায় দিতে পারেন ? এই অভিনন্দন প্রদানোপলক্ষে ২৬এপ্রেল শনিবার আলবার্ট হলে প্রায় দুইশত যুবক মিলিত হন। অভিনন্দন অর্পণের পূর্ব্বে ফাদার রিভিংটন আখ্যায়িকাচ্ছলে বক্তৃতা দেন। ধর্ম্মজীবনে শৈথিল্য উপস্থিত হইলে কি প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হয়, সাহসহীনতা কি প্রকার অনিষ্টকর, প্রতিক্রিয়া কিরূপ নিষ্ফলপ্রয়াসজনক, সর্ব্বদা জাগ্রৎ সাবহিত ভাব কি প্রকার ইষ্টফলদ, আখ্যায়িকাচ্ছলে তিনি এইটি উপস্থিত যুবকগণকে অতি মধুর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। যুবকবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র উপহার দিলে তিনি যে একটী আখ্যায়িকা এবং একটী প্রকৃত ঘটনা বলিয়াছিলেন, তাহার সার আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—"একজন প্রসিদ্ধ ...টি বৃহৎকায় প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতি... ছিল যে না তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিবার সম্ভাবনা ছিল, না ...ন হইবার সম্ভাবনা ছিল। শিল্পনৈপুণ্য বুঝিতে অক্ষম অথচ ...ব্যক্তি বলিল, মূর্ত্তিটী সুন্দর বটে কিন্তু যদি উহা কখন মস্তকোত্... সমুদায় গৃহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। ইহাতে কারু উত্তর দিল যে, এমন ...টী গঠিত হয় নাই যে, উহা কখন মস্তক উত্তোলন করিবে। উপসংহারকালের প্রকৃত ঘটনাটী সকলেরই স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য। আমেরিকা দেশের এক জন প্রধান উপদেষ্টা স্বীয় শিশুসন্তানকে ঊর্দ্ধে একটি তাকের উপরে রাখিয়া ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বাহুতে নিপতিত হইতে বলেন। বালক নিম্ন দিকে তাকাইয়া ঝম্প প্রদান করিতে সাহসী হয় না। তৎপরে তিনি নীচের দিকে না তাকাইয়া তাঁহার নয়নের দিকে তাকাইয়া ঝাঁপ দিতে বলেন। বালক তাহাতে অনায়াসে ঝাঁপ দিয়া তাঁহার বাহুতে নিপতিত হয়। পরিশেষে সেই শিশু ক্রমাগত তাঁহার বাহুতে ঝাঁপিয়া পড়িত। পার্থিব পিতার ভ্রান্তি হইতে পারে ; কিন্তু স্বর্গীয় পিতার মুখে যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ তাহার নিকট দুঃসাহসের কার্য্য কি আছে ?" ফাদার রিভিংটন শীতকালে পুনরায় এদেশে আসিবেন বলিয়া সকলের ধন্যধ্বনি মধ্যে বিদায় গ্রহণ করেন।

বসন্তোৎসব ও নববর্ষ।

২০ ফাল্গুন শনিবার পূর্ণিমাতিথিতে বসন্তোৎসব হইবার প্রস্তাব হয়। সে দিন কেশবচন্দ্র জ্বরে আক্রান্ত হন, এজন্য উৎসব করিতে পারেন নাই। কেশবচন্দ্রের উৎসবতৃষ্ণা অতি প্রবল। বসন্তোৎসবের বিশেষ ভাবে তাঁহার হৃদয় অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং সে উৎসব সম্পাদন না করিয়া তিনি কি নিরস্ত থাকিতে পারেন? ২৪ চৈত্র রবিবার পুনরায় বসন্তোৎসব ক... স্থির হইল। ধর্ম্মতত্ত্ব উৎসবের সংবাদ এইরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন, "... রবিবার পুনর্ব্বার বসন্তোৎসব হইয়াছে। আমরা আশা করিয়াছিলা... ষ্যাতে বসন্তোৎসব যথোচিতরূপে নিষ্পন্ন হইবে, সে আশা অত্যল্প... সিদ্ধ হইল। বেদীর সম্মুখভাগে বসন্তকালোচিত পল্লবপত্রপুষ্প... ক্ষুদ্রশাখা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল, বেদীর উপরিভাগ... রঞ্জিত হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয় সময়োচিত উদ্বোধনে ... উদ্বুদ্ধ করিলেন, এবং আরাধনা ধ্যান ধারণান্তে গভীর উপদেশে... পবিত্র জীবনপূর্ণ ভাব সকলের মনে মুদ্রিত করিলেন। বসন্তকাল ... পেক্ষা মনোরম এবং এই কালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া আত্মার অন্ত... ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম মুদ্রিত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যের ... হৃদয় এই কালকে কুৎসিতভাবের অভিব্যঞ্জক করিয়াছে। এই দোষ ... করণের জন্য বসন্তোৎসবের অভ্যুদয় হইল......।" বসন্তোৎসব ও শা... উৎসবে প্রভেদ কি, কেশবচন্দ্রের এই কয়েকটী কথায় অতি স্পষ্ট প্রকাশ। "ব্রাহ্মগণ, ইহা কি কখনও তোমাদের মনে হয় নাই যে, পৃথিবীতে এব... স্বর্গের ছবি প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বর বসন্তকালকে প্রেরণ করেন? বাছা সুন্দর জিনিষগুলি সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে বসন্তকাল আসেন। বসন্ত... সবের তুলনা হইতে পারে না। শারদীয় উৎসবে বিধাতার কৌশলে গৃহ... ঘরে কেমন প্রচুর পরিমাণে ধন, ধান্য, অন্ন এবং লক্ষ্মীশ্রী সঞ্চিত হয় এ...

ভার বিষয় ছিল; কিন্তু বসন্তোৎসবে কেবল সৌন্দর্য্যের কথা শুনিতেছি। আজ হিতবাদীর কথা নহে, আজ সুখবাদীর আনন্দোৎসব। সে দিন ছিল সংসারের সুখ, আজ হইল হৃদয়ের আনন্দ। সে দিন ধনধান্য এবং আহারের কথা, আজ হইতেছে ভক্তির উল্লাসের কথা। ক্ষুধানিবারণের জন্য বিধাতা ফল শস্য রচনা করিলেন, কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিলেন কেন? রাত্রে কেবল আলোক দেওয়া যদি তাঁহার ইচ্ছা হইত তবে তেজোময় কতকগুলি সূর্য্যকে আকাশে রাখিয়া দিলেই হইত, সুশীতল চন্দ্রের কি প্রয়োজন ছিল? এ সকল প্রশ্নের আর কোন উত্তর নাই, এক উত্তর এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে ভাল বাসেন। আর কোন যুক্তি নাই, আমাদিগের চিত্তরঞ্জন করিবার জন্যই তিনি এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য রচনা করেন। তিনি বায়ুকে এত সুমিষ্ট করেন এবং ... প্রকৃতিকে এইরূপ ভাবে পূর্ণ করেন। তিনি ভক্তদিগকে জানাইতে চাহেন ... তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আরও কিছু দিতে চাহেন। আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী যাহা আমাদের প্রাপ্য ... তিনি আমাদিগকে অধিক দিতে চাহেন। এই জন্য তিনি পৃথি-... সুন্দর বসন্ত ঋতুকে প্রেরণ করেন। ইহা তাঁহার প্রেমের ক্রীড়া, আনন্দের লীলা।" এই বসন্ত ঋতুকে যাহারা অপবিত্র আমোদের ... করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগকে ... নিত্য বসন্তোৎসবসম্ভোগের প্রণালী এইরূপে কেশবচন্দ্র ব্যক্ত ... ন;—"ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন এই বাহিরের বসন্ত আমাদিগের মনের ... হউক। মনের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের চিরবসন্ত, চির সৌন্দর্য্য সম্ভোগ ... বাহিরের ফুল, বাহিরের চন্দ্র, বাহিরের সমীরণ চিরকাল থাকে না, ... হৃদয়ের ভক্তিফুল, হৃদয়ের প্রেমচন্দ্র, হৃদয়ের পুণ্যহিল্লোল চিরকাল ... রবে। ফুল, চন্দ্র, বায়ু সকলই পাইলাম, এখন কেবল একটি সখা চাই, ... নিকুঞ্জবনে সেই সখাকে লইয়া সুখী হইব। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ ব্রাহ্ম-...র এই আন্তরিক নিত্য বসন্তোৎসব গ্রহণ করুক। যতই এই আধ্যাত্ম ...ৎসবে মত্ত হইব ততই চিত্ত শুদ্ধ হইবে।" কেশবচন্দ্র এই উৎসবে ... গন্ধরাজ পুষ্প হস্তে লইয়া উহাকে সম্বোধন করিয়া যে কথাগুলি বলিয়া-...ন, সেগুলি আজও যেন আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার সেই কথা

যেরূপে তৎকালে উদ্ধৃত হইয়াছিল সেইরূপে সেইগুলি আমরা এ
করিতেছি ;—"আহা ঈশ্বরের হস্তের ফুল কি পবিত্র ! ! প্রিয় গন্ধরাজ
রাজ, মিত্র গন্ধরাজ, তোমাকে হাতে লইলাম, তোমাকে ভাই ব
বলিলাম। বল দেখি ভাই, তোমাকে ঈশ্বর সৃজন করিলেন কেন
দলের ভিতরে সেই আদি অনাদি পুরুষ হাসিতেছেন। তুমি
তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার পিতার হাতে
পুষ্প তুমি, তোমাকে আমার অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। ওহে পুষ্প, তোমা
রচনা করিয়াছেন, আমি তাঁহার আরাধনা করি, তাঁহার গুণকীর্তন ব
বলিয়া কত গর্বিত হই ; কিন্তু গন্ধরাজ, তুমি কখন অহঙ্কার কর না, তু
কখন গর্বিতভাবে কাহাকেও উপদেশ দেও না। তুমি কেবল প্রাতঃকালে
প্রস্ফুটিত হইয়া সমস্ত দিন সুগন্ধ দান কর। তোমার আড়ম্বর নাই,
নিস্তব্ধ থাকিয়া আপনারি সৌন্দর্য্য প্রকাশ কর এবং চারিদিকে আপনার
বিস্তার কর! তোমার জ্ঞান নাই, আমি যে তোমাকে কি বলি
শুনিতেও পাও না, আমি যে তোমাকে কত আদর করিতেছি
বুঝিতে পারিতেছ না, তথাপি তুমি আমার গুরু হইলে। তু
কিন্তু তুমি দর্পণে আপনার সুন্দর মুখ দেখিয়া কখনও অহ
তোমার সহস্রভাগের এক ভাগ সৌন্দর্য্য যদি আমার থাকিত, আ
হইত। তুমি আমার যদি হও, তোমার কোমল দলের ভিতর
প্রভুকে আমি দর্শন করিব। গন্ধরাজ, আমার হৃদয় যাহাতে তোমার
কোমল ও লাবণ্যযুক্ত হয় তুমি এইরূপ শিক্ষা দাও।" উপাসকগণকে সম্বো
করিয়া তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মগণ, খুব গভীরভাবে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ
য জাতীয় পুষ্প আছে সকলের নিকটে পবিত্রতা এবং কোমলতা শিক্ষা
তাহা হইলে তোমরা সহজে অতীন্দ্রিয় পুষ্পসকলের সৌন্দর্য্যরসে মগ্ন হই
পারিবে। বাহিরের বসন্তের তাৎপর্য্য বুঝিলে অন্তরের চিরবসন্ত দেখিয়া ও
হইবে। যে দয়াময় সুধাময় পরমেশ্বর এই বসন্তোৎসব প্রেরণ করিলেন তি
চিরকালের জন্য আমাদিগকে তাঁহার অধ্যাত্ম বসন্তোৎসবে মত্ত করুন।"

নববর্ষোপলক্ষে ১লা বৈশাখ (১৮০১ শক) মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হ
বর্ষের প্রথমে পঞ্চাশত জন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কেশবচন্দ্র অভিলাষ প্র

'র অভিলাষ কেন অপূর্ণ থাকিবে, নরনারীতে ৫৮ জন দীক্ষাগ্রহণার্থী
র্মতত্ত্ব এই সংবাদটি এই প্রকারে দিয়াছেন, "গত ১লা বৈশাখ
লক্ষে মন্দিরে দুই বেলা উপাসনা হইয়াছিল। সে দিন পঞ্চাশ জন
স্থিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন আচার্য্য মহাশয় এরূপ ইচ্ছা
রিয়াছিলেন। তদনুসারে ৫৮ জন দীক্ষার্থী হইয়া আবেদন করেন।
৮ জন মহিলা ছিলেন, তাঁহারা মধ্যাহ্ন সময়ে কমলকুটীরে উপাসনালয়ে
দীক্ষিত হয়েন, রজনীযোগে উপাসনান্তে মন্দিরে অপর সকলে বেদীর
দীক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজন পীড়ার জন্য,
দুইজন উৎপীড়ন পরীক্ষা সহ্য করিতে না পারিয়া, আর দুইজন অজ্ঞাত কারণে
উপস্থিত হইতে পারেন নাই। দীক্ষিতদিগের মধ্যে কলেজ স্কুলের কতিপয়
াহী যুবা ছাত্র, এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী, কয়েক জন
স্ক কৃতবিদ্য ভদ্রলোক ছিলেন। তন্মধ্যে দুই শুক্ল পলিতকেশ বৃদ্ধ
য়া আমরা বিশেষ আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। সকল ভদ্র ব্রাহ্ম-
আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব পুরাতন ভৃত্যও সে দিন দীক্ষিত হইয়াছে।
র জন্য সম্মুখস্থ সমুদায় আসন নির্দিষ্ট ছিল। তাঁহাদের প্রতি
দেশ অত্যন্ত তেজোময় ও উৎসাহকর হইয়াছিল।" দীক্ষিতগণ
ক্ষ আবেষ্টিত অবকাশস্থানে বেদীর নিম্ন দেশে দণ্ডায়মান হন।
ধ্যায় প্রতিদীক্ষার্থীকে আচার্য্যের নিকটে উপস্থিত করেন এবং দীক্ষাকার্য্যে
চার্য্যের সাহায্য করেন। প্রতিদীক্ষার্থীর অঙ্গীকারপত্র পাঠান্তে আচার্য্য
র্ব্বক আশীর্ব্বচন উচ্চারিত হয়। দীক্ষাকার্য্যে অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক সময় অতি-
ত হইয়াছিল। দীক্ষিতগণের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ বিনা আর এ দিন স্বতন্ত্র
দেশ হয় না। দীক্ষিত ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি এবং দীক্ষিতদিগের প্রতি
শবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, যথাক্রমে আমরা তাহার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত
রিয়া দিলাম।

"...পরমপিতা তোমাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার
র যাইতে ডাকিতেছেন, তোমরা সেই মধুর আহ্বান শুনিয়া তাঁহার ঘরে
বেশ কর। তাঁহার ঘরে তোমাদের প্রতিজনের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট
ন আছে, সেই ঘরে গিয়া তোমরা প্রতিজনে আপন আপন স্থান গ্রহণ কর।

সতী হও, শুদ্ধ হও, সুখী হও। [illegible] হইয়া আপন প্রাণ সত্য, পুণ্য, কল্যাণ এবং শান্তি বিস্তার কর। ... ব্রহ্মকন্যাগণ দীক্ষিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট বিশেষরূপে [illegible] করিতে প্র[illegible] [illegible]। তোমরা [illegible] ভক্তির : পূজা [illegible]। সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে রাগ প্রভৃ[illegible] মনের যত প্রকার কুৎসিত ভাব সমুদয় [illegible] করিবে। সেবা করিয়া নারী কিরূপ শুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে তোমরা জ[illegible] দৃষ্টান্ত দেখাইবে। পৃথিবীর মলিন সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ব্রহ্মকন্যাগণ, তোমরা এত [illegible]দিন এখনও তাহাই রহিলে কদাচ এরূপ মনে করিও না। পবিত্র প[illegible] তোমরা যে শুদ্ধ ব্রত গ্রহণ করিলে তাহাতে দেহ চিত্ত সকল[illegible] সংসারাসক্ত স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তোমরা সংসার ক[illegible] শুদ্ধ ভাবে তোমরা সংসার করিবে। কি ভৃত্য কি বড়[illegible] করিবে। ব্রহ্মকন্যা আজ বিশেষরূপে ব্রহ্মদাসী হই[illegible] করিলে পুণ্য হইবে, সুখ শান্তি পাইবে। শান্তি শান্তি সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ের [illegible] অপেক্ষা ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরকে বড় জানিয়া তাঁহার পবিত্র সহবাসে [illegible]র্মল লাভ করিবে। আরাম এবং তৃপ্তির জন্য আর কাহারও নিকটে য[illegible] তোমাদিগকে আমি অন্তরের সহিত এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা [illegible] হইয়া ইহলোক পরলোক চিরকাল ধর্ম্মের আনন্দ ভোগ কর এবং যে[illegible] প্রিয় যাঁহারা তাঁহাদিগের ও সমস্ত জগতের কল্যাণ কর।"

"ব্রহ্মসন্তানগণ, আজ তোমরা যথারীতি পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত ব্রাহ্মপরিবারে সম্বদ্ধ হইলে......যে নির্জীব ভাবে দীক্ষিত হয় সে মৃ[illegible] ডাকিয়া আনে। অতএব ঈশ্বর চাহেন, আমি চাই, ব্রাহ্মসমাজ চাহেন তোমরা ব্রহ্মাগ্নিতে উদ্দীপ্ত হইয়া অপ্রতিহত যত্নের সহিত অদ্যকার ব্রত [illegible] করিবে। আর অপবিত্র হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না। যে ব্রত ধরিলে প্রাণের সেই ব্রত পালন করিবে। মৃত্যু যদি সমক্ষে আসিয়া ভয় দেখায়, পৃ[illegible] সকল লোক যদি শত্রু হইয়া খড়্গহস্ত হয় তথাপি ব্রত ভঙ্গ করি[illegible]

ব্রত পুণ্যব্রত। পাপ ছাড়িবে, শুদ্ধ হইবে, সুখী হইবে। ...
ব্রহ্মযোগী কেমন, ব্রহ্মসেবক কেমন তোমাদের সকলে যদি
দেখাইতে পার, ভারতভূমি উদ্ধার হইবে।......তোমরা আর
রহিলে না। তোমাদের হস্তে ... স্বর্গরাজ্য
দের গলায় আজ অমূল্য দয়ালনামের ... তোমরা
খেসাগরে ভাসিলে। আজ দয়াময় 'মা ভৈঃ' ... বলিয়া
আশ্বাসবাক্য বলিতেছেন। তোমাদের গতজীবন বিনাশ করিয়া
মাদিগকে নব জীবন দিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার
বি, সচ্চরিত্র সাধক করিবেন। তোমরা সরল হৃদয়ে কেবল
প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদিগের সহায়। আর তবে তোমাদের
সকলে গান কর;— "চল ভাই সবে মিলে যাই সেই পিতার

...ও নববর্ষের উপদেশসম্বন্ধে কিছু বলি নাই। "বিশ্বাস
ভবিষ্যৎ উহার বাস গৃহ" কেশবচন্দ্র প্রকৃত বিশ্বাস
তাহা এই উপদেশে যেমন সুন্দর ব্যাখ্যাত হইয়াছে
... নাই। আমরা সমুদয় উপদেশটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া-
... প গ্রন্থ বিস্তার করা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া উহার কতকটা উদ্ধৃত
...তেছি, —"প্রথমে অসৎ, পরে সৎ, ক্রমে সত্য, সর্ব্বশেষে সত্যরাজ্য।
পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কালসমুদ্রের স্রোতে ক্রমাগত প্রবাহিত
দৌড়িতেছে। একবৎসর চলিয়া গেল, এই একবৎসরের মধ্যে কত পরি-
...টিল। সকল চলিয়া যায়; কিন্তু মনুষ্য ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।
...তের সন্তানের নাম মনুষ্য। ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ আলোচনা করিলে
...তে পাইবে, যতই পশ্চাতে যাইতেছ ততই অন্ধকার, এবং যতই সম্মুখে
...তেছ ততই আলোক। এখন কি আছ, কাল কি ছিলে, তাহার পূর্ব্বদিন
ছিলে, এবং মাতৃগর্ভে জন্মিবার পূর্ব্বে কি ছিলে, যতই এ সকল ভাবিবে,
...বে যতই ভূতকালে যাইবে ততই অন্ধকার, কিন্তু ভবিষ্যতে সমক্ষে
...ক।......ঘোরান্ধকার মধ্যে মাতৃগর্ভে জন্ম হইল, পরে যথাকালে ভূমিষ্ঠ
পৃথিবীতে আসিয়া ভৌতিক আলোক দেখিলাম, কিন্তু তখনও পশু পক্ষীর